বিমল মিত্র
টক
ঝাল
মিষ্টি

ছোট-বড় সবার জন্য

টক-ঝাল-মিষ্টি

৫.৫

571

বিমল মিত্র

উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির

TAK-JHAL-MISTY
Stories :—Hot, Sour & Sweet.
by BIMAL MITRA
Price : Rs. 12·50

প্রতিষ্ঠাতা :
শরৎচন্দ্র পাল
কিরীটি কুমার পাল

প্রকাশক :
দিব্যদ্যুতি পাল
উজ্জ্বল পাবলিকেশনস্
সি-৩, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭ (দ্বিতলে)

মুদ্রাকর :
এন, সি, শীল,
ইম্প্রেশন সিণ্ডিকেট
২৬/২এ, তারক চ্যাটার্জী লেন,
কলিকাতা-৫

ব্লক :
রঞ্জিত দত্ত

প্রচ্ছদ চিত্র
অজিত গুপ্ত

অলংকরণ
শ্রীবিদ্যাঅশোক

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
নিউ গয়া আর্ট প্রেস
ল্যামিনেশন
ভারত ল্যামিনেটরস
চৌদ্দ টাকা মাত্র

প্রথম উজ্জ্বল মুদ্রণ :
আশ্বিন, ১৩৮৯
অক্টোবর, ১৯৮২
দ্বিতীয় মুদ্রণ :
বৈশাখ, ১৩৯০
মে, ১৯৮৩
তৃতীয় মুদ্রণ
আশ্বিন, ১৩৯২
অক্টোবর, ১৯৮৫

শ্রীরঞ্জিত দত্ত

স্নেহাস্পদেষু—

এই লেখকের
আরো কয়েকটি কিশোর গ্রন্থ—

রাজা হওয়ার ঝকমারি ১০৲
কে ? ১৫৲
দাশরথির বাহাদুরি ১০৲
নবাবী আমল ১০৲
লাল-নীল-হল্‌দে ১২-৫০৲
মৃত্যুহীন প্রাণ ১০৲
কিশোর অমনিবাস ১৫৲

দেখে নাও,
কোন পাতায় কী আছে—

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আমার অসংখ্য অনুরাগী পাঠক-পাঠিকাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আমার নাম জাল করে প্রায় পাঁচ শতাধিক গল্প-উপন্যাস বাজারে চলছে। ও-নামে অনেক ব্যাক্তি থাকতে পারেন, কিন্তু দ্বিতীয় কোন লেখক নেই। আমার খ্যাতি-প্রতিপত্তির সুযোগ নিয়ে বহু অসৎ প্রকাশক এই অসাধু উপায় অবলম্বন করেছেন। পাঠক-পাঠিকাদের কাছে তাই আমার বিনীত অনুরোধ এই যে, আমার রচিত গ্রন্থ ক্রয় করবার আগে তাঁরা যেন প্রথম পৃষ্ঠায় আমার মুদ্রিত স্বাক্ষর এবং ভেতরে 'বিশেষ বিজ্ঞপ্তি' দেখে গ্রন্থ ক্রয় করেন।

রাত তখন এগারোটা

ঘটনাটি ঘটলো রাত এগারোটার সময়। কলকাতা থেকে দেশে যাচ্ছি। দেশ বলতে যেখানে আমি জন্মেছি। কলকাতা থেকে ট্রেনে যেতে প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লাগে।

সকাল পাঁচটায় একটা ট্রেন আছে। তাতে গেলে মাজদিয়া রেলস্টেশনে সকাল আটটা, সাড়ে আটটা বেজে যায়। স্টেশনে নেমে আরও পাঁচ ক্রোশ হাঁটা। খুব তাড়াতাড়ি হাঁটলেও তাতে সময় লাগে। আরও ছ'ঘণ্টা তারপর সকালে আর একটা ট্রেন আছে। সেটা ছাড়ে সকাল ন'টায়। তারপর দুপুর দু'টোয়। তারপর সন্ধ্যে ছ'টায়। সন্ধ্যে ছ'টার ট্রেনে গেলে রাত ন'টায় পৌঁছতে পারা যায় মাজদিয়া স্টেশনে। কিন্তু তাতে গেলে বাড়ি পৌঁছতে রাত এগারোটা বেজে যায় বলে সাধারণত সে ট্রেনে যাই না।

তখন আমি কলকাতার একটা মেসে থেকে পড়াশোনা করি। প্রত্যেক শনিবার দিন দুপুর দু'টোর ট্রেনে দেশে যাই। তাতে সুবিধে খুব। ট্রেনে ভিড়ও কম থাকে। আর সন্ধ্যের আগেই বাড়ি পৌঁছোনো যায়।

কিন্তু সব সময়ে ট্রেনে যাওয়া সুবিধে হয় না। লেখাপড়া ছাড়া ফুটবল খেলা দেখার নেশাও আছে। রবিবার দিনটা দেশে না কাটিয়ে কলকাতায় বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে সময় কাটাতে বেশি ভালো লাগে।

কোনও শনিবার বাড়িতে না গেলেই বাবার চিঠি আসে। লেখেন—'তুমি গত শনিবারে বাড়ি আসো নাই কেন? আমরা তোমার পথ চাহিয়া বসিয়া-ছিলাম। তোমার শরীর খারাপ হইল কিনা, ভাবিয়া খুবই চিন্তিত আছি। পত্রপাঠ উত্তর দিবে...' ইত্যাদি...

আমি বাবার একমাত্র সন্তান। বাবার বয়েস হয়েছে। আমাকে নিয়েই তাঁর যত ভাবনা-চিন্তা-স্বপ্ন সব কিছু। আমি বড় হবো, আমি মানুষ হবো, আমি বংশের মুখ উজ্জ্বল করবো।

কিন্তু ততদিনে আমারও একটা নিজস্ব জগৎ গড়ে উঠেছে। দেশের চেয়ে কলকতার আকর্ষণই আমার কাছে বেশি। আমার জন্যে বাবা মোটা হাত-খরচ পাঠান। সেই টাকা দিয়ে আমি ময়দানে ফুটবল খেলা দেখি, ক্রিকেট খেলা দেখি, আবার কখনও-কখনও বা সিনেমা দেখতে যাই। কলকাতার জীবন, গ্রামের জীবনের মতো একঘেঁয়ে নয়। সেখানে চারদিকে এঁদো, পানা-পড়া পুকুড় আর কেবল খেত-খামার আর বন-জঙ্গল। আমাদের মতো যাদের অবস্থা ভালো নয়, তারা লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে কেবল বারোয়ারী-তলায় বটগাছের ছায়ায় হারুমুদির দোকানের মাচায় বসে আড্ডা মারে। তাস খেলে। আর আমি গেলে তারা আমার কাছে কলকাতার গল্প শোনে। কারোর কোনও কাজ নেই। বাড়ির অবস্থা খারাপ বলে তারা একটু-একটু হিংসেও করে। আমার চাল-চলন, জামা-প্যাণ্ট দেখে তারা অবাক হয়ে যায়। আমার জুতো, আমার চুল-ছাঁটা, আমার সাবান-মাখা দেখে তাদের তাক্ লেগে যায়। কারণ আমাদের গ্রাম এমন এক গ্রাম, যেখানে শহরের কোনও সভ্যতা ঢোকবার সুযোগ পায়নি।

আমাদের বাড়ির পাশেই থাকতেন নসুকাকা! আসল নাম বোধহয় ছিল নৃসিংহ ভট্টাচার্য। বাবা তাঁকে 'নসু' বলে ডাকতেন। তিনি গ্রামে-গ্রামে যজ-মানদের বাড়িতে গিয়ে পূজো করে বেড়াতেন। বড় ভাল লোক। আমি দেশে গেলেই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। বলতেন, 'কী রকম লেখাপড়া হচ্ছে বাবা? ভাল তো?'

আমি তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলতাম, 'হ্যাঁ।'

তিনি বলতেন, 'হ্যাঁ, খুব মন দিয়ে লেখাপড়া করবে বাবা। এখনকার দিনকাল খুব খারাপ, আর কলকাতা শহরে যে-রকম গাড়ি-ঘোড়া-ট্রাম-বাস শুনেছি, তাতে খুব সাবধানে চলা-ফেরা করবে।'

নসুকাকা আমাদের দেশের নামকরা পুরুতমশাই। তিনি না হলে কারো-রই কোনও পূজো-আচ্চা হতো না। কেউ হাতেখড়ি দেবে তাতেও যেমন তাঁর ডাক পড়তো, আবার তেমনি কারও বাড়িতে ছেলের অন্নপ্রাশন হবে, তাতেও

তাঁকে চাই। তারপর আছে বারোয়ারীতলার দুর্গাপূজো, কালীপূজো থেকে আরম্ভ করে তিন ক্রোশ দূরে জমিদারবাবুদের বাড়িতে যত উৎসব যত বিয়ে ব্রত উদযাপন সবেতেই তাঁর ডাক পড়তো।

তা এই আবহাওয়াতেই আমি মানুষ। কিন্তু এই আবহাওয়াতে মানুষ হয়েও যে-ঘটনাটা ঘটলো, তার কথাই বলি।

কলকাতায় তখন আমার স্কুলের পরীক্ষা চলছিলো। তিন সপ্তাহ দেশে যেতে পারিনি। বাবাকে সে-কথা লিখে দিয়েছিলাম, যে আমি তিন সপ্তাহের জন্যে দেশে যেতে পারবো না। পরীক্ষা যেদিন শেষ হলো সেদিন শনিবার। মেসে এসে ভাবলাম, দু'টোর ট্রেন ধরব। কিন্তু কয়েকদিন ধরে রাত জেগে পড়বার পর বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। ঘড়িতে তখন সাড়ে বারোটা। ভাবলাম আধঘণ্টা ঘুমিয়ে নেওয়া যাক। কিন্তু যখন ঘুম ভাঙল তখন দেখলাম, দেয়াল-ঘড়িতে বেলা সাড়ে তিনটে। আমার বন্ধু, যে আমার পাশের বিছানায় শুতো, সেও দেখলাম অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

মনে হলো, সর্বনাশ। দু'টোর গাড়ি তো কখন ছেড়ে দিয়েছে। এর পরে তো সেই সন্ধ্যে ছ'টার আগে দেশে যাবার আর কোনও গাড়ি নেই! সে গাড়িতে গেলে দেশের বাড়িতে পৌঁছতে তো সেই রাত এগারোটা বেজে যাবে! কিন্তু শেয়ালদা স্টেশন থেকে গাড়ি ছাড়তেই সেদিন কেন জানি না আধঘণ্টা দেরি হয়ে গেল। ভাবলাম ট্রেনটা হয়তো একটু দেরি করেই মাজদিয়াতে পৌঁছবে। তার মানে যখন পাঁচ ক্রোশ হেঁটে বাড়ি পৌঁছব, তখন রাত বারোটা বেজে যাবে। বাবা হয়তো বকাবকি শুরু করে দেবেন। বলবেন—দুপুর দু'টোর ট্রেনে আসতে পারলে না?

কিন্তু না, ট্রেনটা ঠিক সময়েই মাজদিয়া স্টেশনে গিয়ে পৌঁছলো।

আমি নিশ্চিন্ত হয়ে গেলাম। এদিককার প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে উল্টোদিকের প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে টিকিট দেখিয়ে গেট পার হলাম। বেশি যাত্রী ছিল না ট্রেনে। গেটের বাইরের বাজার। অত রাত বলেই বাজারে লোকজনের ভিড় বেশ পাতলা। তাড়াতাড়ি বাজার ছাড়িয়ে বড় রাস্তায় গিয়ে পৌঁছলাম। ভেবেছিলাম একটা সাইকেল রিক্সা ভাড়া করে বাড়ি পৌঁছব।

কিন্তু কোনও রিক্সাওয়ালাই অত দূরে যেতে চাইলে না। বেশি টাকার লোভ দেখিয়েও কাউকে রাজী করাতে পারলাম না। সবাই-ই এক কথা

বললে—অত দূরে সওয়ারী সিয়ে গেলে ফিরে আসতে রাত একটা বেজে যাবে।

আমি বললাম—আমি তোমাদের ডবল ভাড়া দেব।

তবু কেউ যেতে রাজী হল না। অগত্যা হাঁটতে শুরু করলাম। হাতে অনেক জিনিস ছিল আমার। বাবা কাশির ওষুধ কিনে নিতে লিখেছিলেন। শেয়ালদা স্টেশনে পৌঁছবার আগে ওষুধের দোকান থেকে তা কিনে নিয়েছিলাম মা'র জন্যে গিয়েছিলাম 'হাজ' মলম। মা'র পায়ে হাজা হয়েছিল। তারপর গামছা কিনেছিলাম একটা বাবার জন্যে। আরও অনেক খুচরো-খুচরো জিনিস কিনেছিলাম—যা বাবা কলকাতা থেকে কিনে নিয়ে যেতে বলেছিলেন।

রাস্তা দিয়ে একলা-একলা হেঁটে চলেছি। চারিদিকে নিশুতি অন্ধকার। রাতে গ্রামের লোকজন সকাল-সকাল ঘুমিয়ে পড়ে। কারণ ভোর-ভোর উঠতে হয় সকলকে। বড়-বড় গাছগুলোকে দূর থেকে অন্ধকারের পাহাড় বলে মনে হচ্ছে। খানিক দূর গিয়েই পিচের রাস্তা শেষ হয়ে গেলো। আকাশে যে চাঁদটা ছিল তাও ডুবে গেল! তখন শুধু তারাগুলো জ্বলছে মাথার ওপর। মাঝে মাঝে শেয়ালের হুক্কা-হুয়া কানে আসছে। দু'-একটা কুকুর আমাকে দেখে ঘেউ-ঘেউ করে ডেকে উঠল। কিন্তু আমাকে চিনতে পেরে আবার চুপ করে গেল। তবু আমার কেমন যেন ভয় করতে লাগল। কিন্তু কিসের যে ভয়, তা বলতে পারব না।

একটা রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়ালাম। চারদিকে কয়েকটা বড়-বড় বট-গাছ ডালপালা ছড়িয়ে জায়গাটিকে ঢেকে রেখেছে। শনি-মঙ্গলবার ও জায়গা-টায় হাট বসে। হাট বেলাবেলি শেষ হয়ে গেছে। চারদিকে দু'-চারটে ছোট খাটো দোকান। তারাও দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে যে-যার বাড়ি চলে গেছে।

বহুদিন আগে ওই বটগাছের ডালে একজন মানুষ গলায় দড়ি দিয়ে আত্ম-হত্যা করেছিল! সে ছোটবেলাকার ঘটনা। কিন্তু তখন থেকেই জায়গাটায় এসে দাঁড়ালেই দিনের বেলাতেও কেমন গা-ছমছম করত। আর তখন তো রাত সাড়ে দশটা বেজে গেছে।

মনে পড়লো, বাবা-মা বোধহয় এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছেন। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে রাত হয়ে গেল। তাঁরা ভাবছেন আমি আর আসব না। মা নিশ্চয়ই আমার জন্যে ভাত তৈরি করে বসে ছিল। বাবা বলছেন—আর কেন বসে আছো, খোকা আজকে বোধহয় আর এল না, তুমি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ো।

মা'ও বোধহয় তখন খেয়ে নিয়েছে। তারপর আমার কথা ভাবতে-ভাবতেই বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

এই সব কথা ভাবতে-ভাবতেই হেঁটে চলেছি। রাত তখন এগারোটা বেজে গেছে। রাস্তাটা গিয়ে নলগাড়ির নাবালে গিয়ে মিশেছে। আগে এখানে একটা নদী ছিল। আগে যখন নদীতে জল ছিল তখন খেয়া নৌকোয় এপার-ওপার করতে হতো। কিন্তু এখন নদীটা শুকিয়ে গিয়েছে। সেখানে ঢালু জমিতে চাষ-বাস হয়। আর তারই একপাশ দিয়ে গরুর গাড়ি যাবার রাস্তা হয়েছে। বর্ষার পর গরম পড়াতে রাস্তায় আবার ধুলো জমেছে। এখানকার লোক তাই ও-জায়গাটার নাম দিয়েছে 'নলগাড়ির নাবাল'। আমি ঢালু রাস্তায় নামতে লাগলাম। তারপর সামনের দিকে নজর পড়তেই যা দেখলাম তাতে আমার শরীরের রক্ত হিম হয়ে এল।

দেখলাম, ওপারের রাস্তা দিয়ে একটা দাড়িওয়ালা মূর্তি ঢালু রাস্তা দিয়ে আমার দিকে নেমে আসছে। রাস্তায় তার পা নেই, শুধু হাওয়ায় ভাসতে-ভাসতেই এগিয়ে আসছে আমার দিকে। আমি আর এগোলাম না। এগোতে ভয় করল। ও কি তবে সেই লোকটার মূর্তি, যে একদিন বটগাছে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল? তখন কত লোকের মুখে শুনতে পেতুম যে, সে নাকি ওই অঞ্চলে ভূত হয়ে ঘুরে বেড়ায়! কিন্তু আমি নিজের চোখে কখনও তা দেখিনি। হঠাৎ আমাকে লক্ষ্য করে মূর্তিটা কথা বলে উঠলো—'কে ওখানে?'

আমি কী জবাব দেবো, বুঝতে পারলাম না। একটু থেমে বললাম, 'আমি।'

'আমি কে?'

বলতে-বলতে মূর্তিটা আমার দিকে আরও এগিয়ে আসতে লাগল।

সামনে মুখের কাছে এসে বললে, 'কে? কে তুমি?'

আমি ভয়ে শিউরে উঠেছি তখন। কিছুই জবাব দিতে পারলাম না সেই মুহূর্তে। মূর্তিটা জিজ্ঞেস করলে, 'ও, তুমি! বিমল! ধীরেশদার ছেলে?'

আমার তখন যেন জ্ঞান ফিরে এল! চিনতে পারলাম মূর্তিটাকে। আমার নন্তুকাকা। বললাম, 'নন্তুকাকা, আপনি এখানে?'

নন্তুকাকা বললেন, 'হ্যাঁ, আমি। তা তোমারি আসতে এত দেরি হলো যে?'

বললাম, 'দুপুর দু'টোর ট্রেনটা ধরতে পারিনি, ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, তাই সন্ধ্যে ছ'টার ট্রেন ধরে আসছি।'

নস্তুকাকা বললেন, 'তা, আজকে এই অমাবস্যার রাতে না এলেই পারতে। এই রাত-বিরেতে আসা কি ভাল? আমাদের গাঁয়ে যে পরশুদিন বাঘ বেরিয়েছিল। তারপর ক'দিন আগে বাবুদের বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল—'

বললাম, 'তা আপনি এত রাত্তিরে কোথায় যাচ্ছেন?'

নস্তুকাকা বললেন, 'জমিদারবাবুর স্ত্রী হঠাৎ ডেকে পাঠিয়েছেন, তাঁর বড় ছেলের খুব অসুখ, আমাকে সেখানে গিয়ে শান্তি-সস্তেন্ করতে হবে। যত রাতই হোক্ আমাকে যেতেই হবে। তাঁর বড় ছেলের এখন-যায়, তখন-যায় অবস্থা। তাই খেয়ে নিয়েই দৌড়োচ্ছি। আমাকে যে ডাকতে এসেছিলো, তাকে বলছি, তুমি এগিয়ে যাও, আমি খেয়ে উঠেই যাচ্ছি। তা তোমার সঙ্গে রাস্তায় কোনও লোকের দেখা হয়নি?'

আমি বললাম, 'কই, না তো—'

নস্তুকাকা বললেন, 'তা রাত্রিরবেলা হয়তো ঠাহর হয়নি তোমার। তা, তুমি বাবা একলা এত রাত্তিরে এসে ভাল করোনি। চলো, আমি তোমাকে গাঁ পর্যন্ত পৌঁছে দিই।'

বললাম, 'আপনি আবার কেন এত কষ্ট করতে যাবেন। আর আপনারও তো তাড়াতাড়ি আছে'।

নস্তুকাকা বললেন, 'সে কী কথা! এই এত রাতে তোমাকে কি এই অবস্থায় একলা ছেড়ে দিতে পারি? শুনলে ধীরেশদা যে আমার ওপর রাগ করবে। বলবে, তুমি খোকাকে এই অবস্থায় একলা ফেলে কী করে চলে গেলে।'

কী আর করা যাবে। ওদিকে জমিদারবাবুর বাড়িতে তাঁর বড় ছেলের এখন-যায়-তখন-যায় অবস্থা, আর তিনি কিনা নিজে আমাকে আমার বাড়ি পৌঁছে দিতে চান। রাস্তায় যেতে-যেতে নস্তুকাকা বলতে লাগলেন, 'তুমি তিন সপ্তাহ বাড়ি আসোনি, সেজন্যে ধীরেশদা খুব ভাবছিলেন। কলকাতায় থাকো তুমি, তোমার বয়েস হয়েছে। তোমার যত পড়াশোনাই থাক, হপ্তায় একদিনের জন্যে বাবা-মাকে দেখতে আসতে পারো না? তুমি যখন বড় হবে, নিজে বাবা হবে, তখন বুঝবে ছেলেকে দেখতে না পেলে বাপের মনে কী কষ্ট হয়।'

আমি নস্তুকাকার কথা শুনে কোনও জবাব দিতে পারলাম না, চুপ করে নস্তুকাকার সঙ্গে-সঙ্গে চলতে লাগলাম। তারপর যখন বাড়ির কাছাকাছি

এসেছি তখন নস্তুকাকা বললেন, 'ওই দেখো, তোমাদের বাড়ি। এবার আর কোনও ভয় নেই, আমি চলি, আমার খুব তাড়া আছে।'

বলে তিনি চলে গেলেন। তারপর আমাদের বাড়ির দরজায় কড়া নেড়ে ডাকতে লাগলাম, 'বাবা-বাবা-বাবা।'

বাবা আমার ডাক শুনেই ধড়মড় করে জেগে উঠেছেন। মা-ও জেগে উঠেছেন। তাড়াতাড়ি দরজা দিয়ে আমাকে দেখে বললেন, 'খোকা, তুমি এসে গেছ? কোন্ ট্রেনে এলে? দুপুরের ট্রেনে আসতে পারলে না?'

বললাম, 'দুপুরবেলা পরীক্ষা দিয়ে এসে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, তাই—'

বাবা বললেন, 'তা বলে সন্ধ্যের ট্রেনে আসতে হয়? জানো বাড়ি পৌঁছোতে রাত সাড়ে এগারোটা বেজে যাবে। তা-ছাড়া গাঁয়ে পরশুদিন বাঘ বেরিয়েছিল, তা জানো? ক'দিন আগে বাবুদের বাড়ি ডাকাত পড়েছিল—'

আমি বললাম, 'আমি তো জানতুম না। রাস্তায় দেখা হয়ে গেল নস্তুকাকার সঙ্গে। তিনিই আমাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেলেন।'

'নস্তু? নস্তুকাকা?'

বললাম, 'হ্যাঁ, তার সঙ্গে নলগাড়ির নাবালে দেখা হয়ে গেল। তিনি জমিদারবাবুদের বাড়ি যাচ্ছিলেন, তাদের বড় ছেলে মরো-মরো, তাই তিনি শান্তি-সস্তেন্ করতে সেখানে যাচ্ছিলেন।'

বাবা আমার দিকে হতবাকের মতো চেয়ে রইলেন। মা-ও অবাক।

বাবা বললেন, 'তুমি ঠিক দেখেছো? তোমার নস্তুকাকা? তিনি নিজে তোমার সঙ্গে কথা বলেছেন? তুমি কী সব আবোল-তাবোল বকছো?'

আমি বললাম, 'বা-রে, আমি ভুল দেখবো কেন? আমি কী নস্তুকাকাকে চিনতে পারবো না?'

বাবা বললেন, 'কিন্তু তোমার নস্তুকাকা যে পরশুদিন মারা গিয়েছেন, আমরা যে নবদ্বীপে গিয়ে তাঁর সৎকার করে এলুম—'

———

সবচেয়ে বলবান কে

ছোটবেলায় বাবা আমাদের গল্প শোনাতেন। আমরা ভাইবোনেরা তাঁর চারিদিকে গোল হয়ে বসতাম আর শুনতাম তাঁর গল্প। কিন্তু রোজ গল্প শোনার সৌভাগ্য হতো না। তিনি সারা সপ্তাহ কলকাতার মেসে থেকে চাকরি করতেন আর শনিবার বিকেলে এসে দেশে পৌঁছোতেন, আর আমাদের জন্যে নানা রকম খেলনা কী খাবার-দাবার আনতেন। আমরা সবাই বাবার আসার পথ চেয়ে বাগানের শেষে দূরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম। স্টেশন থেকে বাড়িতে আসবার পথে সময় লাগাতো এক ঘণ্টা! বাবা ট্রেন থেকে নেমে হেঁটে আসতেন। আমরা অনেক দূরে বাবাকে দেখতে পেলেই চেঁচিয়ে উঠতাম, "ওই বাবা আসছে, ওই বাবা আসছে—"

তখন আমাদের কী আনন্দ! সারা সপ্তাহের মধ্যে ঐ একটা শনিবারই আমাদের যা আনন্দ-উৎসব। শুধু আমরা নয়, মা-ঠাকুমা সবাই-ই সারা সপ্তাহটা ধরে এই শনিবারটার জন্যেই হাঁ করে বসে থাকতাম। আর মাসের প্রথম সপ্তাহের আনন্দের তো কথাই নেই। আমাদের জন্যে কত কি জিনিস, মা'র জন্যে কখনো শাড়ি, ঠাকুমার জন্যে থান ধুতি আনতেন। সেইদিন একটু বিশেষ ধরনের রান্না-খাওয়ার ব্যবস্থা হতো। পাড়ার লোকজন বাবার সঙ্গে দেখা করতে আসতো, বাবাও যেতো গ্রামের দু'চারজন বন্ধু-বান্ধবদের বাড়িতে। সকলের সঙ্গে কাজকর্মের পালা শেষ হলে আমরা একসঙ্গে খেতে বসতাম, খাওয়ার পর বাবা আমাদের গল্প শোনাতেন। তারপর যতক্ষণ না ঘুমে আমাদের চোখ জুড়ে আসতো, ততক্ষণ আমরা হাঁ করে বাবার গল্প শুনতাম। তারপর যে-যার বিছানায় শুয়ে পড়তাম।

তারপর রবিবার দিনটায় বাবার অনেক কাজ ! জন-মজুরেরা বাবার দেখা করতে আসতো, বাবা তাদের সারা সপ্তাহের কাজকর্ম বুঝিয়ে দিতেন। কোন্ জমিতে কখন লাঙ্গল দিতে হবে, ধান কেটে মরাইতে কখন তুলতে হবে, সব কাজ বাবা বলে দিতেন। রবিবারটা এইসব কাজে কেটে গেলেই সোমবার দিন ভোরবেলা ছ'মাইল রাস্তা পেরিয়ে ট্রেন ধরে কলকাতায় গিয়ে দশটার সময়ে বাবাকে অফিস করতে হতো। তাই সোমবার সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আমরা বাবাকে আর দেখতে পেতাম না।

এ-সব অনেকদিন আগেকার কথা। সেই বাবাও আর নেই, সেই মা, ঠাকুমা, তাঁরাও কেউ নেই। সেই গ্রাম, বাগান হয়তো এখনও আছে, কিন্তু তার সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্কও নেই। আমি এখন পাকাপাকি ভাবে কলকাতায় থাকি, আর আছে কেবল সেই স্মৃতিগুলো। সে-সব গল্প এখন প্রায় সমস্তই ভুলে গেছি, কিন্তু একটা গল্প এখনও ভুলতে পারিনি। সেই গল্পটাই আজ তোমাদের বলি।

* * *

একদিন এক সাধু এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে যাচ্ছিল। সাধুর কোনও সংসার নেই, ঘরবাড়ি নেই, সম্পত্তিও নেই, সুতরাং তার কোনও দুশ্চিন্তাও নেই। সে যেখানে খেতে পায়, সেখানেই খায়। যেখানে আশ্রয় নেয়, সেখানে আবার রোদ উঠলে হাঁটতে শুরু করে। কোথাও একদিনের বেশি সে থাকে না। সে খেতে পেলে কী খেতে পেলে না, তা নিয়ে সে মাথাও ঘামায় না। সারা-জীবন সে সব দেশ ঘুরে বেড়ায়, তার নিজের বলতে কেউ নেই, তার আত্মীয়-স্বজন, বাবা-মা কেউ আছে কিনা, তা কোনদিন সে কাউকে জানায় না। তার কোন দুঃখ-সুখ নেই, সব সময়েই সে প্রসন্ন। তাকে কখনও কেউ হাসতেও দেখেনি, কাঁদতে দেখেনি। দেশের সবাই তাকে দেখেছে, কিন্তু সে কাউকেই দেখেনি। সে কখনও কারোর কাছে ভিক্ষে চায় না, কারো কাছে সে আশ্রয়ও চায় না। তার কাছে শুধু একটা লোটা আছে, কেউ নিজে থেকেই তার লোটায় এক মুঠো চাল ফেলে দেয় কিংবা একটা কি দু'টো পয়সা। তাতেই সে খুশি। কারো কাছে তার দেবারও কিছু নেই, নেবারও নেই কিছু। এক কথায় সে মুক্ত পুরুষ।

কিন্তু একদিন তার একটা সঙ্গী জুটে গেল। সে হঠাৎ লক্ষ্য করলে যে,

তখন ফলমূল যা পায় তার কিছু অংশ কুকুরকে দেয়। কুকুর সেইটুকু খেয়ে আর সেই রকম সেবা করেই খুশি থাকে।

সাধু আরেক দিন জিজ্ঞেস করলে—"আচ্ছা, বলতো তুই কে ?"

কুকুর বললে—"আমি সাধারণ একটা কুকুর।"

সাধু বললে—"আগের জন্মে তুই কি আমার কেউ ছিলি ?"

কুকুর বললে—"না, তা জানি না। আমাকে ভগবান আপনার কাছে পাঠিয়েছে।"

সাধু কথাটা শুনে অবাক হয়ে গেল। উঠে বসলো। তারপর বললে—"সে কি রে ? তুই ভগবানকে দেখেছিস ?"

কুকুর বললে—"হ্যাঁ সাধুবাবা।"

সাধু বললে—"তুই তো বড় ভাগ্যবান রে। কী করে দেখলি ?"

কুকুর বললে—"ভগবান একদিন আমাকে নিজের হাতে তৈরি করলো, আমার সঙ্গে-সঙ্গে হাতি, বাঘ, গণ্ডার, সব কিছু তৈরি করলো। হাতির তখন শুঁড় ছিল না, হাতি ভগবানকে বললে—ভগবান, আমাকে তুমি এত বড় করে তৈরি করলে, আমার চোখ দিলে, আমার এত বড় মুণ্ডু দিলে, এত মোটা-মোটা পা দিলে, আর আমার একটা হাতও দিলে না, আমি কী করে মোটা পা দিয়ে খাবো, কাজ করবো ?"

ভগবান হাতির কথা শুনে তার মুখে একটা শুঁড় গজিয়ে দিলে। বললে—"এই শুঁড়টাই তোর হাত, এই দিয়েই গাছপালা, পাতা-লতা ধরে খাবি।"

হাতি শুঁড় নিয়ে পৃথিবীতে চলে এল।

বাঘ তাই দেখে বললে—"ভগবান, তুমি হাতিকে তো শুঁড় দিলে, কিন্তু আমি কী করে খাব ? আমি তো হাতির মতো উঁচু নই, আমি পেট ভরাব কী করে ?"

ভগবান বললে—"ঠিক আছে, তোকে আমি খুব ধারালো নখ দিলাম, তুই সেই নখ লাগানো থাবা দিয়ে খাবার ধরে-ধরে খাবি। তোর ঐ নখের জন্যে তোকে সবাই ভয় করবে।"

বাঘ ভগবানের কথা শুনে খুশি হয়ে পৃথিবীতে চলে গেল। এবার গণ্ডার এগিয়ে এল। বললে—"আপনি তো ওদের শুঁড় দিলেন, ধারালো নখ দিলেন কিন্তু আপনি আমাকে তো কিছুই দিলেন না।"

একটা কুকুর তার পেছনে-পেছনে আসছে। সে যেখানে যায়, কুকুরটাও সেখানে যায়। সে যেখানে শোয়, কুকুরটাও তার পাশে শুয়ে থাকে। আবার যখন সে চলতে আরম্ভ করে, কুকুরটাও তার পেছনে-পেছনে চলে।

কাণ্ড দেখে সাধু বড় অবাক্ হয়ে গেল। যাকে কেউ সঙ্গ দেয় না, যার কেউ নিজের বলে নেই, সেই সাধুর মধ্যে কুকুরটা এমন কী পেল, যে তার সঙ্গে চলছে? একদিন সাধু কুকুরটাকে জিজ্ঞেস করলে—"হ্যাঁরে, তুই আমার সঙ্গ ছাড়বি না?"

কুকুরটা বললে—"না।"

সাধু আবার জিজ্ঞেস করলে—"আমার সঙ্গে তুই কেন আসিস? তুই কী চাস?"

"আমি আপনার সঙ্গে থাকবো।"

"কিন্তু আমার সঙ্গে থাকলে তোর তো অনেক কষ্ট হবে, তুই থাকবার মত একটা জায়গা পাবি না, পেট ভরে খেতে পাবি না। আমার মতো কষ্ট কী তুই করতে পারবি?"

"পারবো।"

কথাটা শুনে সাধু আরো অবাক্ হয়ে গেল। ভাবলো, তবে কি কুকুরটা আগের জন্মে তার কেউ আপন-জন ছিলো? তা যদি হয় তাহ'লে কিসের পাপে সে এজন্মে কুকুর হয়ে জন্মেছে? সাধু লক্ষ্য করছিল যে, সে যখন শুয়ে থাকে কুকুরটা তাকে পাহারা দেয়, সে যখন অন্ধকার বনের মধ্যে দিয়ে চলে তখনও কুকুরটা সামনে এগিয়ে-এগিয়ে তাকে পথ দেখিয়ে চলে। জিজ্ঞেস করলে—"সত্যি-সত্যি তুই কি চাস বল তো?"

কুকুর বললে—"আমি চাই আপনার সেবা করতে।"

সাধু বললে—"আমার সেবা করতে হবে না, আমি কারোর সেবা চাই না, আমার সেবা করবার দরকার নেই, আমি একলাই আমার নিজের কাজ করে নিতে পারি, তাছাড়া আমার কোন কাজই নেই।"

কুকুর বললে—"তবু আমি আপনার সেবা করবো।"

সাধু আর কিছু বললে না। কুকুর বরাবর তেমনি সাধুর সেবা করতে লাগলো। সাধু যখন ঘুমোয়, তখন কুকুর পাশে জেগে-জেগে তার মাছি-মশা তাড়ায়। দেখে কেউ সাধুর ক্ষতি করতে আসছে কিনা! সাধু যখন খায়

ভগবান বললে—"আমি তোর গায়ে চারদিকে খুব শক্ত মোটা চামড়া দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি, যাতে কেউ তোর ক্ষতি করতে পারবে না, তুই নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াবি।"

এমনি করে ভগবান সাপ তৈরি করলে। বাঁদর, ভাল্লুক আর আরও কত রকম জানোয়ার তৈরি করলে। কাউকে দিলে বিষ, কাউকে দাঁত, কাউকে দিলে বড়-বড় লোম, শেষকালে আমাকে তৈরি করলে। তারপর পাখি, কীটপতঙ্গ সব তৈরি করলে। আর সকলের শেষে সৃষ্টি করলে মানুষ। আমি ভগবানকে জিজ্ঞেস করলাম—"প্রভু, আমি পৃথিবীতে গিয়ে কী করো? আমি কী করে খাবো?

ভগবান বললে—"তুই যার সেবা করবি, সে-ই তোকে খেতে দেবে।"

জিজ্ঞেস করলে—"কার সেবা করবো?"

ভগবান বললে—"যে সব চেয়ে বলবান, তার সেবা করবি।"

ভগবানের কথা শুনে আমি পৃথিরীতে এলাম। এসে দেখলাম হাতির সেবা করাই ভালো, কারণ হাতিই পৃথিবীতে সব চেয়ে বলবান।

সাধু সব শুনে বললে—"তা হাতিকে সেবা করতে-করতে আমার কাছে চলে এলি কেন?

কুকুর বললে—"সে একটা কাণ্ড হলো। একদিন হাতিটা জঙ্গলে শুয়ে ঘুমোচ্ছে, হঠাৎ একটা বাঘের বিকট শব্দ হলো। আমি পাশেই বসে হাতিকে সেবা করছিলাম, কিন্তু হাতিকে জাগাইনি—কারণ আমি জানতুম বাঘ হাতির কোন ক্ষতি করতে পারবে না, কিন্তু হাতির কানে বাঘের শব্দটা গেছে। শব্দটা শুনেই হাতি জেগে উঠে, বললে—"পালা, পালা-পালা।"

আমরা দু'জনে জঙ্গল ছেড়ে একটা নিরাপদ জায়গায় গিয়ে লুকিয়ে পড়লাম। সে-যাত্রা দু'জনেই বেঁচে গেলাম। কিন্তু আমার মনে একটা সন্দেহ হলো। আমি তখন জানলাম যে, হাতির চেয়ে বাঘ আরো বলবান। ভগবান তো আমাকে বলবানের সেবা করতেই বলেছে, তবে কেন আমি হাতির মতো দুর্বলের সেবা করবো? সেবা করতে হলে বাঘেরই সেবা করবো। তাই একদিন হাতিকে ছেড়ে এক বাঘের কাছে গিয়ে তার সেবা করতে লাগলাম।"

সাধু এতক্ষণ গল্পটা শুনছিলো। জিজ্ঞেস করলে—"তারপর?'

কুকুরটা বলতে লাগলো—তারপর থেকে সাধুবাবা, আমি যেমন করে

হাতির সেবা করতাম, তেমন করে সেবা করতে লাগলাম বাঘকে। বাঘ আমার সেবা পেয়ে খুব খুশি। বাঘ যখন ঘুমোয়, তখন আমি মশা তাড়াই পাশে বসে-বসে। বাঘের গা-হাত-পা চেটে দিই। বাঘও যা কিছু খায়, তার কিছু ভাগ আমাকে দেয়। সে-সব খুব আরামের দিন ছিল আমার। কিন্তু একদিন আবার একটা কাণ্ড ঘটলো। একদিন আমার প্রভু বাঘের সেবা করছি, এমন সময় ভীষণ জোরে একটা শব্দ হলো, শব্দটা শুনে আমার কিন্তু কোনও ভয় হলো না। কারণ আমি তখন জানতাম যে, বাঘই সবচেয়ে বলবান জীব। কিন্তু সে শব্দটা শুনে বাঘের ঘুম ভেঙে গেছে। বাঘের চোখের দিকে চেয়ে দেখলাম, সে খুব ভয় পেয়ে গেছে। সে ঝপ্ করে উঠে দাঁড়ালো। উঠে দাঁড়িয়েই বললে—"শীগগির পালা, মানুষ এসেছে।" বলে এক লাফ দিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি ভাবলাম যে, বাঘের চেয়েও কী মানুষ তাহ'লে বলবান ? নইলে বাঘ কেন মানুষকে ভয় পায় ?

সাধুবাবা গল্প শুনতে শুনতে জিজ্ঞেস করলে—"তারপর কী হলো ?"

কুকুর বললে—"তারপর সাধুবাবা আমার ভগবানের কথাটা মনে পড়লো। ভগবান আমাকে বলেছিল বলবানের সেবা করতে, আমি তাই বাঘের সেবা করা ছেড়ে দিয়ে গ্রাম থেকে বেরিয়ে এলাম। এসেই আপনাকে দেখলাম। দেখলাম, আপনি একজন মানুষ, আপনি তাহলে বাঘের চেয়েও বলবান। তাই ক'দিন আপনার পিছু নিয়েছি। তাই দিনরাত আপনারই সেবা করছি।"

সমস্তটা শুনে সাধুবাবা হো-হো করে হেসে উঠলো। সে হাসি আর থামে না। কুকুর জিজ্ঞেস করলে—"আপনি হাসছেন কেন ?"

সাধুবাবা বললে—"হাসবো না ? বাঘের চেয়েও আমি বলবান, তা কে বললে তোকে ?"

"আমি তো নিজে দেখলাম, বাঘ মানুষের ভয়ে পালিয়ে গেল।"

সাধুবাবা বললে—"তুই ভুল করেছিস। আমার চেয়েও বলবান জীব আছে সংসারে!"

"কে সে ?"

"আছে-আছে। তাকে আমিও ভয় পাই। সে মানুষের চেয়েও বলবান।"

"আপনিও তাকে ভয় পান ?"

"হ্যাঁ। হাতি যেমন ভয় পায় বাঘকে, বাঘ যেমন ভয় পায় মানুষকে

তেমনি মানুষও তাকে ভয় পায়।”

কুকুর জিজ্ঞেস করলে—“কে সে? নাম কী তার বলুন। তাহ'লে এখন থেকে তাকেই সেবা করবো। ভগবান তো আমাকে বলেছিল, যে সবচেয়ে বলবান, তাঁরই সেবা করতে। নাম কী তার বলুন না?”

সাধুবাবা বলল—“সময়!”

“সময়?”

সাধুবাবা বললে—“হ্যাঁ, সময়ের চেয়ে বলবান সংসারে আর কেউ নেই। হাতি, বাঘ, ভালুক, সাপ, গণ্ডার, বাঁদর, কীটপতঙ্গ, পাখি, মানুষ, সংসারে যত রকমের জীব আছে, সবাই সময়কে ভয় করে।”

কুকুর জিজ্ঞেস করলে—“সময় কোথায় থাকে?”

সাধুবাবা বললে—“সময় কোথায় থাকে, তা যদি জানতুম, তাহ'লে তোকে আমি তা জানিয়ে দিতুম। আমি নিজেই তো সারাজীবন সেই 'সময়'কে খুঁজে বেড়াচ্ছি। তুই যদি পারিস তো তার সেবা করিস। আর পেলে আমাকে জানাস্, তা'হলে আর আমাকে তাকে খুঁজে-খুঁজে হয়রান হতে হয় না—তাহ'লে তোর সঙ্গে-সঙ্গে আমিও তার সেবা করবো।”

———

আমার বাবা চিরকালই বন্ধু-বান্ধব নিয়ে সকালবেলাটা কাটিয়ে দিতেন। কেউ আসত শুধু গল্প করতে। কেউ আসত কিছু উদ্দেশ্য নিয়ে। কেউ বা আবার আসত বিনা-খরচায় তামাক খেতে। অর্থাৎ, বলতে গেলে আমাদের বাড়িটা ছিল সব রকম লোকের মিলন-স্থল। আমার বাবা গল্প বলতে আর গল্প শুনতে বড় ভালবাসতেন। সকালবেলা থেকেই বাইরের লোকেদের জন্য চা-তামাক সাজার ধুম পড়ে যেত।

আমি তখন ছোট। আমার অধিকার ছিল না সেখানে ঢোকবার। শুধু ভেতরের দরজায় ফাঁক দিয়ে আমি সকলকে উঁকি মেরে দেখতাম।

পাড়ার যত বৃদ্ধদের মেলামেশা করবার জায়গা ছিল আমাদের বাড়ির বৈঠকখানা। বাবা বলতেন, "তারপর রায়মশাই, দেশের কী খবর ? ফজলুল হক কী বলেছে কালকে ? আপনি মিটিংয়ে গিয়েছিলেন নাকি ?"

তখন ইংরেজ রাজত্বের শেষ দিক ! কংগ্রেস আন্দোলন করছে দেশের স্বাধীনতা আনবার জন্যে। আর ওদিকে মুসলীম লীগও চাইছে পাকিস্তান তৈরী করতে। দলাদলি চরমে উঠেছে। খবরের কাগজে চারদিকের গরম খবর বেরোচ্ছে।

আমি মাঝে-মাঝে তাঁদের কথাগুলো শুনতাম বটে, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারতাম না। ঘরময় শুধু নয়, বাড়িময় অম্বুরি তামাকের গন্ধ ভুর-ভুর করত। আর আমাদের বাড়ির কাজের লোকটি ঘন-ঘন চা করে নিয়ে বৈঠকখানা দিয়ে আসত। বাবা বৈঠকখানা থেকেই তাকে ডাকতেন, "ভৈরব, আরো চার কাপ চা দিয়ে যা—"

বোঝা যেত, আরও চারজন আড্ডাধারী লোক এসে হাজির হয়েছে।

একজন লোক যে একবার চা খাবে তাই নয়, বার-বার চা খাবে। তার জন্যে যা খরচ হবে সমস্ত দেবেন বাবা। কারণ আড্ডা না দিলে বাবার শরীর খারাপ হয়ে যাবে। যেদিন ঘটনাচক্রে কেউ আসত না, সেদিন বাবা লোক দিয়ে সকলকে ডেকে পাঠাতেন। তাঁরা এলে বাবা বলতেন, "কী গো মুখুজ্যে, আজ তুমি এলো না যে বড় ?"

মুখুজ্যে মনে হরিহর মুখোপাধ্যায়। তিনিই ছিলেন আড্ডার প্রাণ। তাঁকে বাবা যেমন ভালবাসতেন, তেমনি আবার বকুনিও দিতেন। বলতেন, "আফিমের নেশাটা বুঝি বেশি হয়ে গিয়েছিল তোমার ?"

হরিহর মুখুজ্যে মশাই আফিম খেতেন। আফিমের নেশায় তিনি প্রায় সব সময়ই ঝিমোতেন। ভৈরবকে বলতেন, "আমার চায়ে একটু বেশি করে করে দুধ দিও, বাবা—"

যারা আফিমখোর তারা একটু বেশি দুধ খায়। ভৈরব জানত সে- কথা। কিন্তু কাজের ভিড়ে তা মাঝে-মাঝে ভুলে যেত। তাই মুখুজ্যে মশাইয়ের কথায় ভেতর থেকে আবার বেশি দুধ নিয়ে এসে তাঁর কাপে ঢেলে দিয়ে আসত। তিনি বলতেন, "হ্যাঁ-হ্যাঁ, হয়েছে-হয়েছে—"

বাবা জিজ্ঞেস করতেন "তা এ নেশা তুমি কেন ধরলে মুখুজ্যে ? কেন ধরতে গেলে এ নেশা ?"

হরিহর বলতেন, "আজ্ঞে, আফিম তো অমৃত, আপনিও ধরুন না দেখবেন, আপনার সব ব্যামো সেরে গেছে—"

বাবা বলতেন, "ছাই-ছাই, ও এক হতচ্ছাড়া নেশা। একবার ধরেছো কী সঙ্গে-সঙ্গেই সর্বনাশ !"

একদিন হরিহর মুখুজ্যে মশাই আর এলেন না। লোক পাঠানো হলো তাঁকে ডাকতে, কিন্তু খবর এল মুখুজ্যে মশাইয়ের শরীর খারাপ।

শেষ পর্যন্ত বাবা নিজেই একদিন গেলেন মুখুজ্যে মশাইয়ের বাড়িতে। তখন তাঁকে দেখতে এসেছে ডাক্তারবাবু। বাবা ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, "ডাক্তার, কী রকম দেখছেন ? মুখুজ্যের কী হয়েছে ?"

ডাক্তার আমাদের পাড়ায় খুব নাম-করা লোক। বহু রোগীকে সারিয়ে দিয়েছে। যার যখনই অসুখ-বিসুখ হয়, ওই ডাক্তারবাবুকেই ডাকে। বাবার

বাবার কথা শুনে ডাক্তারবাবু বললে, অসুখটা এমন কিছু নয়, কিন্তু আমার কোনও ওষুধই কোনও কাজ করছে না—”

“কেন ?”

ডাক্তারবাবু বললে, “ওই যে উনি আফিম খান। ওর শরীরের মধ্যে আফিমের বিষ রয়েছে, ওঁকে যদি কোনওদিন সাপে কামড়ায়, তো সাপই ওই বিষে মারা যাবে, ওনার কিছুই হবে না—”

তা সত্যি-সত্যিই একদিন মুখুজ্যে মশাই মারা গেলেন। কোনও ডাক্তারই তাঁকে বাঁচাতে পারলে না। বাবার আড্ডা থেকে একজন মেম্বার কমে গেল। কিন্তু বাবার আড্ডা তা বলে বন্ধ হলো না। তাই আগে যেমন চলছিল পরেও তেমনি চলতে লাগল। শুধু হরিহর মুখুজ্যের কথা উঠলেই বাবা বলতেন, “ওই আফিমই মুখুজ্যের সর্বনাশ করলে।”

রায় মশাই বললেন, “আমি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছি মিত্তির মশাই, আমি আর ও জিনিস ছুঁচ্ছি নে। মুখুজ্যে আমাকেও আফিম ধরাবার চেষ্টায় ছিল। অনেকবার মুখুজ্যে আফিম খেতে বলেছে। আমি দাদা ও সব ধরিনি—”

বাবা বলতেন, “পৃথিবীতে আফিম কী করে এল জানো ?”

রায় মশাই বললেন, “না।”

বাবা বললেন, “তবে শোনো, আমি বলে দিচ্ছি। আমি যেবার কাশীতে গিয়েছিলুম, তখন সেখানকার এক সাধুর কাছে গল্পটা শুনেছিলুম।”

বলে বাবা গল্পটা বলতে আরম্ভ করলেন।

আমি পাশের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলাম।

* * *

বহুকাল আগে গঙ্গার ধারের একটা নির্জন জায়গায় এক সাধু বাস করতো। মানুষের নাম-গন্ধ নেই সে জায়গাটায়। নিবিড় জঙ্গল চারদিকে। সাধন-ভজনের পক্ষে জায়গাটা খুব ভাল। সাধুজি গাছের ডাল-পালা দিয়ে নিজের একটা আস্তানা তৈরী করে নিয়েছিল। সারাদিন কাছের একটা পাহাড়ে চলে যেত আর বিকেলবেলা নিজের আস্তানায় ফিরত। সেদিনও রোজকার মতো সাধুজি ভোর চারটেয় ঘুম থেকে উঠে গঙ্গায় স্নান করে সাধন-ভজন করতে পাহাড়ের দিকে যাচ্ছিল। হঠাৎ দেখলে তার বিছানার কাছে

সাধুজি বললে বেড়াল কোত্থেকে এল ?"

ইঁদুর বললে, তা জানি নে প্রভু তবে আর একটু হলেই আমাকে ধরে খেয়ে ফেলত। খুব জোর বেঁচে গিয়েছি—"

সাধুজি খুব ভাবনায় পড়ে গেল। এর বিহিত কী হবে ?

ইঁদুর বললে "আপনি যখন বাড়িতে থাকেন তখন কিছু ভয় নেই, আপনি যখন বাড়িতে থাকবেন না তখন যদি বেড়ালটা আবার আসে ! তা'হলে আমি আর বাঁচব না—"

সাধুজি বললে, তাহ'লে এক কাজ কর। আমার সঙ্গে তুইও জঙ্গলে চল। আমি যেখানে সাধন-ভজন করবো, তুইও সেখানে আমার পাশে থাকবি !"

ইঁদুর বললে, না-সে অনেক কষ্ট। আমার জন্যে আপনার পূজোতেও মন থাকবে না—তাতে আপনার ক্ষতি হবে—"

সাধুজী বললে "হ্যাঁ, তা ক্ষতি হবে বটে—তাহ'লে আমি কী করব। আমি তো তোর জন্যে সারাদিন আস্তানার ভেতরে থাকতে পারব না। আমাকে ঘর থেকে বেরোতেই হবে—"

ইঁদুর বললে "তাহ'লে একটা কাজ করুন না—"

"কী কাজ বল ?"

ইঁদুর বললে "আমি বলি কী আপনি তো অনেক ক্ষমতা রাখেন। আমাকে বেড়াল করে দিন না—"

"বেড়াল ?"

"হ্যাঁ, আমাকে মন্ত্র পড়ে বেড়াল করে দিন। তাহ'লে আর কোনও ভয় থাকবে না আমার। বেড়াল তো বেড়ালকে খেয়ে ফেলতে পারবে না—"

সাধুজি বললে, "তোর বেড়াল হবার খুব শখ ?"

ইঁদুর বললে, "হ্যাঁ প্রভু, আমাকে বেড়াল করে দিলে আমার সব ল্যাঠা চুকে যায়, আর কোনও দিন আপনার কাছে কিছু চাইব না।"

"ঠিক আছে—তুই স্থির হয়ে দাঁড়া—"

বলে সাধুজি তার কমণ্ডলুর জলে মন্ত্র পড়ে, সেই জল ইঁদুরের গায়ে ছিটিয়ে দিলে। আর সঙ্গে-সঙ্গে ইঁদুরটা বেড়ালে পরিণত হল। দেখে কেউই আর বলতে পারবে না যে, সে আগে ইঁদুর ছিল। বেড়ালটা সাধুজির পায়ের কাছে মাথা হেঁট করে প্রণাম করলে। বললে, "আপনি আমায় বাঁচালেন হুজুর—"

একটা ইঁদুর ঘুরে বেড়াচ্ছে। সাধুজিকে দেখে ইঁদুর-বাচ্চাটা পালিয়ে যাচ্ছিল সাধুজি তাকে ডাকলে, "এই কোথায় যাচ্ছিস, দাঁড়া—পালাচ্ছিস কেন ?"

ইঁদুরটা থমকে দাঁড়াল। বললে, "আপনি আমাকে মারবেন না বাবা, আমি আপনার ছেলের মতন—"

সাধুজি জিজ্ঞেস করলে, "তুই কোথায় থাকিস ?"

ইঁদুরটা বললে, "আমি আপনার এই আস্তানাতেই থাকি !"

"কী খাস্ ?"

ইঁদুর বললে, "আপনি যে-সব ফল-ফুলুরি জঙ্গল থেকে আনেন, সেই খাবারের যে টুকরো-টাকরা পড়ে থাকে, তাই কুড়িয়ে-কুড়িয়ে খাই। আমার আর খাবারের জন্য অন্য কোথাও যেতে হয় না—"

সাধুজি বললে, "ঠিক আছে, তোর কোনও ভাবনা নেই, তুই যতদিন ইচ্ছে আমার আস্তানাতেই থাক, কেউ তোকে কিছু বলবে না। কেউ যদি কখনও তোকে কিছু বলে, তো আমাকে বলে দিবি।"

ইঁদুর নিশ্চিন্ত হল। সাধুজি সারাদিন পরে যখন জঙ্গল থেকে ফলমূল নিয়ে আস্তানায় ফেরে, তখন ইঁদুরটাও এসে সামনে হাজির হয়। সাধুজি তাকে ভাল করে খেতে দেয়। ইঁদুরটাও খুব আরামেই থাকে। তাকে আর আগেকার মতো খাবার খাওয়ার জন্যে লুকিয়ে থাকতে হয় না।

সাধুজি জিঙ্গেস করে, "কী রে, তোর কোন কষ্ট নেই তো" ?

ইঁদুর বলে, "না—"

সাধু অভয় দিয়ে বলে, "হ্যাঁ, কোনো কষ্ট হলেই আমাকে বলবি—"

কিন্তু কিছুদিন পরে ইঁদুরটা দেখলে কোথা থেকে একটা বেড়াল এসে তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। আর তাকে ধরবার জন্যে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। সঙ্গে-সঙ্গে ইঁদুরটা তার নিজের গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ল। এক চুলের জন্যে ইঁদুরটা বেঁচে গেল। নইলে বেড়ালটা তাকে ধরে খেয়ে ফেলত। সন্ধ্যেবেলা সাধুজি আসতেই ইঁদুরটা বললে, "প্রভু, সর্বনাশ হয়েছে—"

"কীসের সর্বনাশ ? কার সর্বনাশ ?"

ইঁদুর বলল, "প্রভু, আমার—"

"কী রকম ?"

ইঁদুর বললে, "একটা বেড়াল আজ আমাকে ধরতে এসেছিল—"

সাধুজি বুঝতে পারলে যে, তার কাছে কুকুরটার কিছু নিবেদন আছে! জিজ্ঞেস করলে' "কি রে, তুই এখন কিছু বলবি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ প্রভু! একদিন যখন আমি ইঁদুর ছিলাম, তখন আপনিই আমাকে দয়া করে বেড়াল করে দিয়েছিলেন। তারপর যখন আমার কথায় আপনি আবার কুকুর করে দিলেন তখনও আমার কোনও অসুবিধে হয়নি।"

সাধুজি বললে, "তাহ'লে এবার আর কী হতে চাস? খরগোস?"

"না প্রভু, খরগোস হয়ে কী হবে?"

"তাহলে বল না, এবার কী হতে চাস তুই?"

ইঁদুর বললে, "আমাকে এবার দয়া করে হনুমান করে দিন প্রভু—"

সাধুজি বললে, "তা এত জিনিস থাকতে তুই হনুমান হতে যাবি কোন্ দুঃখে? হনুমান হয়ে তোর কী লাভ হবে?"

ইঁদুর বললে, "সত্যি কথা বলতে কী প্রভু, আপনি খেয়ে দেয়ে যা পাতে ফেলে রেখে যেতেন, এতদিন তাই খেয়েই আমার পেট ভরছিলো; কিন্তু এখন তো আমি কুকুর হয়েছি, এখন আর ওতে আমার পেট ভরে না। তাই বলছি, আপনি আমাকে কুকুর করে দিয়ে পেটটা বড় করে দিয়েছেন। এখন আর ওই খাবারে আমার এত বড় পেটটা ভরে না। আপনি যদি আমাকে হনুমান করে দিতেন তো আমি গাছে উঠে নিজেই নিজের খাবার যোগাড় করে নিতুম। আপনার ফেলে দেওয়া খাবারের ওপর আর নির্ভর করতে হতো না!"

"তা সত্যিই বলছিস্, হনুমান হবি? হনুমান হলে তোর ইচ্ছে পূর্ণ হবে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, প্রভু!"

"আচ্ছা ঠিক আছে। তোর ইচ্ছেই পূর্ণ হোক। আমি তোকে হনুমান করে দিচ্ছি। কিন্তু তোকে বলে রাখছি এর পর যেন অন্য কিছু আবার হতে চাস্‌নি। এত বড় হওয়ার ইচ্ছে ভাল নয়। সবারই নিজের নিজের অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা উচিত।"

ইঁদুর বললে, "না প্রভু, পরে আর কিছু হতে চাইব না। আমি হনুমান হয়েই থাকব চিরকাল—"

"তথাস্তু।" বলে সাধুজি কমণ্ডলুর জল নিয়ে তাতে মন্ত্র পড়ে কুকুরের গায়ে ছিটিয়ে দিলে। আর সঙ্গে-সঙ্গে কুকুরটা একটা হনুমান হয়ে গেল!

সাধুজি বললে, "ঠিক আছে, এবার তো তুই খুশি ?"

ইঁদুর বললে, "হ্যাঁ প্রভু, আমার আর কোনও দুঃখ নেই—"

একদিন সাধুজি জিজ্ঞেস করলে, "কিরে আর তো তোর কিছু কষ্ট নেই—"

ইঁদুর বললে, "না প্রভু, আমার আর কোনও কষ্ট নেই।"

সাধুজি বললে, "এখন তুই দুনিয়ার সব বেড়ালের সঙ্গে লড়াই করে তাদের হারিয়ে দিতে পারবি তো ?"

ইঁদুর বললে, 'তা পারব, কিন্তু আর এক নতুন বিপদ এসেছে—"

"আবার কী নতুন বিপদ এল তোর ?"

ইঁদুর বললে, "আপনি বাড়ি থেকে চলে যাবার পর একদল কুকুর আমাকে দেখতে পেলেই তাড়া করে আসে। আমি তখন তাদের হাত থেকে দৌড়ে পালিয়ে গিয়ে কোনোরকমে প্রাণ বাঁচাই—আর তারা বাইরে ঘেউ-ঘেউ করে শব্দ করে সমস্ত পাড়া মাৎ করে—"

সাধু জিজ্ঞেস করে "তাহ'লে আমি এখন কী করব ?"

ইঁদুর বললে "প্রভুর আমার ওপর অগাধ দয়া। আপনি যদি আমায় দয়া করে কুকুর করে দেন, তাহলে জীবনে আমার আর কোনও কষ্ট থাকবে না—"

সাধুজি বললে, "তথাস্তু—"

বলেই সাধুজি তার কমণ্ডলু থেকে জল নিয়ে মন্ত্র পড়ে তার গায়ে ছিটিয়ে দিলে। আর সঙ্গে-সঙ্গে বেড়ালটা কুকুর হয়ে গেল।

বেশ নধর লোমওয়ালা কান-ঝোলা একটা কুকুর—

কুকুর হয়ে বেড়ালটা নির্ভয়ে চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কেউই আর তাকে তাড়া করে না। বেশ সুখেই দিন কাটতে লাগল তার।

কিন্তু সাধুজির ফেলে-যাওয়া খাবার খেয়ে আর তার পেট ভরতে লাগল না। যতদিন ইঁদুর ছিল, সে ততদিন বেশ চলেছিল। বেড়াল যখন সে হলো, তখনও সে কিছু অসুবিধে ভোগ করেনি।

কিন্তু কুকুরের খিদে বেশি। ওই অল্প খাবারে তার অসুবিধে হতে লাগল। মনে হলো, আরও বেশি খাবার পেলে ভাল হতো।

এবার সাধুজি বাড়ী ফিরে আসতেই সে সামনে গিয়ে জোড়হাত করে পেছনের পা দু'টোর ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াল।

তা প্রথম কয়েকমাস বেশ কাটতে লাগলো। বেশ এ-গাছ থেকে ও-গাছে লাফিয়ে বেড়াতে লাগল। যে ফল খেতে ইচ্ছে হলো, তাই-ই গাছ থেকে ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খেতে লাগল। কত মজা হনুমান হওয়ার। কেউ তাকে বাধা দেওয়ার নেই। কেউ তাকে বারণ করার নেই। সারাদিন গাছ থেকে গাছে লাফিয়ে-লাফিয়ে বেড়াত সে। জঙ্গলে কত রকমের ফলের গাছ। আম, জাম কাঁঠাল, পেয়ারা, জামরুল, কত ফল খাবে খাও না। যতক্ষণ পেট না ভরে, ততক্ষণ খাও, কেউ তোমায় কিছু বলবে না। সারাদিন সে খেয়ে বেড়ায় আর সন্ধ্যে হলে সাধুজির আস্তানায় এসে শুয়ে থাকে। সাধুজি মাঝে-মাঝে জিজ্ঞেস করে, "কী রে, এখন সুখে আছিস তো?"

হনুমানরূপী ইঁদুর বলে, "আজ্ঞে হ্যাঁ আমার মতো সুখী আর কেউ নেই—"

"এখন খেয়ে পেট ভরে তো?"

"হ্যাঁ প্রভু, খেয়ে-খেয়ে আর কুলিয়ে উঠতে পারি না। জঙ্গলে যে এত ফল হয়, তা আগে জানতুম না। আর বেড়ানো! পৃথিবীটা যে এত বড়, তাও এর আগে জানতুম না।"

সাধুজি বলে, "কিন্তু এতেই তুই খুশি থাকার চেষ্টা করিস। এর চেয়ে বড় হতে চেষ্টা করিস না। বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষা ভাল নয়।"

হনুমান বলে, "না প্রভু, এখন এই-ই আমার ভাল, এর চেয়ে আর বড় কিছু হতে চাই না—"

কিন্তু বেশিদিন এ সুখ রইল না। একদিন ওপরের গাছের ডাল থেকে দেখতে পেলে জঙ্গলের ভেতরে একটা ডোবায় একদল বুনো শুয়োর জলের ভেতরে বেশ গা ডুবিয়ে আরাম করে খেলা করছে।

হনুমানটার মনে হলো ওদের কী আরাম! এই গরমের দিনে আমি যখন ঘামে ছটফট কর'ছি, ওরা তখন কেমন আরামে জলের ভেতরে গা ডুবিয়ে বসে আছে। আমি যদি ওই রকম বুনো শুয়োর হতুম ত বেশ হত!

কিন্তু না, সাধুজিকে সে কথা দিয়েছে যে আর সে অন্য কিছু হতে চাইবে না। সে সাধুজিকে কথা দিয়েছে যে, আর সে অন্য কিছু হতে চাইবে না। সে সাধুজির কাছে শুনেছে যে বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকা ভাল নয়। তাতে বিপদ আছে!

সেদিন সাধুজি আবার জিজ্ঞেস করলে, "হ্যাঁ রে, ভাল আছিস তো?"

হনুমান বললে, প্রভু, "আবার একটা নিবেদন আছে আপনার কাছে—"

"আবার নতুন কী নিবেদন ?"

"আজ্ঞে আপনি আমাকে বুনো শুয়োর করে দিন।"

"বুনো শুয়োর ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ প্রভু! শেষবারের মতো একটা অনুরোধ রাখতে হবেই—"

"তা বুনো শুয়োর হয়ে কী লাভ হবে তোর ?"

হনুমান বললে, "বুনো শুয়োর হলে আর আমাকে খেটে খেতে হবে না। বুনো শুয়োর হলে আমি তাদের মতো ডোবার জল-কাদায় ডুবে আরাম করব। আমাকে গাছে-গাছে আর ঝাঁপ দিয়ে বেড়াতে হবে না। আর তাছাড়া গরমে ঘেমে নেয়ে উঠতে হবে না। ওদের কত আরাম আর আমার কত কষ্ট। আমাকে এবারের মতো বুনো শুয়োর করে দিন। আর আমি আপনার কাছে কখনও কিছু চাইব না।"

সাধুজি মনে-মনে হাসতে লাগল। কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করলে না। আবার কমণ্ডলুর জলে মন্ত্র পড়ে সাধুজি তার গায়ে ছিটিয়ে দিলে। আর সঙ্গে-সঙ্গে হনুমানটা একটা বুনো শুয়োরে পরিণত হলো।

জিজ্ঞেস করলে, "হ্যাঁ রে, এবার খুশী তো ?"

বুনো শুয়োর বললে, "হ্যাঁ প্রভু, এবার খুব খুশি আমি—"

বুনো শুয়োর হওয়ার যে কী আনন্দ, তা সে প্রথম দিনেই বুঝতে পারলে। তাকে গাছে-গাছে চড়ে বেড়াতে হয় না আর। সে এবার ডোবার জলে গা ডুবিয়ে দিব্যি চোখ বুঁজে আরাম করতে লাগল।

এই রকম করে বেশ চলছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন এক মুশকিল হলো। দেশের রাজা একদিন লোক-লস্কর নিয়ে হাতির পিঠে চড়ে সেই জঙ্গলে এসে হাজির হল। উদ্দেশ্য শিকার করবে। রাজার হাতে তীর-ধনুক। সামনে যে সব জন্তু-জানোয়ার নজরে পড়েছে, তাদের সকলকে তীর দিয়ে মেরে ফেলেছে। কত জন্তু-জানোয়ার যে রাজা শিকার করলে তার ঠিক নেই।

তখন বুনো শুয়োরটারও খুব ভয় হলো। তাকে যদি ধরে ফেলে, তার গায়ে যদি একটা তীর এসে লাগে তো তখন কী হবে ?

না, তা হল না, রাজার লোকেরা কেউ যাতে তাকে দেখতে পায়, তার জন্য

সে নিজেকে জলের ভেতরে আড়াল করে চোখ দু'টো উঁচু করে চারদিকে ভয়ে ভয়ে দেখতে লাগল।

দেখলো, রাজার হাতিটা চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর সামনে যা পাচ্ছে, সব পেট ভরে খাচ্ছে। হাতিটাকে দেখে তার খুব হিংসে হল। কেমন আরাম হাতিটার। রাজা তার পিঠে চড়ে বেড়ায়। সে যদি ওই রকম হাতি হতো, তাহ'লে রাজা তার পিঠেও চড়ে বেড়াতো।

সেইদিন রাত্রে সাধুজির কাছে এসে সে বললে, "প্রভু, আমি আর বুনো শুয়োর হয়ে থাকব না। আমার আর এ-জীবন ভাল লাগছে না।"

"কেন রে? আবার কী হলো তোর?"

বুনো শুয়োরটা বললে, "আপনাকে অনেকবার আমি বিরক্ত করেছি। আমি সামান্য একটা ইঁদুর ছিলুম, আমার কথায় আপনি আমাকে বেড়াল করে দিলেন। তারপর আপনার দয়ায় আমি কুকুর হলাম। তারপরেও আমার সাধ মিটল না। আমার অনুরোধে আপনি আমায় হনুমান করে দিলেন। তাতেও আমার সাধ মিটল না, আপনি আমাকে বুনো শুয়োর করে দিলেন।"

সাধুজি বললে, "তা-তো আমি জানি, এবার আবার কী হতে চাস্?"

সে বললে, "হাতি! এবার আমি হাতি হতে চাই। ভেবে দেখেছি হাতিরাই সবচেয়ে সুখী। হাতি হতে পারলে রাজারা তার পিঠে চড়ে বেড়ায়। রাজারা বড় আদর করে হাতিকে। জীবনে যদি একবার হাতি হতে পারি তো রাজাও আমার পিঠে চড়বে—"

সাধুজি বললে, "কিন্তু তাকে যে বলেছিলুম বেশি বড় হতে চাস্‌নি, তাতে তোর খারাপ হবে!"

"আমার কী খারাপ হবে, তা-তো আমি বুঝতে পারছি না।"

"বলেছি তো বেশি লোভ করা উচিত নয়।"

বুনো শুয়োরটা বললে, "আমার এ তো লোভ নয়। আমি শুধু একটু ইজ্জত চাইছি। তার বেশি কিছু নয়"।

সাধুজি বললে, "ঠিক আছে, তোকে আমি হাতিই করে দিচ্ছি, তবে হাতি, হওয়ার মধ্যে কোনও ইজ্জত নেই, এইটে তোকে আমি বলে রাখছি। জানিস আমাদের শাস্ত্রে লেখা আছে—'অতি বাড় বেড়ো না, ঝড়ে উড়ে যাবে—', নে, এবার মাথাটা নিচু কর—"

বলে সাধুজি আবার নিজের কমণ্ডলু থেকে জল নিয়ে মন্ত্র পড়ে বুনো শুয়োরের গায়ে ছড়িয়ে দিলে। আর সঙ্গে-সঙ্গে বুনো শুয়োরটা মস্ত হাতিতে পরিণত হয়ে গেল। তখন হাতির সে কী আনন্দ। একেবারে আহ্লাদে আটখানা। এখন তার চেষ্টা হলো কী করে রাজার নজরে পড়া যায়।

সেইদিন থেকেই হাতিটা একা-একা বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে লাগল। একমনে সেই সেদিনকার দেখা রাজার কথাই ভাবতে লাগল সে। কেমন সুন্দর দেখতে রাজাকে। অনেক সৌভাগ্য থাকলে তবে অমন রাজাকে পিঠে নিয়ে ঘোরাঘুরি করা যায়। তার কী অত সৌভাগ্য হবে ?

সত্যি একদিন অত সৌভাগ্যই তার হল ! আবার দেশের রাজা লোক-লস্কর নিয়ে বনের মধ্যে একদিন শিকার করতে লাগল। সে তাদের কাছাকাছি ঘুরে বেড়াতে লাগল, যাতে রাজার নজরে পড়ে যায়। দূর থেকে রাজা হঠাৎ তাকে দেখতে পেলে। জিজ্ঞেস করলে, "ওই হাতিটা কোত্থেকে এল রে ? ওটা কার হাতি ?"

পেয়াদা বরকন্দাজরা তাকে দেখেছিল। তারা বললে, "ওটা কারোর হাতি নয় রাজামশাই, ওটা একটা বুনো হাতি ।"

রাজামশাই হুকুম দিলেন, "ওকে বাঁধ্‌, বেঁধে ফেল, তারপর আস্তাবল-বাড়িতে রেখে ওটাকে পোষ মানাবি—"

তা, যে কথা সেই কাজ। কিন্তু হাতিটা তো এই সুযোগই খুঁজছিল। তাকে ধরতে বেশি বেগ পেতে হল না কাউকে। বলতে গেলে সে নিজেই একরকম ধরা দিলে।

তারপর তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে রাজ-বাড়ির আস্তাবলে রেখে পোষ মানানোর চেষ্টা চলতে লাগল। কিন্তু সবাই দেখে আশ্চর্য হল যে, কত সহজে একটা বুনো হাতি পোষ মানলে। আগে অন্য হাতির বেলায় এত সহজ হয়নি পোষ মানানো। রাজার ঘোড়াশালে ঘোড়া, হাতিশালে হাতি। সে কী এলাহি কাণ্ড ! হাজারটা লোক সেই সব জানোয়ারদের সেবা করতে ব্যস্ত।

একটা হাতি নতুন হাতিকে দেখে জিজ্ঞেস করলে, "তোমাকে রাজা কী করে ধরলে ভাই ?"

হাতিটা বললে, "আমি বনের মধ্যে একা-একা চরছিলাম, ওরা আমাকে খপ্‌ করে ধরে ফেললে—"

"তা তুমি পালাতে পারলে না ?"

"না।"

"তোমাকে কী ওরা পায়ে দড়ি বেঁধে ধরলে ?"

"না, আমাকে সবাই মিলে লাঠি নিয়ে ঘিরে ফেললে, আর আমি পালাতে পারলুম না। শেষকালে আমার গলায় লোহার শেকল বেঁধে দিয়ে হিড়হিড় করে সবাই টানতে লাগল।"

"তা তুমি তাড়া করলে না কেন ওদের ?"

নতুন হাতিটা বললে, "আমি একলা আর ওরা অনেক লোক, আমি ওদের সঙ্গে পেরে উঠব কী করে ?"

"তুমি এত ছোট হাতি, তোমার তো একলা জঙ্গলে ঘোরাঘুরি করা উচিত হয়নি। তোমার মায়ের সঙ্গে ঘোরাই উচিত ছিল।"

নতুন হাতিটা বললে, "আমার তো মা নেই—"

"আহা! যার মা নেই তার কেউই নেই। যা হোক, এখানে থাকো, দু' দিন বাদেই সব সহ্য হয়ে যাবে।"

নতুন হাতিটা জিজ্ঞেস করলে, "এখানে খেতে দেয় ভাল ?"

"তা দেয়, সেদিক থেকে কোনও কষ্ট হবে না তোমার। শুধু মাঝে-মাঝে রাজা-রানীকে পিঠে চড়িয়ে ঘুরতে হবে ওইটেই যা একটু কষ্ট!"

নতুন হাতিটা বললে, " সে আর কষ্ট কিসের ? সে তো আরাম।"

"কেন, আরাম কেন ?"

"বা রে, রাজা-রানীকে পিঠে নিয়ে ঘুরবো, কত লোক রাজা-রানীকে সেলাম করবে, আর তার সঙ্গে আমিও সেলাম পাব—"

ওদিকে রাজামশাই একদিন মন্ত্রীকে ডাকলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "সেদিন যে জঙ্গল থেকে নতুন হাতিটা ধরে আনলুম, সেটার কী অবস্থা ?"

মন্ত্রী বললে, "আজ্ঞে রাজামশাই, সে খুব পোষ মেনেছে।"

"এত তাড়াতাড়ি পোষ মানল ?"

"আজ্ঞে পোষ মানাতে খুব মেহনত করতে হয়েছে।"

"সে কী ? হাতিটাকে দেখে তো মনে হয় না। মনে হয় বেশ নিরীহ।"

মন্ত্রী বললে, "দেখে এ-রকম অনেক কিছুই মনে হয়, কিন্তু আসল মূর্তি পরে বেরিয়ে পড়ে!"

"তা নিয়ে এসো তো তাকে আমার কাছে। দেখি কেমন পোষ মেনেছে হাতিটা। যদি দেখি পোষ মেনেছে, তাহ'লে ওর পিঠে চড়ে আমি রানীকে নিয়ে আজ বেড়াতে বেরোব!"

নতুন হাতিটাকে রাজার সামনে নিয়ে আসা হলো। তাকে দেখে রাজা খুব খুশি। মাহুত তাকে পা মুড়ে বসতে বলতেই সে পা মুড়ে বসলো। উঠতে বললে উঠে দাঁড়াল। শুঁড় তুলে সেলামও করলে রাজাকে। রাজা সব কিছু পরীক্ষা করে খুশি হয়ে বললে, "ওর পিঠে হাওদা লাগিয়ে দে—"

হাতির পিঠে সোনার জরি দিয়ে ঢাকা হাওদা লাগানো হলো। হাতিটা নিচু হয়ে বসল। প্রথমে রাজা উঠল হাতির পিঠে, তারপর হাত ধরে টেনে রাণীকে হাতির পিঠে উঠিয়ে নিলে।

হাতি খুব খুশি। সে আস্তে-আস্তে চলতে লাগল হেলে-দুলে। রাস্তার দু'পাশের লোকরা রাজা-রানীকে দেখে প্রণাম করতে লাগল।

প্রথম দিনটা এমনি কাটল। দ্বিতীয় দিনটাও তাই। কিন্তু তার কিছু-দিন পরেই মনে হল পৃথিবীতে সত্যিকারের সুখী যদি কেউ থাকে তো সে হচ্ছে রাজার বউ—রানী। তার সামনেই রাজা কত ভালবাসে রানীকে। অথচ রাজা তাকে তো কই ভালবাসে না। রানী হওয়ার অনেক সুখ! রানী হলে কত সোনার গয়না পরা যায়। সাধুজিকে বলে যদি একবার রানী হতে পারেতো তাহ'লেই তার জীবন সার্থক হয়ে যাবে। আর কখনও কিছু চাইবে না।

একদিন যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে তখন সে রাজার আস্তাবল থেকে বেরিয়ে কিছু না বলে বন-জঙ্গল পেরিয়ে একেবারে সাধুজির আশ্রমে এসে হাঁফ ছাড়ল। সাধুজি যখন সন্ধ্যের আগে আস্তানায় ফিরে এলো, তখন হাতিটা সাধুজির পায়ের ওপর নিজের সামনের পা দুটো বাড়িয়ে সটান শুয়ে পড়ল। সাধুজি জিজ্ঞেস করলে, "কী রে, কী হয়েছে তোর? আবার কী চাই?"

হাতিটা বললে, "প্রভু, এবার আমি রানী হতে চাই, আমাকে আপনি রানী করে দিন—"

"কেন রে? হঠাৎ আবার তোর রানী হবার সাধ হলো কেন?"

হাতিটা বললে, "হ্যাঁ প্রভু, আমি আপনার কৃপায় ছোট্ট ইঁদুর ছানা থেকে একেবারে মস্ত হাতি হয়েছি। কিন্তু সুখ পাইনি। ভেবেছিলুম হাতি হতে

পারলেই আমি সুখী হব। কিন্তু না, দেখলুম রাজা হাতির চেয়ে রানীকেই বেশি ভলেবাসে।"

সাধুজি বললে, "কিন্তু রাজা তোকে যদি বিয়ে করে তবেই তো তুই রানী হতে পারবি। আমি তোকে সুন্দরী মেয়ে করে দিতে পারি, রাজা যদি তোকে দেখে পছন্দ করে, তবেই তো তুই রানী হতে পারবি; কিন্তু তা করা তো আমার ক্ষমতায় নেই—"

"আজ্ঞে প্রভু, আপনি আমাকে সুন্দরী মেয়েই করে দিন, আমার রানী হওয়া সে আমার ভাগ্য—আপনি তা নিয়ে ভাববেন না—"

তা তাই-ই হল। আগের বারের মতো কমণ্ডলুর জলে মন্ত্র পড়ে তা হাতির গায়ে ছিটিয়ে দিতেই সে একটা সুন্দরী মেয়েতে পরিণত হল। আর এমন সুন্দরী হয়ে গেল যে-কেউ তাকে দেখবে, সেই-ই মুগ্ধ হবে!

"আমার নাম কী দেবেন প্রভু? এবার আমি তো মানুষ হয়েছি, এবার তো আমার একটা নাম চাই।"

সাধুজি বললে, "ঠিক আছে, তোর নাম দিলাম—সুন্দরী। খুশি তো?"

"হ্যাঁ প্রভু, এবার আমি খুব খুশি।"

বেশ আনন্দে দিন কাটতে লাগল সুন্দরীর। সাধুজি আস্তানা থেকে বেরিয়ে যাবার পর থেকেই সুন্দরী সেজেগুজে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। সাধুজি তাকে শুধু সুন্দরীই করেনি, মন্ত্র দিয়ে ভাল-ভাল কাপড়-গয়নাও করে দিয়েছে। তখন সুন্দরীর একমাত্র স্বপ্ন রাজার জন্যে অপেক্ষা করা। তা একদিন তার অপেক্ষা করা সার্থক হল।

সেদিন রাজা শিকার করতে এসেছিল জঙ্গলে। একটা হরিণের পেছনে ছুটতে-ছুটতে একেবারে সুন্দরীর সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। সুন্দরীর রূপ দেখে রাজা অবাক! এত রূপও কোনও মেয়ের হয়? তার নিজের রানীর চেয়ে রূপসী ও!

কাছে এসে সুন্দরীকে রাজা জিজ্ঞেস করলে, "তুমি কে?"

সুন্দরীর বুক তখন আনন্দে-রোমাঞ্চে ঢিবঢিব করছে।

কোনও রকমে তার মুখ বললে, "আমি এক সাধুর মেয়ে—"

"তোমার নাম কী?"

সুন্দরী বললে, "সুন্দরী!"

রাজা বললে, 'তোমার নামটা যেমন, দেখতেও তেমনি—সাধুজি কোথায় ?'

সুন্দরী বললে, "তিনি এখন নেই। জঙ্গলে তিনি রোজ এই সময়ে সাধন-ভজন করতে যান, বাড়ি ফিরতে ফিরতে বিকেল হয়ে যায়—"

"আমি তোমাকে রানী করতে চাই, তুমি রাজী ?"

"আপনি বাবাকে জিজ্ঞেস করবেন, তিনি যদি রাজী থাকেন তো আমার কোনো আপত্তি নেই—"

"ঠিক আছে—" বলে রাজা চলে গেল। বিকেলবেলা সাধুজি আশ্রমে ফিরে আসতেই সুন্দরী তাকে সব কথা বললে।

সাধুজি বললে, "তুই তাহলে রানী হবি ?"

সুন্দরী বললে, "হ্যাঁ প্রভু, রানী হওয়াই আমার শেষ ইচ্ছে। রানী হতে পারলে দেখবেন আমি আর কিছু চাইব না আপনার কাছে। আপনি এ-বিয়েতে আপত্তি করবেন না--'

পরের দিন যথাসময়ে রাজা এল সাধুজির কাছে। সাধুজি মত দিলে। রাজা সুন্দরীকে নিয়ে গেল নিজের প্রাসাদে। রাজা দ্বিতীয়বার বিয়ে করবে শুনে রাজ্যের সমস্ত লোক মহা খুশি। বিয়ের দিন মহা ধূমধাম। বিয়ের পর গোলমাল বাধল প্রথম রানীকে নিয়ে। প্রথম রানী তখন দুয়োরানী হয়ে গেছে সুন্দরীই হয়েছে রাজার কাছে সুয়োরানী। রাজা আর দুয়োরানীর কাছে যায় না। সুন্দরীর কাছেই সব সময়ে থাকে। সুন্দরীকেই রাজা বেশি ভাল বাসে।

দুয়োরানীকে তখন ঝি সব সময় সান্তনা দেয়। বলে "অত দুঃখ করো না রাণীমা, আমি তোমার সব দুঃখ দূর করব।"

দুয়োরানী জিজ্ঞেস করে, "তুই কী করে আমার দুঃখ দূর করবি ?"

ঝি বলে, "দেখ না, আমি কী করি!"

"কী করবি তুই বল না—"

ঝি বললে, "আমি ছোটরানীর দুধে ধুতরোর বিষ মিশিয়ে দেব—"

"যদি কেউ জানতে পারে ?"

"কে আর জানতে পারবে ? আর জানতে পারলেই বা কী ? বাড়ির কেউই তো ছোটরানীকে দেখতে পারে না।"

তা শেষ পর্যন্ত সেই সর্বনাশই হল। একদিন সকালে যেমন সুন্দরী দুধ খায়, তেমনি খাবার পরই কেমন গা-বমি-বমি করতে লাগল আর রাত হবার আগেই সে মারা গেল। বৈদ্য-কবিরাজ এসে কত চেষ্টা করলে বাঁচাতে, কিন্তু কিছুতেই আর সুন্দরীকে বাঁচানো গেল না।

রাজা খুব মুষড়ে পড়লো। সোজা সাধুজির কাছে গিয়ে সব খবর জানালে। সাধুজি সান্ত্বনা দিয়ে বললে, "রাজন্, আপনি দুঃখ করবেন না। যা ওর কপালে ছিল তাই-ই ঘটেছে। আসলে ওর শরীরে রাজ-রক্ত ছিল না। ও এককালে ছিল একটা ছোট নেংটি ইঁদুর। ওর ইচ্ছেতেই ওকে একদিন আমি বেড়াল করে দিয়েছিলুম। তারপর ওর পীড়াপীড়িতেই আমি ওকে কুকুর করে দিয়েছিলুম। তারপর কুকুর থেকে ওকে করেছিলুম হনুমান। তারপর হনুমান থেকে বুনোশুয়োর। বুনোশুয়োর থেকে করেছিলুম হাতি। কিন্তু তাতেও ওর মনে সুখ ছিল না। হাতি হয়ে ওর মন ভরল না, রাণী হতে চাইল। আমি ওকে কত সাবধান করে দিয়েছিলুম। বলেছিলুম, অত উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকা উচিত নয়। কিন্তু নিয়তি কে খণ্ডাবে— এখন আপনি আপনার প্রথম রাণীকে আবার গ্রহণ করুন। আর আমার সুন্দরী যদিও মারা গেছে, কিন্তু তবু ঈশ্বরের আশীর্বাদে আমি ওকে অমর করে রাখব।"

"কী করে ?"

সাধুজি বললে, "ওকে আপনি শ্মশানে নিয়ে গিয়ে পোড়াবেন না। দশ হাত একটা গর্ত খুঁড়ে ওকে মাটিতে পুঁতে ফেলুন। তারপর চারিদিকে বাঁশের বেড়া দিয়ে দিন। আর ওকে যেখানে পুঁতবেন, তার ওপরে চোদ্দ দিন ধরে ঘড়া-ঘড়া জল ঢালতে বলবেন। এক মাস পরে ওর হাড়-মাংস থেকে একটা চারাগাছ জন্মাবে। সেই গাছের চারা যখন লোকে দেখবে, তারা ও-গাছের নাম দেবে 'পোস্ত'। ওই গাছ থেকে এমন একটা ওষুধ তৈরি হবে যার নাম হবে 'আফিম'। মানুষ চিরকাল ধরে ওই ওষুধ খেয়ে সমস্ত রকমের রোগ সারাবে। কেউ-কেউ ওই ওষুধ গিলে খাবে, কেউ কেউ বা ওটাকে আগুন জ্বালিয়ে ওর ধোঁয়া খাবে। ওটা খেলে মানুষের খুব নেশা হবে। আর ওটা যারা গিলে খাবে বা ওর ধোঁয়া টানবে তাদের সকলের মধ্যে ওই সব জন্তু-জানোয়ারের গুণ থাকবে। যেমন তারা

ইঁদুরের মত চালাক হবে, বেড়ালের মত দুধ খেতে ভালবাসবে, কুকুরের মতো ঝগড়াটে হবে, হনুমানের মতো কুৎসিত হবে, শুয়োরের মতো অসভ্য হবে আর রানীর মতো মেজাজ হবে—"

* * *

বাবা গল্প শেষ করলেন। বললেন, "এই হলো আফিমের জন্ম-কথা। হরিহর মুখুজ্যে ঠিক এই রকম মানুষই ছিল, তোমরা তো সবাই তা দেখেছো, আমি আর কী বলব। তাই আমি হরিহরকে অনেকবার আফিম ছেড়ে দিতে বলেছিলুম, কিন্তু যার যা নিয়তি তা কে খণ্ডাবে?"

———

কেষ্ট যাকে রাখে, তাকে কেউ মারতে পারে না।

এ প্রবাদটা প্রত্যেক বাঙালীই শুনেছে, এ এমন কিছু নতুন কথা নয়। এ প্রবাদটা সবাই-ই জানে, কিন্তু কেউ-কেউ বিশ্বাস করে না।

কিন্তু অমরের মত এমন করে রক্ত দিয়ে আর কেউ এ-কথাটা উপলব্ধি করেনি। গ্রামে যখনই গিয়েছি তখনই অমরকে দেখে আমার কেবল এই কথাটাই মনে হয়েছে।

চাষার ছেলে অমর। বলতে গেলে অমর-রা সাত-পুরুষের চাষা। কিন্তু তা বলে গরীব নয় তারা। বেশ অবস্থাপন্ন। তাদের বাড়িতে গোয়ালে গরু, গোলাতে ধান, পুকুরে মাছ, বাগানে শাক-সব্‌জি। বলতে গেলে একটা সংসারের মোটামুটি যা-যা জিনিস দরকার, সব তাদের বাড়ি থেকেই আসতো, তার জন্যে বাজারে যেতে হতো না তাদের।

তারপর কাজ! কাজের কথা বলতে গেলে প্রথমেই দেখতাম বাড়ির সবাই নিজের হাতে কাজ করতো। টাকা পয়সা আছে বলে যে মাইনে করে লোক রাখবে তা নয়। নিজের হাতে লাঙল ধরতে অমর লজ্জা করতো না।

ছোটবেলায় অমরের সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল। যখনই দেশে যেতুম তখনই ওদের বাড়িতে চলে যেতুম। ওদের বাড়িতেই আমার সব সময়টা কাটতো। কথাও কখনও ওর সঙ্গে ওদের ছোলার ক্ষেতে চলে যেতুম। মনে আছে ক্ষেতের আলোর ওপর বসে কাঁচা ছোলা খেতে আমার খুব ভালো লাগতো। কখনও যেতুম ধানের আর পাটের ক্ষেতে। অমর লাঙল চালাতো আর আমি ওর পেছনে-পেছনে সারা ক্ষেতটা ঘুরতুম। শহর থেকে গ্রামে গিয়ে যেন

শেকল-ছাড়া পাখীর মত চারদিকে উড়ে বেড়াতুম। অমর যখন আমগাছের একেবারে মগ্‌ডালে উঠে যেত তখন আমার ভয় লাগতো।

আমি বলতুম—ওরে, নেমে আয়, পড়ে যাবি—

অমর হাসতো। বলতো—না, পড়ে যাবো না—

* * *

বলে আরো ওপরে উঠে যেত। পাতলা-পাতলা ডাল। সেই ডাল ভেঙে গেলে একেবারে পঞ্চাশ-ষাট হাত নীচেয় পড়ে হাড়-গোড় ভেঙে যেতে পারে। হয়ত বুকে ধাক্কা লেগে মরে যেতেও পারে।

অমর আমার ভয় পাওয়া দেখে হো-হো করে হেসে উঠতো। বলতো—দূর, আমি কখনও মরে যেতে পারি ? আমার নাম যে অমর—

পৃথিবীর কত লোকের 'অমর' নাম ছিল, আর তারা যে সবাই কবে মরে ভূত হয়ে গেছে, তা অমরও জানতো। কিন্তু অমর ভাবতো ও যেন মরে যাবার জন্যে পৃথিবীতে জন্মায়নি। বলতো—দেখিস, আমি দেড়শো বছর বাঁচবো—

বলতুম—কীসে বুঝলি তুই ?

অমর বলতো—আমার গায়ে কত ক্ষমতা জানিস ? আমি এক ঘুঁষিতে একটা বাঘ মারতে পারি।

—তুই বাঘ মেরেছিস কখনও ?

অমর বলতো—বাঘ মারিনি, কিন্তু বুনো শূয়োর মেরেছি—

বলে আমাকে বুনো শূয়োর মারার গল্প বলতো। গ্রামে অনেক রকম জন্তু-জানোয়ার আছে। একবার নাকি একটা বুনো-শূয়োর অমরকে তাড়া করে ছিল। তাড়া খেয়ে একটা খেজুর গাছে উঠে পড়েছিল অমর। নীচে তখন বুনো শূয়োরটা ওর দিকে চেয়ে ওৎ পেতে আছে। নড়েও না, চড়ে না।

হঠাৎ অমর দেখলে বুনো-শূয়োরটা খেজুর গাছ বেয়ে ওপরে ওঠবার চেষ্টা করছে। ওপরে উঠে বুনো-শূয়োরটা একবার যদি অমরের নাগাল পায় তো আর দেখতে হবে না। অমর তাড়াতাড়ি বুনো-শূয়োরটার ওপর আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়লো। আর অমর যে আচমকা এমন কাণ্ড করে বসবে তার জন্যে বুনো-শূয়োরটা বোধহয় তৈরি ছিল না। তাই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। আর অমর ততক্ষণে বুনো-শূয়োরটার দু'চোখে আঙুল পুরে দিয়ে তাকে অন্ধ

করে দিয়েছে। আর তারপর সেই অন্ধ বুনো-শূয়োরটাকে ঘুঁষি মারতে মারতে কাবু করে ফেললে।

এ-রকম গল্প অমরের কাছে অনেক ছিল।

আসলে গল্প নয় এগুলো, সত্যি ঘটনা। অমরকে গাঁয়ের সবাই ডানপিটে বলে জানতো। অমরের বাবাও বলতো—তুই দেখছি কোনদিন বেঘোরে প্রাণ হারাবি রে। তোর জন্যেই আমার যত ভাবনা—

অমর শুনে হাসতো। বলতো—তাহ'লে আমার নাম 'অমর' রেখেছিলে কেন তুমি?

অমরের বাবা বলতো—ওই নাম রাখাই আমার ভুল হয়েছে। তখন কী জানতুম তুই বড় হয়ে এত ডানপিটে হবি?

তা অমরের ডানপিটে হবার কারণও ছিল। তার শরীরটা ছিল তাগড়াই। খেতেও পারতো সে খুব। তিনটে কাঁঠাল তাকে একসঙ্গে খেয়ে হজম করতে দেখেছি। ভাত যখন সে খেত, তখন থালায় ধরতো না। তার ওপর ছিল সেই পরিমাণ ডাল-তরকারি মাছ-মাংস। এ হেন ছেলেকে যে অমন করে প্রাণ দিতে হবে, আমরা কেউই ভাবিনি।

অমরের বাবা বিশ্বম্ভর ঘোষ যখন ক্ষেতের কাজে যেত অনেক সময় অমরকেও নিয়ে যেত। ক্ষেতের কাজ অনেক সময়ে একলা হয় না। খেজুর গাছ থেকে রসের হাঁড়ি পাড়া, সেই রস উনুনে জ্বাল দেওয়া, জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরি করার সময় হাতের কাছে একজন লোক লাগে। অমর ছাড়া বাবার সঙ্গে আর কে যাবে? বলতে গেলে বাবার চেয়েও ছেলের গায়ে বেশি জোর ছিল। কারণ বাপ বুড়ো হতে চলেছে তখন।

সেদিন হলো কি ভোরবেলা বিশ্বম্ভর ঘোষ পাটের ক্ষেতে যাবার সময় অমরকে ডেকেছে সঙ্গে যাবার জন্যে। দশ বিঘে জমিতে পাট বুনেছে বিশ্বম্ভর ঘোষ। মানুষের মাথার সমান বড় হয়েছে পাটগাছগুলো। বড় হলেই পাট গাছে পোকা হয়। সেই পোকা মারবার তেল হলো 'ইন্‌ড্রেন'। পিচকিরি দিয়ে পাটের গাছগুলোর ওপর ইন্‌ড্রেন ছড়ালে সব পোকা মরে যায়। সব চাষীই এ-কাজ করে। এ না করলে পাটের দর পাওয়া যায় না। এত খেটে খুটে জলে-বৃষ্টিতে-রোদে প্রাণ বার করে তৈরি করা গাছ পোকায় খেয়ে যাবে, তা কী করে সহ্য হয়।

বাপ-বেটায় ভোরবেলা বেরোল পাটের ক্ষেতের দিকে। বাড়ি থেকে ক্রোশ দু'এক দূরে বিশ্বম্ভরের পাটের ক্ষেত। আশে-পাশে, সামনে-পেছনে যে দিকে চাও শুধু ক্ষেত আর ক্ষেত। হয় পাট, নয়তো ধান। দূর থেকে শুধু সবুজের মেলা। একবার একটু হাওয়া হলে মাইলের পর মাইল গাছগুলো দুলে দুলে ওঠে। তখন ভারি ভালো দেখায়।

কিন্তু ও-সব বাহার দেখবার সময় বা চোখ কিছুই নেই চাষীদের। তাদের চোখ তখন শুধু গাছের দিকে। বাপ-ছেলে দু'জনেই সেই দশ বিঘে পাটের ক্ষেতে গিয়ে 'ইনড্রেন' ছড়াতে লাগলো। 'ইনড্রেন' হলো বিষ। মানুষের পেটে একবার গেলে আর রক্ষে নেই। সঙ্গে-সঙ্গে মৃত্যু। কিন্তু ইন্‌ড্রেন ছড়ালে গাছের কোন ক্ষতি নেই, গাছের পোকা সব মরে ভূত হয়ে যায়।

বিশ্বম্ভর তেল ছড়ায় একটা দিকে, আর অমর তেল ছড়ায় অন্য একটা দিকে! দশ বিঘে জমি। সব গাছে তেল ছড়ানো চারটিখানি কথা নয়। তেল ছড়াতে-ছড়াতে হাত টন্‌টন্ করে ওঠে, বুকে-পিঠে ব্যথা ধরে যায়।

মাথার ওপর সূর্যটা আরো জ্বল-জ্বল করে ওঠে। বেলা বাড়বার সঙ্গে-সঙ্গে বাপ-ছেলের মাথাও রোদ্দুরে তেতে ওঠে। শেষকালে এমন অবস্থা হয় যে জল তেষ্টায় বুকের ছাতি ফাটে-ফাটে।

কিন্তু তখনও কয়েক বিঘে জমি বাকি। এক দিকটা শেষ হয়ে যাবার পর আর একটা দিকে তখনও তেল ছড়াতে হবে। বিশ্বম্ভর ঘোষ চাষী হলেও বুড়োমানুষ। সারা জীবন ক্ষেতের কাজ করে করে হাড়মাস পেকে গেছে বটে, কিন্তু বয়েসেরও তো একটা ধর্ম আছে! সে তার অধিকার ছাড়বে কেন?

বিশ্বম্ভর ঘোষ ছেলেকে ডাকলে। বললে—আমি চললুম রে, আমার ভারি জলতেষ্টা পেয়েছে। বাকিটা তুই তাড়াতাড়ি সেরে বাড়ি ফিরিস।

দূর থেকে অমরও বললে—আমি পরে যাবো, তুমি এখন যাও—

বাবা বাড়ি চলে গেল। অমর তখনও তেল ছড়িয়ে চলেছে। পিচ্‌কিরিটা দুই হাতে ধরে, আর সামনের দিকে চোখ। প্রায় গলা পর্যন্ত উঁচু পাট গাছের ঘন জঙ্গল। পায়ের তলায় কিছু দেখা যায় না। মাথা উঁচু করে সামনের দিকে নজর রাখতে হয়। তারপর মাথার ওপর সূর্যটা আরো অসহ্য হয়ে উঠলো। যেন আগুনের হল্‌কা চলেছে হাওয়ায়। মাথা পুড়ে যাচ্ছে, পেটে চন্‌চন্ করছে ক্ষিধে, কিন্তু কোনও উপায় নেই আর তখন। বাকিটাতে

তেল ছড়িয়ে তবে কাজ খতম। হঠাৎ মনে হলো পায়ে যেন কী কামড়ালো।

কী কামড়ালো পায়ে ? সাপ নাকি ?

যা ভেবেছে তাই-ই। অমর পায়ের দিকে চেয়ে দেখতেই নজরে পড়লো একটা কাল-কেউটে সাপ পাটগাছের ঘন জঙ্গলের মধ্যে এঁকে-বেঁকে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। ঘটনাটা যেমন আচমকা ঘটলো, তেমনি আচমকা ঘটনাটার গুরুত্বটাও বুঝে ফেললে অমর। কাল-কেউটে কামড়ানোর মানেই হলো নির্ঘাত মরণ। শিবেরও সাধ্যি নেই যে তাকে বাঁচায়। সঙ্গে-সঙ্গে কাপড়ের একটা খুঁট ছিঁড়ে পায়ের হাঁটুর নীচে বেঁধে ফেললে অমর। কিন্তু সাপের বিষ বোধহয় তার আগেই শরীরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। কাল-কেউটের বিষ কোথাও কামড়ালে সঙ্গে-সঙ্গে একেবারে মাথায় গিয়ে পৌঁছোয়।

অমর তখন কী করবে বুঝতে পারছে না। মাথাটা ঘুরছে, পা টলছে। ওখান থেকে যদি গলা ফাটিয়ে চেঁচায়ও, তবু সে আওয়াজ কারোর কানে পৌঁছোবে না। চারদিকে মাইলের পর মাইল কোথাও বসতি নেই। কেবল ক্ষেত আর ক্ষেত। যারা সকালে ক্ষেতে কাজ করতে এসেছিল, তারাও ভাত খেতে সবাই যে-যার বাড়ি চলে গেছে তখন। আর সেই অবস্থায় যদি দৌড়তে দৌড়তে বাড়ি যায়, তাতেও কম সময় লাগবে না। তারপর সেখান থেকে হাসপাতাল। ততক্ষণ এই মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করবে সে কী করে ?

অমরের মনে হতে লাগলো সে আর বেশিক্ষণ বাঁচবে না। যন্ত্রণা যে এত অসহ্য হতে পারে, তা আগে তার জানা ছিল না। মাথা থেকে পা পর্যন্ত কট্-কট্-ঝন্‌ঝন্ করছে। শরীরের শিরাগুলো ফুলে-ফুলে বুঝি এবার ফেটে যাবে। মাথার ওপর কাঠ-ফাটা রোদ, তলায় আগুন আর সারা শরীরে মৃত্যু-যন্ত্রণা।

কোথায় যায় অমর, কাকে ডাকে, তা ঠিক করতে পারলে না।

তখন কিছু উপায় না পেয়ে সে ভগবানকে ডাকতে লাগলে—ভগবান, আমাকে বাঁচাও, আমি আর কষ্ট সহ্য করতে পারছি নে—

কিন্তু চাষীদের ওপর বোধহয় ভগবানও বিরূপ। আর তাছাড়া তখন অমরের মনে হলো ভগবান বলে কেউ থাকলে তবে তো তার কথা শুনবে। তখন যত সময় যাচ্ছে, ততই অধৈর্য হয়ে উঠছে অমর। আর কতক্ষণ! আর কতক্ষণ পরে মরণ আসবে তার! আর কতক্ষণ ধরে তাকে মরণের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে! হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি এলো!

এতক্ষণ কেন সে কষ্ট পাচ্ছে মিছিমিছি! কষ্ট কমাবার উপায় তো তার হাতে রয়েছে। তার কাছেই তো ক্ষেতের পোকা মারবার বিষ রয়েছে। 'ইন্‌ড্রেন' রয়েছে। মরবেই সে যখন, তখন তাড়াতাড়ি মরবার উপায় তো রয়েছে তার হাতে। সেটা খেলেই তো সে যন্ত্রণার হাত থেকে ছাড়ান পায়। তবে কেন সে এত ছট্‌পট্ করছে যন্ত্রণায়?

মাথায় বুদ্ধিটা আসতেই সে সঙ্গে-সঙ্গে 'ইন্‌ড্রেনে'র শিশিটাতে যেটুকু তেল বাকী পড়ে ছিল, সবটুকু ঢক্‌ঢক্ করে গলায় ঢেলে দিলে।

আর ঢেলে দেবার সঙ্গে-সঙ্গেই সে সেখানে ঢলে পড়লো।

কিন্তু অনেকক্ষণ কেটে গেল, তবু তো সে কই মরছে না।

অমর অবাক হয়ে গেল কাণ্ড দেখে। সে বরাবর শুনে এসেছে ইন্‌ড্রেন খেলে সঙ্গে-সঙ্গে মৃত্যু। কিন্তু কই, সে তো ঠিক বেঁচেই রয়েছে।

আরো একটা আশ্চর্য ব্যাপার—তার যন্ত্রণাটা যেন আস্তে-আস্তে কমছে।

ওদিকে বিশ্বম্ভর ঘোষ বাড়িতে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও ছেলের দেখা পেলে না। হলো কী তার? বাড়ি ফিরতে এত দেরি হচ্ছে কেন তার! যেটুকু জমিতে তেল দিতে বাকী ছিল, তা সে সামান্য। সেই সামান্য জমিতে তেল ছড়াতে তো এত সময় লাগবার কথা নয়!

তবে কী হলো? বিশ্বম্ভর ঘোষ বেরোল বাড়ি থেকে। গিন্নীকে বললে—দেখে আসি এত দেরি করছে কেন অমর—কী হলো তার—

রাস্তাতেই ছেলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ছেলে তখন দৌড়তে-দৌড়তে বাড়ির দিকে আসছে। বিশ্বম্ভর বললে—কী রে, কী হয়েছে?

অমর বললে—বাবা, আমায় সাপে কামড়েছে—

—সে কী রে? কী সাপ?

—কাল-কেউটে! পাটের ক্ষেতে লুকিয়ে ছিল, আমি দেখতে পাইনি, তার গায়ে পা দিয়েছিলুম—

বিশ্বম্ভর ঘোষের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো। সে তাড়াতাড়ি ছেলের হাত ধরলে—তাহলে চল্-চল্, সূর্যনগরের হাসপাতালে যেতে হবে, এখুনি চল্—

তখন খাওয়া-দাওয়া মাথায় উঠলো। কাল-কেউটে কামড়ালে কী আর বাঁচাতে পারা যাবে? রাস্তায় কোনক্রমে একটা গরুর গাড়ি পাওয়া গেল। গরুর গাড়িটা রেল বাজারের দিকে যাচ্ছিল সওদা করতে। গাড়োয়ান

বিশ্বম্ভরের চেনা লোক। দু'জনকে গাড়িতে তুলে নিয়ে ছুটে চলতে লাগলো। সূর্যনগরে পৌঁছতে আরো ঘণ্টা দুয়েক লেগে গেছে। তাড়াতাড়ি ছেলেকে নিয়ে হাসপাতালে গিয়ে দেখলে ডাক্তার নেই, তার নিজের কোয়ার্টারে খেতে চলে গেছে।

কিন্তু উপায় নেই। গ্রামের ডাক্তার, রোগী যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ই করুক আর মারাই যাক, ডাক্তারের তেমন মাথা-ব্যথা নেই।

তবু ভেতরে খবর পাঠালে বিশ্বম্ভর। ডাক্তারবাবু যেন দয়া করে তাড়াতাড়ি আসেন। কারণ সাপে-কামড়ানো রোগী।

অমরকে বিশ্বম্ভর জিজ্ঞেস করলে—কী রে, কেমন বোধ করছিস?

অমর বললে—আর যন্তরনাটা হচ্ছে না—

বিশ্বম্ভর বললে—সে কী রে, কেউটে সাপ কামড়েছে আর তুই বলছিস যন্তরনা হচ্ছে না? কামড়েছে তো ঠিক? তুই সাপটাকে দেখেছিস্?

অমর বললে—সাপটাকে তো আমি পালিয়ে যেতে দেখলুম, আর পায়ে যেখানটায় কামড়েছিল, সেখানে তো এখনও রক্ত বেরোচ্ছে—

তা বটে! সাপে কামড়ালে যেমন রক্ত বেরোয়, তেমনি রক্ত তখনও পা থেকে বেরোচ্ছে। সেই জায়গাটার চারদিকে কালো দাগ হয়ে গেছে। আর অমর নিজেই হাঁটুর ওপরে বুদ্ধি করে ন্যাকড়া দিয়ে কষে বেঁধে ফেলেছে। বিষটা ওপরে উঠতে পারেনি, যন্ত্রণা কমে গেছে।

ততক্ষণে ডাক্তারবাবু এসে হাজির হলেন। এসে সব কিছু জিজ্ঞেস কর-লেন। সব জেনে নিয়ে অমরকে পরীক্ষা শুরু করলেন।

কিন্তু না, এক ফোঁটা বিষ পাওয়া গেল না শরীরে। কী আশ্চর্য!

বললেন—না, শরীরে বিষ নেই—

বিশ্বম্ভর অবাক হয়ে গেল। বললে—হুজুর, ভালো করে দেখুন আর এক বার, আমার এই এক ছেলে—

ডাক্তারবাবু বললেন—বিষ না থাকলে আমি কী দেখবো?

তারপর কী যেন ভাবলেন। অমরকে জিজ্ঞেস করলেন—সাপে যখন কামড়ালো তখন তুমি কী করলে, মনে আছে?

অমর বললে—আজ্ঞে, আমি ধুতির খুঁট ছিঁড়ে ফেলে হাঁটুর ওপরে তাগা বেঁধে ফেললুম—

—তারপর ?

অমর বললে—তারপর অসহ্য যন্তরনা হতে লাগলো। আমার কাছে 'ইনড্রেন ছিল বোতলে। সে যন্তরনা সহ্য করতে না পেরে যেটুকু ইনড্রেন ছিল সবটুকু মুখের মধ্যে ঢেলে দিলুম। ভাবলুম মরবোই যখন, তখন আর মিছিমিছি কেন মরণ-যন্তরনা সহ্য করি।

এতক্ষণে ডাক্তারবাবু স্বস্তির হাঁফ ছাড়লেন।

বললেন—বুঝেছি, তোমার আর কোনও ভয় নেই। বিষে-বিষে বিষক্ষয় হয়ে গেছে। তোমার কাছে যেটুকু ইনড্রেন ছিল সেইটুকু বিষই দরকার ছিল সাপের বিষ কাটাবার জন্যে। তার চেয়ে বেশী ইনড্রেন থাকলে তুমি তাও খেয়ে ফেলতে। তখন তোমার মৃত্যু হতে পারতো। আসলে ইনড্রেন তোমায় বাঁচায়নি, বাঁচিয়েছে ভগবান। সেই যে কথায় আছে না—রাখে কেষ্ট, মারে কে ? তোমারও তাই হয়েছে—যাও বাড়ি চলে যাও।

———

মানুষ যেমন বদলায়, মানুষের সমাজও তেমনি বদলায়। মানুষের স্বভাব, চাল-চলন, রুচি, রুচির মানদণ্ডও যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে বদলে যায়। কিন্তু কয়েকটা জিনিস বদলায় না। যেমন সূর্য। সূর্য আগেও যেমন আলো দিত এখনও তেমনি করেই আলো দেয়। সে এখনও আগেকার মত পূর্বদিকে ওঠে আর পশ্চিমদিকে অস্ত যায়। শুধু কী সূর্য?

সমুদ্রও তাই। কত লক্ষ-কোটি বছর পার হয়ে গেছে, তবু সমুদ্রের জলের রং সেই আজও নীলই আছে। আদি যুগে সমুদ্রের জলের যে রং ছিল এখনও তাই। আজ থেকে কোটি বছর পরেও তা আর লাল রং-এর হবে না, হলদে রং-এরও হবে না। এখনকার মতন সেই নীলই থাকবে বরাবর॥ এই-ই নিয়ম।

যা চিরকালের সাহিত্য তার সম্বন্ধেও সেই একই কথা খাটে। সমাজ বদলায়, মানুষও বদলায়, মানুষের আচার, ব্যবহার, পোশাক, পরিচ্ছদ-সমাজ-ব্যবস্থা বদলায়। কিন্তু সাহিত্য বদলায় না। মহৎ সাহিত্যের আবেদন তাই চিরকাল একই সমান। সেই রকম একজন মহৎ সাহিত্যের স্রষ্টার কথা তোমাদের বলি।

* * *

গ্রামের ছোট একটা পোস্টাফিস। তার চেয়েও ছোট এক পোস্টমাস্টার। রেলের স্টেশনের ধারে বসে মাস্টারমশাই কাজ করেন। আশে-পাশে ছ'সাত মাইলের মধ্যে যত গ্রাম আছে, সমস্ত গ্রামের আশা-ভরসা বলতে ওই এক চিল্‌তে ডাকঘর। ডাকঘরের একজন মাত্র ডাক-পিওন। সেই ডাক-পিওনকেই গ্রামে-গ্রামে চিঠি বিলি করে বেড়াতে হয়। সকালবেলায় বেরোয় সে চিঠি বিলি করতে, আর ফেরে সেই সন্ধ্যেবেলা। যখন কাজকর্ম সব সারা হয়ে যায়।

তা চিঠিপত্র তেমন আসেও না পোস্টাফিসে। তখনকার দিনে চিঠি-পত্র

লেখার অত রেওয়াজ ছিল না। গ্রামের মানুষ ছিল সরল, তাদের চাহিদাও ছিল কম। অল্পতেই খুশী থাকার বিদ্যে তাদের জানা ছিল।

আর তাছাড়া একখানা পোস্টকার্ডের দামই কী কম ছিল নাকি! একটা পোস্টকার্ডের দাম তখন ছিল এক পয়সা। সেই একটা পয়সাই বা কোত্থেকে আসে যে মানুষ খামোখা চিঠি লিখে তা নষ্ট করবে?

যেদিন গ্রামে হাট হতো সেদিন ডাক-পিওন আসতো। আশেপাশের গ্রাম থেকে লোকে হাট করতে আসতো আর ডাক পিওন তাদের হাতে-হাতে চিঠি দিয়ে দিত। গ্রামের কোনও অবস্থাপন্ন মোড়লের বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে এসে উঠতো ডাক-পিওন। সেখানে জলখাবারের বন্দোবস্ত ছিল তার জন্যে। জলখাবার মানে একটা বাটিতে কিছু গুড়-মুড়ি, আর একটা কাঁসার গেলাসে ঠাণ্ডা জল। কখনও-কখনও বা তার সঙ্গে দু'টো বাতাসা। যদি কারো পোস্টকার্ড কেনবার দরকার হতো, তাও পাওয়া যেত তার কাছে। কিন্তু একবার হলো কী সেই গ্রামে এল এক টেলিগ্রাম।

টেলিগ্রাম! চিঠি মাঝে-মধ্যে আসে গ্রামে। কারো ছেলে বাড়ি থেকে পালিয়ে শহরে গেছে, তার আর কোনও খোঁজ-খবর নেই। হঠাৎ বছর দশেক বাদে হয়ত তার চিঠি এসে হাজির হলো। তাতে লেখা আছে যে, সে ভালো আছে। বাড়ি ফিরে আসতে চায়। তার জন্যে টাকা পাঠাতে বলেছে বাপকে। কিম্বা গুরুদেব কাশী কি শ্রীক্ষেত্র থেকে লিখেছেন যে, তিনি অমুক তারিখে অমুক তিথিতে শিষ্য-বাড়িতে পায়ের ধুলো দেবেন। শিষ্য যেন পাল্‌কি নিয়ে দেউলটি স্টেশনে হাজির থাকে।

এ সবও কালে-ভদ্রে। মোট কথা সাম্‌তাবেড় এমনই এক অজগ্রাম যেখানে ডাক-পিওন না এলেও কারো কোনও লোকসান হয় না; বরং এলেই বিপদ! সে-গ্রামে কারো চিঠি পাবারও দরকার হয় না, চিঠি পাঠাবারও দরকার হয় না। এই রকম এক গ্রামে টেলিগ্রাম আসা এক অভাবনীয় ঘটনা।

যার নামে টেলিগ্রাম সে তো ভেবেই অস্থির। কে তাকে টেলিগ্রাম করেছে? টেলিগ্রামে কী লেখা আছে?

অনেক লোক এসে জুটলো। সবাই জড়ো হলো মোড়লমশাই-এর চণ্ডীমণ্ডপে! মোড়লমশাই টেলিগ্রামের কাগজখানা হাতে নিয়ে সকলকে দেখাতে লাগল। সবাই দেখলে। লাল রঙের কাগজ। ভেতরে ইংরিজী

অক্ষরে গুটিকতক কী সব লেখা। কেউ বাংলা লেখাপড়াই জানে না, তার ওপর আবার ইংরিজী। তাদের কাছে বাংলাও যা, ইংরিজীও তাই। ডাক পিওনকে সবাই ধরলে—আপনি পড়ে দিন দাসমশাই—

দাসমশাই মানে হরিপদ দাস। দাসমশাই-এর বিদ্যেও ওই পর্যন্ত। নেহাৎ মাস্টারমশাই নিজে নাম, ঠিকানা দেখে সমস্ত বুঝিয়ে দেন তাই তার চাকরি বজায় আছে। নইলে আট টাকা মাইনের গাঁয়ের ছোট ডাকঘরে সে পিওনের কাজ করছে?

দাসমশাই বললে—ওরে বাব্বা, আমি যদি ইংরিজীই পড়তে পারবো তো এই ডাক পিওনের চাকরি করি? বলে আর দাঁড়াল না সেখানে। কাজ সেরে আবার অফিসের দিকে ফিরে গেল। তাকেও অনেক রাস্তা ভেঙে তবে তার বাড়ি ফিরতে হবে!

গ্রামের লোক মহা মুশকিলে পড়লো। টেলিগ্রামটা একজনের নামে এসেছে। কিন্তু দায়টা যেন সকলের। সকলেই ভাবনায় পড়লো কে টেলিগ্রাম-টার পাঠোদ্ধার করে দেবে, কে টেলিগ্রামটার মানে করে দেবে! সঙ্গে-সঙ্গে খোঁজ পড়লো গ্রামে ইংরিজী জানে, এমন একজনের যার শ্বশুরবাড়ি হালিশহরে। কিন্তু তার শ্বশুর-শাশুড়ি বেঁচে নেই। তার বউ বললে—আমার দাদা কলকাতায় চাকরি করে, সেও ইংরিজী জানে—

কোথায় হালিশহর, কোথায় সাম্‌তাবেড় আর কোথায় কলকাতা। একটা টেলিগ্রাম পড়াতে তো এতগুলো টাকা খরচ করা যায় না!

একজন বললে—আমার বড় মামা আলিপুর কোর্টের পেশকার, আমি বড় মামাকে একটা চিঠি লিখে দিলেই এসে টেলিগ্রামটা পড়ে দিয়ে যেতে পারে—

অন্য একজন প্রতিবেশী হেসে উঠলো। বললে—দূর, সে হয় না, অত সময় কোথায়? তার ওপর এক গাদা টাকা খরচা। আসা-যাওয়ার খরচা গাড়িভাড়া লাগবে না?

কিছুতেই সমস্যার সমাধান হয় না। হাট-বাজার মাথায় উঠলো সকলের। মোড়লমশাইও উঠলো। বললে—তোমরা এখন এসো হে, কাল সকালে ভেবে-চিন্তে যা-হোক করবো। এত তাড়াতাড়ি মাথায় আসছে না বুদ্ধি—

যার নামে টেলিগ্রাম এসেছে, তারই বলতে গেলে আসল মাথাব্যথা! কী যে তার কপালে লেখা আছে, ভগবানই জানে। এত লোক থাকতে তার

নামেই বা টেলিগ্রাম আসলো কেন? কার কী এমন জরুরী দায় পড়লো, যে, তাকে মরতে টেলিগ্রাম করতে গেল! তা এই রকম যখন ব্যাপার চলছে তখন মোড়লমশাই-এর মাথায় বুদ্ধি এল। বললে—তোমরা এত ভাবছো কেন বলো দিকি মিছিমিছি? তার চেয়ে চলো মাস্টারমশাই-এর কাছেই যাই—

—কোন্ মাস্টারমশাই?

মোড়লমশাই বললে—কেন, পোস্টাফিসের মাস্টারমশাই! কলকাতাতেও যেতে হবে না, হালিশহরেও যেতে হবে না, এমন কি আলিপুরেও যেতে হবে না, সোজা মাইল পাঁচেক হেঁটে পোস্টাফিসের মাস্টারমশাই-এর কাছে গেলেই চলবে। তিনি তো ইংরিজী লেখা-পড়া জানা লোক, তা না হলে কী আর সায়েবরা তাঁকে পোস্ট-মাস্টারের চেয়ারে বসিয়েছে—

এতক্ষণে সবাই যেন নিশ্চিন্ত হলো। ভালো বুদ্ধি দিয়েছে মোড়লমশাই। তা তাই-ই ভালো। সবাই সকাল-সকাল খেয়ে-দেয়ে রওনা দিলে দেউলটির দিকে। টেলিগ্রামটা তাঁকে দিয়ে পড়িয়ে কোলাঘাটের বাজারে কিছু কেনাকাটা করে একেবারে গাঁয়ে ফেরা যাবে। রথও দেখা হবে, আবার কলাও বেচা যাবে। চলো-চলো হে, আর দেরি করা উচিত নয়—

সাম্তাবেড় গ্রাম থেকে দল বেঁধে সেদিন সবাই রওনা দিলে পোস্টমাস্টারের ডাকঘরের দিকে। মোড়ল ভালো বুদ্ধিই দিয়েছে। এই না হলে গাঁয়ের মোড়ল!

দেউলটির পোস্ট-অফিসের বাবুটি বহুদিনের পুরোন লোক। কিন্তু ছোট ডাকঘর। কাজ তেমন কিছু নেই। আশে-পাশের গ্রামের লোকজনও তেমন ডাকঘরের ধারে-কাছে ঘেঁষে না। ডাকঘরের আয়ও তেমন নয় যে, অনেক কর্মচারীর দরকার হবে! রূপনারায়ণের ধারে পোস্টাফিসটা। জানালা দিয়ে বেশ ফুরফুরে হাওয়া আসে। আর পাশেই মাস্টারমশাই-এর কোয়ার্টার। চা-জলখাবার খাওয়ার দরকার হলে বাড়ি থেকেই তা আসে। সকালবেলার দিকে যখন ডাকগাড়ি আসে তখন চিঠিগুলোতে ছাপ মেরে বিলি করেই খালাস। ততক্ষণে হরিপদ চান-টান করে খেয়ে-দেয়ে এসে হাজির হয়ে যায়। হরিপদ লোক ভালো। লম্বা-লম্বা পা ফেলে চলতে পারে। সাত মাইল আট মাইল পথ হাঁটতে তার বেশী কষ্ট হয় না।

তারপর হরিপদ চলে গেলেই পোস্ট-মাস্টারের ছুটি। হাওড়ার মেল

ট্রেনটা চলে যাবার সময় একটা গুন্-গুম্ শব্দ হয় চারিদিকে। তারপর মনটা ফাঁকা হয়ে যায়। তখন তিনি বই নিয়ে পড়তে বসেন। বই মানে নভেল। চাটুজ্জেমশাই-এর লেখা নভেল। কখনও 'বিন্দুর ছেলে,' কখনও 'দেনা-পাওনা,' আবার কখনও 'পল্লীসমাজ'। কখনও কখনও চাটুজ্জেমশাই নিজেও আসেন। মাস্টারমশাই দূর থেকে তাঁকে দেখেই সামনের দরজায় গিয়ে ডাকেন—ও চাটুজ্জেমশাই, চাটুজ্জেমশাই—

শরৎচন্দ্র চিনতেন পোস্ট-মাস্টারকে।

কাছে আসতে আসতে জিজ্ঞেস করতেন—কী খবর? ভালো?

পোস্ট-মাস্টার বলতেন—আপনার 'পল্লীসমাজ' বইটা পড়ে শেষ করেছি, আপনি কী লেখাই লেখেন, সত্যি—

শরৎচন্দ্র বলতেন—যাই, এখনি আবার ট্রেন এসে যাবে—

—কলকাতায় যাচ্ছেন বুঝি?

—হ্যাঁ—বলে শরৎচন্দ্র চলে যেতেন। আর দাঁড়াবার সময় থাকতো না।

শরৎচন্দ্র কালে-ভদ্রে যখনই স্টেশনে ট্রেন্ ধরতে আসতেন বা ট্রেন থেকে নেমে সাম্তাবেড়ে যেতেন পোস্ট-মাস্টার তাঁকে ডাকতেন, কখনও বা মাঝে মাঝে পোস্টাফিসের ভেতর তাঁকে তাঁর ভাঙা চেয়ারে বসাতেন।

বলতেন—আপনার চিঠি-পত্তোর ঠিক পাচ্ছেন তো চাটুজ্জেমশাই?

শরৎচন্দ্র বলতেন—তা পাচ্ছি—

—দেখবেন, যদি কখনও কিছু চিঠি-পত্তোরের গোলমাল হয় তো আমাকে বলবেন, আমি সব ঠিক করে দেব—

খানিক পরে জিজ্ঞাসা করতেন—এখন আর কী লিখছেন?

শরৎচন্দ্র এ-সব কথায় তেমন গা করতেন না। এড়িয়ে যেতেন। নানা আজে-বাজে কথা তুলে প্রসঙ্গটা চাপা দিয়ে দিতেন। তারপর একটা পাল্কি ডেকে উঠে যেতেন। ছোকরা মাস্টারমশাই জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে দেখতেন। পাল্কিটা চলেছে। পায়ে চলা মেঠো রাস্তার ওপর দিয়ে এঁকে-বেঁকে চলতে-চলতে এক সময়ে পাল্কিটা চাটুজ্জেমশাইকে নিয়ে গাছ-পালার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যেত। তখন পোস্ট-মাস্টার আবার তাঁর নিজের কাজে মন দিতে বসতেন। সেদিনও অমনি বসে আছেন। হঠাৎ কয়েক জন গ্রামের চাষাভূষো শ্রেণীর লোক তাঁর ঘরে ঢুকলো। বললেন—কী চাই?

মাস্টারমশাই-এর গম্ভীর চেহারা দেখে গ্রামের মানুষজন একটু সঙ্কোচ বোধ করছে তখন। মোড়ল মশাই সকলের মওকাটা নিয়েএগিয়ে গেল। বললে—হুঁজুর একটা বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি—

—কী বিপদ ?

—আজ্ঞে, একটা টেলিগেরাম এসেছে এর নামে। ইংরিজীতে লেখা, তাই কেউ পড়তে পারছিনে আমরা। আপনি যদি একটু পড়ে বলে ছ্যান, কী লেখা আছে এতে—

মাস্টারমশাই টেলিগ্রামখানা হাতে নিয়ে দেখলেন সাতদিন আগে এসেছে সেটা। দেখে অবাক হয়ে গেলেন। সেই পাঁচ মাইল দূরের সামতাবেড় গ্রাম থেকে এরা এসেছে টেলিগ্রামের মানে বুঝে নিতে!

বললেন—তা তোমাদের গাঁয়ে এমন কেউ নেই যে ইংরেজী জানে ? তাকে দিয়ে টেলিগ্রাম পড়িয়ে নিতে পারলে না। এই সামান্য কাজের জন্যে এত দূর হেঁটে এসেছ তোমরা ?

মোড়লমশাই বললে—এজ্ঞে, সে-রকম কেউ থাকলে কি আর এত দূর থেকে এত কষ্ট করে আপনার কাছে আসি ? আমাদের সামতাবেড় গরীব গাঁ, চাষাভূষোরা থাকে সেখানে, ইংরেজি-জানা লোক সেখানে কেন থাকবে ?

পোস্ট-মাস্টারমশাই অবাক হয়ে গেলেন।

বললেন—কেন, তোমাদের গাঁয়ে তো চাটুজ্জেমশাই থাকেন, তাঁর কাছে গেলেই পারতে—তিনি পড়েই সব বলে দিতে পারতেন—

—চাটুজ্জেমশাই ? কে চাটুজ্জেমশাই ?

এতক্ষণে মোড়লমশাই বুঝতে পারলে। বললে—ও, আপনি ঠাকুরমশাই-এর কথা বলছেন ? তাঁকে তো খুব চিনি। তিনি ইংরিজী জানবেন কী, লেখাপড়াই জানেন না।

—চাটুজ্জেমশাই লেখাপড়াই জানেন না ?

মোড়লমশাই বললে—না, তিনি আমাদের সঙ্গে তামুক-টামুক খান, গপ্পো-গাছা করেন, তবে লোক খুব ভালো, আমাদের অসুখ-বিসুখ হলে হোমো-প্যাথি ওষুধ-বিষুধ দেন, ওই পর্যন্ত। লেখাপড়ার ধার দিয়ে তিনি যান না—

পোস্ট-মাস্টার এর পর আর কী-ই বা বলবেন। টেলিগ্রামখানার মা[illegible] বলে দিতে তারা দল বেঁধে যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল। টেলিগ্রা[illegible]

এমন কিছু জরুরী খবর ছিল না। কার দূর সম্পর্কের এক জ্যাঠামশাই বিহারের কোন শহরে হঠাৎ মারা গেছে, তারই খবর।

লোকজন টেলিগ্রাম পড়িয়ে নিয়ে আবার চলে গেল। দু'দিন পরে পোস্ট-মাস্টারমশাই নিজের চেয়ারে বসে আছেন, দেখলেন দূরে স্টেশনের পথে চাটুজ্জেমশাই চলেছেন। সঙ্গে-সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। দূর থেকেই ডাকতে লাগলেন—চাটুজ্জেমশাই, ও চাটুজ্জেমশাই—

শরৎচন্দ্র থমকে দাঁড়ালেন। মাস্টারমশাই কাছে আসতেই বললেন—কী খবর? ভালো?

—একটা খবর আছে চাটুজ্জেমশাই। আপনার সাম্‌তাবেড় থেকে একদল লোক আমার কাছে এসেছিল সেদিন একটা টেলিগ্রাম পড়িয়ে নিতে—

—টেলিগ্রাম? কীসের টেলিগ্রাম?

মাস্টারমশাই সমস্ত ঘটনাটা আগাগোড়া বলে গেলেন। তারপর বললেন—দেখুন চাটুজ্জেমশাই, আমি ভেবে অবাক হয়ে গেলুম, আপনি যে এতবড় একজন নামজাদা লেখক, এতবড় লেখাপড়া জানা লোক, সারা ভারতবর্ষময় লোক আপনার নাম জানে, আপনাকে দেখবার জন্যে পাগল, তা আপনার সাম্‌তাবেড়ের লোকেরা কেউ তা জানেও না—

সমস্ত ঘটনাটা শুনে শরৎচন্দ্র হাসতে লাগলেন।

মাস্টারমশাই তাঁকে হাসতে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—আপনি চাটুজ্জেমশাই হাসছেন? ওরা বলে কিনা আপনি লেখাপড়া-টড়া কিছুই জানেন না, শুধু ওদের সঙ্গে তামাক-টামাক খান, গল্প-গাছা করেন আর ওদের অসুখ-বিসুখ হলে হোমিওপ্যাথি ওষুধ-বিষুধ দেন—আমার শুনে রাগ হয়ে গেল, আর আপনি কিনা হাসছেন?

শরৎচন্দ্র তখনও হাসছেন। বললেন—ওই ভালো মাস্টার, ওই ভালো। আমি যে বই-টই লিখি, এ-খবরটা ওদের না জানাই ভালো। ওরা তা জানলে আর আমি 'বিন্দুর ছেলে' 'পল্লীসমাজ' কিংবা 'দেনা-পাওনা'র মত বই লিখতে পারতুম না—বলে আর দাঁড়ালেন না। বললেন—চলি—

মাস্টারমশাই অবাক হয়ে দেখলেন শরৎচন্দ্র স্টেশনের দিকে এগিয়ে চলেছেন। মাথায় পাকা চুল, সাদা পাঞ্জাবী, সাধাসিধে সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি। দেখলে কে বলবে ওই মানুষটার মনে এত সহানুভূতি, কলমে এত তেজ, প্রাণে এত দরদ!

নীলকান্তমণি

লোকটার নাম যে নীলকান্তমণি, তা আগে জানতাম না। নেহাৎ গরীব লোক। ময়লা জামা-কাপড় পরে আমাদের পাড়ায় ভালুকের নাচ দেখাতে আসতো। শীত পড়তেই দেখতাম ডুগডুগি বাজিয়ে আসছে। তার ডুগডুগি শুনেই পাড়ার ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা দৌড়ে গিয়ে সামনে হাজির হতো। সেই একই চেহারা। সেই ময়লা সার্ট। ধুতি আর পায়ে এক জোড়া ক্যাম্বিসের ময়লা জুতো! এক হাতে ডুগডুগি বাজাতো। আর এক হাতে নাকে দড়ি দিয়ে বাঁধা ভালুকটা। ভালুকটার পিঠে বেশ আয়েস করে বসে থাকতো লালমুখো একটা বাঁদর। বাঁদরটার নাম ছিল রূপী।

বোধহয় বাঁদরটা খুব রূপসী ছিল বলেই তার ওই নাম দিয়েছিল।

ডুগডুগি বাজাতে-বাজাতে যখন ছেলেমেয়েদের বেশ ভিড় জমে যেত, তখন লোকটা একটা জায়গায় তার পিঠের ঝোলাটা নামাতো। রূপী বাঁদরটাকে ভালুকের পিঠের ওপর থেকে নামিয়ে নিত। তখন শুরু হতো খেলা। হাতে ডুগডুগি বাজানো চলতো, আর মুখে গান। সেই গানের তালে বাঁদরটা নানা কসরত দেখাতো, ডিগবাজী খেত, লাফাতো, বল নিয়ে লোফালুফি করতো আর তারপর চলতো ভালুকের নাচ। ভালুকটা তু'পায়ের ওপর ভর দিয়ে লম্বা হয়ে দাঁড়িয়ে নাচতো। আর রূপী বাঁদরটাও সঙ্গে-সঙ্গে নাচতো। এমনি অনেক রকম খেলা। একঘেঁয়ে খেলা। দেখে-দেখে আমার পুরনো হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে সহজে এ সব জিনিস পুরনো হয় না। একদল বড় হয়ে গেলে ছোটরা আবার নতুন করে ভিড় জমাতো!

খেলা যখন প্রায় শেষ হয়ে আসতো, তখন রূপী বাঁদরটার হাতে একটা ফাটা এনামেলের কাঁসি তুলে দিত লোকটা। বাঁদরটা সেটা দু'হাতে নিয়ে ঘুরে-ঘুরে সকলের সামনে গিয়ে দাঁড়াতো আর মুখ বুঁজে পয়সা চাইতো। সেই পয়সা চাইতে এলেই সবাই যে যার পথ দেখতো। আর ফিরেও তাকাতো না। তখন সবসুদ্ধ চার আনা কী আট আনা নিয়েই খুশী থাকতে হতো নীলকান্তমণিকে। রাস্তার সামনেই আমার বাড়ি। লোকটার মুখের চেহারা দেখে আমার দয়া হতো। আমি চার আনা কি ছ'আনা পয়সা পাঠিয়ে দিতাম। আমার কুকুরটাকে দেখে ভয় পেত সে। বাঘের মতো কুকুরটা ছিল আমার। বলতাম—ও কিছু বলবে না, তুমি এসো—

লোকটা বলতো—কুকুর পুষেছেন বাবু, একে খাওয়াতেও তো খুব খরচ ?

বললাম—তা খরচ আছে বইকি !

লোকটা বললে—তা কত খরচ হয় ?

বললাম—দিনে চার টাকা, পাঁচ টাকার মতন।

লোকটা অবাক হয়ে গেল। বললে—অত খরচ করে আপনার তো লাভ কিছু হয় না।

বললাম—লাভ আর কী, শুধু শখ মেটানো।

—আপনাদের বাবু শখ, আর আমার হলো প্রাণের দায়। আমি পিয়ারীকে খাওয়াতে পারি না পেট ভরে। পেট ভরে খাওয়াতে পারলে আমার পিয়ারী আরো ভাল খেলতে পারতো।

বললাম—খুব ভালো নাম দিয়েছ তো ভালুকটার—পিয়ারী।

—হুজুর, আমার মায়ের নাম ছিল পিয়ারী।

—তা মায়ের নামে ভালুকের নামে রাখলে ?

—ওই পিয়ারীও যে আমার মায়ের মত বাবুজী ! আমার মাও যেমন আমায় মানুষ করে বড় করেছে, ওই পিয়ারীও তেমনি। ওই পিয়ারী ছিল বলেই, আমি এখনো খেয়ে-পরে বেঁচে আছি—

আমার বাড়ির সামনে বাগানের ভেতর বসেই নীলকান্তমণি তার পোষা জানোয়ার দু'টোকে নিয়ে বিশ্রাম করতো খানিক। পাড়ার ছেলেদের অত্যাচার বন্ধ করবার জন্যে গেটটা বন্ধ করে দিতাম। নীলকান্তমণি সারাদিন ঘুরে-ঘুরে খেলা দেখিয়ে এসে ওই বাগানের ভেতর একটু ঘুমিয়ে নিত।

কিন্তু আমার কুকুরটার দিকে সে বড় ভয়ে-ভয়ে চেয়ে দেখতো।

বলতো—আপনার কুকুরটাকে আমার বড় ভয় করে বাবুজী!

আমার তাই বাড়ির লোকজনদের বলা ছিল যে, নীলকান্তমণি যখন আসবে, তখন যেন কুকুরটাকে শেকলে বেঁধে রাখা হয়। বাঁধা কুকুরকে বিশেষ ভয় করতো না নীলকান্তমণি। পোষা জানোয়ার ছুটোকে মালীর ঘরের কাছে রেখে নিজেও গাছতলায় খানিকটা ঘুমিয়ে নিত। নিজে দু'টো চিড়ে-মুড়ি চিবোত, আর কখনো-সখনো দু'টো জানোয়ারকেও খাওয়াতো।

এমনি করে বহুদিন ধরে নীলকান্তমণি আসতো এ-পাড়ায়। গ্রীষ্ম কিংবা বর্ষাকালে নীলকান্তমণির বিশেষ দেখা পাওয়া যেত না। পূজোর পর যখন একটু ঠাণ্ডা পড়তো, তখন আবার ডুগডুগি বেজে উঠতো নীলকান্তমণির। দেখতাম, আবার সেই পিয়ারী আর রূপীকে নিয়ে নীলকান্তমণি এসে হাজির হয়েছে। আবার রাস্তায় ভিড় জমেছে। ছেলে-মেয়ে বুড়ো-ছোকরা সবাই মিলে ঘিরে দাঁড়িয়েছে তাকে। আর তারপর পিয়ারী দু'হাত তুলে নাচতো, আর নীলকান্তমণি তার সেই পুরনো গানটা গাইতো লাঠির ডগায় বাঁধা ঘুঙুর বাজাতে-বাজাতে—

নাচ রে পিয়ারী নাচ, ছুলকি ছুলকি নাচ।
গড়িয়ে দেব নতুন গয়না, গড়িয়ে দেব বাজু,
সোনা-রুপোয় গড়িয়ে দেব, নতুন নতুন সাজ!

পিয়ারী সেই গানের সুরের তালে তালে সেই আগেকার মতই নাচতো আর তাই দেখে সবাই হেসে গড়িয়ে পড়তো।

আমি একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম—এ গান কার লেখা?

নীলকান্তমণি হেসে বলেছিল—এ গান আমি বাপের কাছে শিখেছি, আমার বাপও এই গান গেয়ে ভালুক নাচাতো। তখন হুজুর দিনকাল ভালো ছিল, এই পেশাতেই আমার বাপ জমি করেছে, ক্ষেতি বাড়ি করেছে। এখন আমার আমলে আমাদের খেতেই কুলোয় না—

আরো অনেক কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। কে-কে আছে নীলকান্তমণির, দেশ কোথায়, সংসারে কে-কে আছে তার, এই সমস্ত! আমার কৌতুহলের কারণ ছিল। আমি ভাবতাম এরা সারা বছর কোথায় থাকে, আবার এই শীত-কালেই বা আসে কেন। নীলকান্তমণির সঙ্গে আমার এই ঘনিষ্ঠতার সূত্রে আমি

সমস্ত জেনে নিয়েছিলাম! সারা বছর চাষবাস করে কাটায় ওরা। বিহার আর বাঙলা দেশের সীমান্ত গ্রামগুলোতেই ওদের বাস। অজ পাড়া-গাঁ। অন্য সময়ে চাষ আবাদ করে। জমি বেশী নেই। যে ফসল হয়, তাতে ভাল করে সারা বছর চলেও না। তাই পূজোর পরে যখন আর খাবার কিছু থাকে না, তখনই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। নীলকান্তমণি বলেছিল—এই শীতকালটাই পিয়ারীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি হুজুর—তখন এই পিয়ারীই আমাকে খাওয়ায়—

—কিন্তু পিয়ারীরও তো বয়েস হচ্ছে, ও মারা গেলে তখন কী করবে তুমি?

—তখন মাথার ওপর ভগবান আছে।

—ভগবান কি আর আছে নীলকান্তমণি, ভগবান নেই।

নীলকান্তমণি বলতো—তা যা বলেছেন হুজুর, ভগবান নেই। সেইজন্যেই এই বুড়ো বয়সে এত খেটে খেতে হচ্ছে।

—তোমার কত বয়স হলো?

নীলকান্তমণি বলতো—তা কী হিসেব আছে হুজুর। বয়েস বোধ হয় অনেকই হলো। এখন আর হাঁটতে পারি না আগেকার মত।

—এখান থেকে তোমার দেশ কতদূরে হবে? রেল-ইষ্টিশানের নাম কী?

—আমাদের গাঁয়ে কোনও রেল-ইষ্টিশান নেই হুজুর। পুরুলিয়া শহর থেকে পঞ্চাশ ক্রোশ ভেতরে আমাদের গাঁ। সেখানে চারদিকে শুধু পাহাড় আর রাঙা মাটি। এক ধান ছাড়া আর কিছু হয় না। নুন, কেরোসিন তেল, দেশলাই এ-সব জিনিস তো আর ক্ষেতে হবে না হুজুর, বাজার থেকে কিনতে হয়, তাই যে-কটা পয়সা খেলা দেখিয়ে পাই, সব ওই কিনতেই ফুরিয়ে যায়—

তারপর বলতো—এবার থেকে আর আমি আসতে পারবো না হুজুর, এর পর থেকে ভাবছি ছেলেকেই পাঠিয়ে দেব।

—তোমার ছেলের বয়স কত?

—এখন হুজুর মাত্র ছ' বছর।

—কটা ছেলে তোমার?

—ওই এক ছেলে আমার। আর যে ক'টা ছিল, সব মারা গেছে। তেমন জোয়ান ছেলে থাকলে আজকে আমার ভাবনা!

এমনি করেই আমার বাগানে বসে গল্প হতো। নীলকান্তমণি পিয়ারী আর রূপীকে পাশে বেঁধে রাখতো। আর আমার অ্যালসেশিয়ান কুকুরটা শেকল

দিয়ে বাঁধা অবস্থায় চুপ করে সব শুনতো। শেষকালের দিকে নীলকান্তমণির সঙ্গে আমার কুকুরটার খুব ভাব হয়ে গেল। তখন আর শেকল দিয়ে বেঁধে রাখতে হয় না। তখন দেখতাম পিয়ারী আর রূপীর সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়ে ফেলেছে আমার জ্যাক্।

অ্যালসেশিয়ান কুকুরগুলোর এই গুণ। একবার যদি বুঝতে পারে কে মনিবের বন্ধু আর কে মনিবের শত্রু, তাহ'লে চেনা হয়ে গেলে তাদের সঙ্গে সেই রকম ব্যবহার করে। তখন চেনা লোকদের আর কোনও ভয় থাকে না।

তখন নীলকান্তমণি বলতো—আপনার জ্যাক্ এখন আমাদের চিনতে পেরেছে হুজুর, এখন আর আমাদের কিছু বলে না।

আমি বলতাম—আগে নতুন ছিলে বলেই তোমাকে কামড়াতে যেত! এখন কয়েক বছর ধরে তো তোমাকে দেখছে!

নীলকান্তমণি বলতো—আমার পিয়ারীও তাই হুজুর, আগে যখন বাবা ওকে জঙ্গল থেকে ধরে এনেছিল, তখন আমার বাপকেই কতবার কামড়ে দিয়েছে। আমি যখন ছোট ছিলাম, আমাকেও কত কামড়েছে, এখন ও আমার ছেলের মত হয়ে গেছে। শীতকাল এলেই ও বুঝতে পারে এবার বেরোবার সময় হয়েছে, আমার পা ধরে টানতে থাকে—

সত্যিই দেখতাম নীলকান্তমণি তার জানোয়ার দু'টোকে নিজের ছেলের মতই ভালবাসতো। নিজে যে বাটিতে জল খেত, সেই বাটিটাতে জল নিয়ে পিয়ারীকে খাওয়াতো। নিজে ছাতু মাখতো আমার বাগানে বসে। খানিকটা খেয়ে বাকীটা ধরে দিত পিয়ারীর সামনে। নীলকান্তমণি নিজে যা খেত, পিয়ারী আর রূপীকেও সেই খাবারই খেতে দিত।

তারপর যখন ফেব্রুয়ারী মাস শেষ হয়ে আসতো, তখন শেষবারের মতো আসতো। বলতো—যাই হুজুর, এবার দেশে যাই—

বললাম—কী রকম কারবার হলো তোমার নীলকান্তমণি—

নীলকান্তমণি বললে—এবার বেশী হলো না হুজুর, টাকা চল্লিশের মত হয়েছে। এতেই বছরের নুন, কেরাসিন আর দেশলাইয়ের খরচটা চলবে!

বললাম—অন্য বারে তো এর চেয়ে বেশী হয়, এবার হলো না কেন?

নীলকান্তমণি বললে—পিয়ারী আমার বুড়ো হয়ে গেছে হুজুর, আর তেমন জোর নেই, নাচতে পারে না ধেই-ধেই করে, এখন ঘন-ঘন জ্বর হয়।

তারপর দুঃখ করে বলতো—আর আমিই কি আর তেমন জোয়ান আছি হুজুর। আমিও আর তেমন হাঁটতে পারি না। আমার গায়েও তেমন জোর নেই। এবার আমি ছেলেকে পাঠিয়ে দেব হুজুর। তাকে একটু দেখবেন।

বললাম—তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও তুমি, আমার সঙ্গে দেখা করতে বোলো।

—নিশ্চয় বলবো। বলে নীলকান্তমণি আমার কাছে বিদায় নিয়ে সে বছরের মত চলে গেল।

সত্যিই আমি ভাবিনি যে সেই নীলকান্তমণির সঙ্গে আবার দেখা হবে। কিন্তু এমন অভাবনীয়ভাবে যে দেখা হয়ে যাবে, তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। সেই কথা বলতেই এই নীলকান্তমণির গল্পটা ফেঁদেছি।

সংসারে কত লোক কত রকম ভাবে সাক্ষাৎ-পরিচয়ে কাছে আসে, ঘনিষ্ঠ হয়, তারপর একদিন আবার হারিয়েও যায় তারা। কে আর বা কাকে চিরকাল মনে রাখে? না, আজকালকার এই ব্যস্ততা আর প্রতিযোগিতার দিনে সকলকে মনে রাখা সহজ নয়। নিজের অস্তিত্ব টিঁকিয়ে রাখবার জন্যেই তো সবাই বিব্রত। এর পর আমাদের এত সময় কোথায় যে, কোথাকার কোন্ পুরুলিয়ার পঞ্চাশ ক্রোশ দূরের এক অজ পল্লীগ্রামের ভালুকওয়ালার কথা মনে রাখবে! সে সব মনে রাখার বা মনে রেখে বিলাসিতা করার যুগ চলে গেছে। তাই হঠাৎ যেদিন আবার রাস্তায় সেই পুরনো ডুগডুগি বাজনার শব্দ শুনলাম, তখন অবাক্ হয়ে গেলাম। সেই আগেকার মত চেনা বাজনা! আর সেই গান—

নাচ রে পিয়ারী নাচ, দুলকি দুলকি নাচ।
গড়িয়ে দেব নতুন গয়না, গড়িয়ে দেব বাজু।
সোনা-রুপোয় বানিয়ে দেব, নতুন নতুন সাজ!

এ তো সেই নীলকান্তমণির বাপের তৈরী গান। এ নিশ্চয়ই সেই নীলকান্তমণি! ভাবলাম, হয়ত শরীর খারাপ বলে কয়েক বছর আসতে পারেনি। পেটের দায়ে আবার এসেছে। রাস্তা দিয়ে আসতে-আসতে থেমে গেলাম।

চারিদিকে ছেলে-মেয়ে বুড়োর ভিড় জমেছে। এ পাড়ার যারা নতুন ছেলেমেয়ে, তারা সেই নীলকান্তমণিকে দেখেনি। তাদের কাছে জিনিসটা

নতুন। আগেও যেমন হয়েছে এবারেও তাই। আশেপাশের বাড়ির জানালা থেকে মেয়েরা উঁকি মেরে খেলা দেখছে।

আমিও আর কৌতূহলকে দমন করতে পারলাম না।

ভিড়ের ভেতরে উঁকি মেরে দেখলাম নীলকান্তমণি নয়। একজন কমবয়েসী ছেলে। ঠিক নীলকান্তমণির মতই ঘুঙুর-বাঁধা লাঠিটা নিয়ে তাল দিচ্ছে, আর গান গাইছে। আর পিয়ারী সেই তালে-তালে ওপরে দু'হাত তুলে নাচছে। রূপী বাঁদরটাও সঙ্গে আছে। নাচের পর পিয়ারী থামলো। তখন অন্য খেলা। তখন রূপী উঠলো পিয়ারীর পিঠে। পিঠে বসে ডুগড়ুগি বাজাতে লাগলো, আর পিয়ারী তাকে পিঠে নিয়ে চারদিকে গোল হয়ে ঘুরতে লাগলো। ঠিক যে ভাবে নীলকান্তমণি খেলা দেখাতো, সেই ভাবেই খেলা দেখাচ্ছিল ছেলেটা। বুঝলাম, নীলকান্তমণিরই ছেলে এ। বাপের কাছেই সব শিখে নিয়েছে।

খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সেখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলাম। খেলার পর পয়সা চাইবে ভেবে তখন সবাই ভয়ে সরে পড়েছে। শেষ পর্যন্ত দু'চার পয়সা কেউ-কেউ দিলে। রূপী বাঁদরটা ভাঙা এনামেলের থালাটা আমার সামনে নিয়ে এল। আমি তার ওপরে এক টাকার আস্ত একটা নোট দিতেই ছেলেটা অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চাইলে। একটা টাকা পাওয়ার স্বপ্নও বোধহয় সে কখনও দেখেনি। বললাম—তুমি নীলকান্তমণির ছেলে?

ছেলেটা বললে—হ্যাঁ, হুজুর।

জিজ্ঞেস করলাম—তোমার বাবা কেমন আছে?

ছেলেটা বললে—আমার বাপ মারা গেছে হুজুর!

কথাটা বলতে গিয়ে যেন ছেলেটার জিভ জড়িয়ে এল।

বললাম—কী হয়েছিল তার শেষকালে?

—বোখার।

বললাম—তোমার বাপ আমার কথা তোমাকে বলেনি? আমি বলেছিলাম তোমার বাবাকে যে, তোমাকে যেন আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়। তোমার বাবা খেলা-টেলা দেখিয়ে আমার বাগানে এসেই বসতো। ওই পিয়ারী আর রূপীও আমার বাগানেই রাত্তিরে থাকতো।

ছেলেটা বললে—হ্যাঁ,, আমি বাবার কাছে সব শুনেছি হুজুর।

—তুমি আমার কাছে আসবে, বুঝলে? তুমি নতুন কলকাতা শহরে

এসেছ, এখানে কাউকে এখনও চেনো না, তাই যেখানে-সেখানে থেকো না, টাকাকড়ি কেউ কেড়ে নিতে পারে। এখানে অনেক গুণ্ডা-বদমায়েস থাকে।

ছেলেটা মন দিয়ে আমার সব কথা শুনলে। তারপর বললে—আপনার বহুত্ মর্জি হুজুর।

বললাম—তুমি আমার বাড়িটা কি চেনো ?

—না হুজুর।

—তা'হলে এসো আমার সঙ্গে, আমি তোমাকে আমার বাড়িটা চিনিয়ে দিই—

তখন লোকজন সবাই চলে গিয়েছিল। ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে আমি বাড়ির দিকে চললাম। পেছনে-পেছনে পিয়ারীও আসতে লাগলো, তার পিঠে চড়ে আসতে লাগলো রূপী। ভেবেছিলাম, ছেলেটা যখন শহরে নতুন, তখন তার একটা নিশ্চিন্ত-আশ্রয়স্থল থাকলে ভাল।

হাঁটতে-হাঁটতে যখন প্রায় বাড়ির সামনে এসেছি, তখন হঠাৎ একটা কাণ্ড হলো। আমি ভাবতেই পারিনি যে এমন হবে। আমার জ্যাক্ ভেতর থেকে হঠাৎ আমাদের দেখেই চিৎকার করে উঠেছে হাউ-হাউ করে! অ্যালসেশিয়ান কুকুর যখন ডাকে, তখন তা বাঘের গলার আওয়াজের মত শোনায়। বুঝলাম, নতুন মুখ দেখে ওই রকম চেঁচাচ্ছে। নীলকান্তমণিকেও যখন সে প্রথম দেখেছিল তখন ওই রকম চেঁচাতো। আমি জ্যাক্‌কে সামলে ধরলাম। বললাম —আরে এ সেই নীলকান্তমণির ছেলে, চেঁচাস নে, আমাদের চেনা লোক—

কিন্তু কে কার কথা শোনে! ভাগ্যিস চেন দিয়ে বাঁধা ছিল জ্যাক্, তাই কিছু হলো না। তাই তাকে সামলানো গেল। কিন্তু তারা সদলবলে যেই গেট পেরিয়ে বাগানের মধ্যে ঢুকেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে জ্যাক মোটা লোহার চেন ছিঁড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ভালুকটার ওপর। আর দেখতে না দেখতে এক কামড় বসিয়ে দিয়েছে তার মাথায়। আমি হাঁ-হাঁ-হাঁ করে জ্যাক্‌কে ধরতে গিয়েছি। কিন্তু তার আগেই যা সর্বনাশ হবার তা হয়ে গেছে। ভালুকটার মুণ্ডুটা কামড়ে ধরে একেবারে তার ছাল-চামড়া পর্যন্ত ছাড়িয়ে দিয়েছে।

কিন্তু তখনই বুঝি আমার সত্যিকারের অবাক হওয়ার পালা। ভালুকটার মুণ্ডুর চামড়া ছাড়াতেই তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল নীলকান্তমণি!

বললাম—নীলকান্তমণি তুমি ?

নীলকান্তমণিকে ভালুকের চামড়ার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে আমার জ্যাক্‌ও তখন বোধহয় ঠাণ্ডা হয়েছে। আমি জ্যাক্‌কে তখন দু'হাতে জাপটে ধরেছি। নীলকান্তমণি আমাকে দেখে হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেলেছে। আমি তাকে ঠাণ্ডা করিয়ে বললাম—কী হলো নীলকান্তমণি, তুমি নিজেই ভালুক সেজে নেচে বেড়াচ্ছো ?

নীলকান্তমণি দু'হাতে আমার পা দু'টো জড়িয়ে ধরল। বললে—হুজুর, আমাকে মাপ করবেন, আমার পিয়ারী মরে গেছে। আর নতুন ভালুক কেনবার পয়সাও নেই আমার, আজকাল সব জিনিসেরই দাম বেড়ে গেছে হু-হু করে। তাই নিজেই ভালুক সেজে ছেলেকে নিয়ে বেরিয়েছি রোজগার করতে। আমি হুজুর, লোক ঠকাতে চাইনি, কিন্তু পেটের দায়ে আমাকে তাও করতে হচ্ছে। আমার কসুর মাপ করুন হুজুর—

আমি তার কথা শুনে হাসবো না কাঁদবো বুঝতে পারলাম না। আমি, আমার জ্যাক, নীলকান্তমণির ছেলে, রূপী-বাঁদরটা, সবাই সেই অবস্থার মধ্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার মুখের কথা যেন ফুরিয়ে গিয়েছে।

পাশে সেই ছেঁড়া ভালুকের চমড়ার খোলটা তখনও নির্জীব অবস্থায় মাটিতে পড়ে ছিল। নীলকান্তমণি সেটাকে কুড়িয়ে নিতে যাচ্ছিল।

আমি বাড়ির ভেতর থেকে একশোটা টাকা এনে নীলকান্তমণিকে দিলাম। বললাম—ওটা আমার কুকুরের জন্যেই ছিঁড়ে গেছে নীলকান্তমণি, এই টাকাটা নাও, তুমি আরো কিছু টাকা জোগাড় করে একটা নতুন ভালুক কিনে নিও। বুড়ো বয়েসে এ রকম পরিশ্রম করলে তুমিও আর বাঁচবে না—যাও—

নীলকান্তমণি চলে গেল। ছেলেটাও নীলকান্তমণির সঙ্গে চলে গেল। আর রূপী বাঁদরটাও তাদের পেছন-পেছন চলতে লাগলো। পেছনে পড়ে রইল শুধু সেই ছেঁড়াখোঁড়া ভালুকের চামড়াটা। সেটা ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে দিয়েছিল জ্যাক। তারপর নীলকান্তমণির সঙ্গে আর কখনও দেখা হয়নি। সেই শেষ। তার ছেলেও কখনও আসেনি খেলা দেখাতে। কোথায় আছে সে, বেঁচে আছে কি মারা গেছে, তাও জানি না।

———

যমরাজার নোটিশ

বউবাজার থেকে ভবানীপুর। ভবানীপুর থেকে বালিগঞ্জ। বালিগঞ্জ থেকে বেহালা। এই বেহালার ভূমিপতিবাবুর বাড়িতে এসেই কেষ্টা একেবারে আঠার মতন আটকে গেল। আগেকার দু'জায়গায় কেষ্টা মাইনে পেত বেশি। মাইনে ছিল ছ' টাকা করে মাসে। কিন্তু খাওয়ার তেমন যুৎ ছিল না। মোটা চালের ভাত আর ডাল। সঙ্গে একটু পুঁইশাকের চচ্চড়ি। কেষ্টাটা বরাবরই পেটুক মানুষ। ভূতের মতন খাটবে, কিন্তু মনের মত খাবার না হলেই মেজাজ বিগড়ে যাবে তার। ভূমিপতিবাবু বলেছিলেন—বেশ তো, আমরা যা খাবো, তুইও তাই খাবি—

কেষ্টা জিজ্ঞেস করেছিল—আর মাইনে?

ভূমিপতিবাবু বলেছিলেন—পাঁচ টাকা করে দেব মাসে আর বছরে দু'টো ধুতি আর দু'খানা গামছা—

তা তাতেই রাজী। সেই দশ বছর আগে কেষ্টা এ বাড়িতে ঢুকেছিল, তারপর কেষ্টা বেশ মন দিয়েই কাজ করছিল। ভোরবেলা উঠে কর্তার তামাক সাজতে হতো, তারপর ঘর ঝাঁট দেওয়ার পালা। ঘর ঝাঁট দিয়ে বাজারে যেত। বাজার থেকে ফিরে মাছ কুটে দিয়ে নাতিদের নিয়ে বেড়াতে যেত। সামনেই ছিল পুকুর একটা। পুকুরের ওপাশে একটা মস্ত বড় মাঠ। সেই মাঠে কর্তার নাতিরা খেলতো, আর কেষ্টা বসে-বসে পাহারা দিতো। এরপর দুপুরবেলাও কেষ্টার ছুটি নেই। কর্তার ফাই-ফরমাশ খাটতে-খাটতে কেষ্টার প্রাণ বেরিয়ে যেত। দুপুরবেলা খেয়েদের উঠে ঘন-ঘন তামাক খাওয়ার পালা ছিল কর্তার। কর্তা বলতেন—বেশ ভালো করে ঠিক্‌রে দিয়ে চুরিয়ে-চুরিয়ে তামাক সাজবি রে—ধোঁয়া না বেরোলে তোর ঘাড়ে মাথা রাখবো না ব্যাটা—

তা পেটে খেলে পিঠে সয়! কেষ্টা কর্তার সব ধমক সইত মুখ বুঁজে। বড় বউ বলতো—কেষ্টা বাজারে যা—

কর্তা বলতেন—কেষ্টা তামাক সাজ—

দাদাবাবু বলতো—কেষ্টা জুতোটা সাফ্ করে দে—

আর নাতিরা বলতো—কেষ্টা বেড়াতে নিয়ে চল—

সবে-ধন কেষ্টা। সারা বাড়িতে সকলেরই ওই কেষ্টাই ভরসা। কেষ্টা না থাকলে ভূমিপতিবাবুর বাড়ি একেবারে চিত্তির। পাড়ার দত্তবাবু বলতো—চাটুজ্যেমশাই, আপনি চাকরটি পেয়েছেন বেশ—

ভূমিপতিবাবু বলতেন—চিরটা কাল তো নিজের হাতেই করেছি মশাই সব, এখন ওই কেষ্টা আছে বলেই যা একটু আরাম করতে পারছি—

—আহা বেশ চাকরটি আপনার চাটুজ্যেমশাই। আমাদের একটা দিন না অমন যোগাড় করে।

তা যোগাড় আর করে দিতে হলো না। তার আগে কেষ্টাই একদিন মারা গেল। হঠাৎ বলা নেই, কওয়া নেই, সামান্য একটু জ্বর হলো আর কেষ্টা চলে গেল। ভূমিপতিবাবু নিজেও শ্মশানে গেলেন। বড় দাদাবাবু, ছোট দাদাবাবু সবাই একটু অসুবিধেয় পড়লো। বড় বউ, ছোট বউ, তারাও অসু-বিধেয় পড়লো। তখন থেকে কেষ্টার কাজকর্ম নিজেদেরই করতে হলো। ভূমিপবিবু নিজেই আবার বুড়ো বয়েসে বাজারে যেতে লাগলেন, নিজেই ঠিক্রে দিয়ে চুরিয়ে চুরিয়ে তামাক সাজতে লাগলেন। নিজেই আবার দুই নাতিকে বেড়াতে নিয়ে যেতে লাগলেন।

পাড়ার দত্তবাবু দেখা হলেই সহানুভূতি দেখাতো। বলতো—আহা, আপনার তো বুড়ো বয়েসে খুবই কষ্ট চাটুজ্যেমশাই—

ভূমিপতিবাবু বলতেন—আর কী, এবার তো নোটিশ এলেই হয়, নোটিশের জন্যেই তো হাঁ করে আছি পথ চেয়ে—

দত্তবাবু বলতো—কী যে বলেন, কত আর বয়েস হলো আপনার?

ভূমিপতিবাবু বলতেন—এই সত্তরের কোটা চলছে—

দত্তবাবু বলতো—তা এর মধ্যেই নোটিশের আশা করছেন? আগে নাতিরা মানুষ হোক, নাতিদের বিয়ে-টিয়ে দিয়ে তবে যাবেন তো?

ভূমিপতিবাবু বলতেন—সে আর কপালে নেই আমার, দাঁত পড়ে গেছে

চুল পেকে গেছে, এবার শুধু নোটিশের জন্যে বসে আছি—

দত্তবাবু জিজ্ঞেস করতো—এ দিকের কাজ সব গুছিয়ে ফেলেছেন নাকি ?

ভূমিপতিবাবু বলতেন—কই আর গুছোনো হলো ? সারা জীবন তো উদয়াস্ত খেটেই সারা হয়েছি কেবল, ভাবছি নোটিশ আসবার আগেই সব গুছিয়ে ফেলবো। এখনও বাড়িটা শেষ করা হয়নি, এখনও ছোট মেয়ের বিয়ে দেওয়া বাকী—সব কাজই তো বাকী পড়ে রইল—কখন যে কী করবো, কিছুই বুঝতে পারছি না—

দত্তবাবু চলে গেল। বড় নাতি সঙ্গে ছিল। জিজ্ঞেস করলে—নোটিশ মানে কী দাদু ?

ভূমিপতিবাবু তখনও নিজের কাজ গুছোনোর কথাই ভাবছিলেন। বললেন—নোটিশ মানে ডাক—যমরাজার ডাক আসবে যে দাদু—

—যমরাজার ডাক এলে তুমি মরে যাবে বুঝি দাদু ?

ভূমিপতিবাবু নাতির মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে বললেন—হ্যাঁ দাদু, একদিন তো ডাক আসবেই আমার, তখন তোমাদের সকলকে ছেড়ে আমাকে চলে যেতে হবে।

—কেন দাদু ? তুমি মরে যাবে কেন ?

ভূমিপতিবাবু বললেন—সেইটেই যে নিয়ম দাদু—সকলের কাছেই একদিন যমরাজার নোটিশ আসবে, যমরাজার নোটিশের হাত থেকে কেউ-ই নিস্তার পাবে না—সংসারের যে সেইটেই নিয়ম দাদু !

* * *

কেষ্টা কিন্তু আসলে মরেনি। হঠাৎ যখন জ্ঞান হলো, দেখলে কর্তাবাবু, বড়-দাদাবাবু, মেজ-দাদাবাবু, বড় বউ, ছেলেমেয়েরা সবাই তার বিছানার চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে। কর্তাবাবুর চোখে জল পড়ছে। কেষ্টা উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলে, কথা বলবারও চেষ্টা করলে।

কর্তাবাবু বললেন—আহা, বেটা বেশ মন দিয়ে কাজ করতো গো—

বড়বউ বললে—ছেলেটা খেত বেশী, কিন্তু কাজ করতো গতর দিয়ে—

বড় নাতি জিজ্ঞেস করলে—কেষ্টার কী হলো দাদু ?

কর্তাবাবু বললেন—কেষ্টা মারা গেছে—

—কেষ্টা আর কথা বলতে পারবে না ?

কর্তাবাবু বললেন—না—

কেষ্টার ইচ্ছে হলো তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দেয়। উঠে দাঁড়িয়ে তামাক সাজে। আবার দাঁড়িয়ে উঠে বলে—না কর্তাবাবু, আমি মরিনি, আমি সব শুনতে পাচ্ছি, সব দেখতে পাচ্ছি—

কিন্তু হঠাৎ মনে হলো দরজা দিয়ে কারা যেন ঢুকছে। বিরাট যমদূতের মতন সব চেহারা। তাদের মধ্যে একজন একেবারে কাছে চলে এল। একেবারে কাছে। এসে বললে—চলো—

আশ্চর্য! সবাই দাঁড়িয়ে আছে, কেউ তাদের দেখতে পেলে না। কেউ তাদের কথা শুনতেও পেলে না। লোকটা আবার বললে—চলো, তোমার নোটিশ এসেছে—

—নোটিশ?

—হ্যাঁ নোটিশ! যমরাজার নোটিশ! তোমাকে আমরা নিতে এসেছি—

তারপর আর বলা নেই কওয়া নেই, একেবারে তাকে কাঁধের ওপর ধরে তুললো, আর উড়তে-উড়তে চললো। প্রথমে বাড়ির ছাদের ওপর দিয়ে, তারপর পুকুরের ওপর দিয়ে, তারপর গাছপালা, গ্রাম ছাড়িয়ে একেবারে আকাশে। সেখানে শুধু আকাশ আর আকাশ কেবল। কোনও দিকে কিছু দেখা যায় না। শেষকালে আকাশ পেরিয়ে কোথায় যেন এসে নামলো। তাকেও নামালে। বললে—দাঁড়াও এখানে—

কেষ্টা জিজ্ঞেস করলে—এ কোথায় নিয়ে এলে আমাকে?

তারা বললে—চিত্রগুপ্তের দপ্তরে—

কেষ্টা তবু বুঝতে পারলে না। বললে—চিত্রগুপ্ত কে?

তারা বললে—যমরাজার দপ্তরের বড়বাবু—

তাদের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে কেষ্টা চললো দপ্তরের দিকে। বিরাট দপ্তর। অনেক তক্তপোশ পাতা চারিদিকে। তার ওপর মাদুর পাতা। সেই মাদুরের ওপর সামনে হিসেবের খেরো খাতা খুলে সবাই মন দিয়ে কাজ করে চলেছে। নানা লোকের নাম-ঠিকানা-বয়েস-গাঁ, সব লেখাজোখা চলছে। পৃথিবীতে থেকে বোঝা যায় না। ওই যমরাজার দপ্তরে এসে যেন কিছু তার হদিশ পাওয়া যায়। একজনের সামনে এসে দাঁড়াতেই সে বললে—নাম কী তোমার?

কেষ্টা বললে—কেষ্টা—

—কেষ্টা কী ? কেষ্টা দাস, না কেষ্টা হালদার ? পুরো নাম কী ?

কেষ্টা বললে—তা জানিনে হুজুর, বাপ-মাকে তো দেখিনি—যেখানে কাজ করেছি, সেখানে সবাই আমাকে 'কেষ্টা' বলেই ডেকেছে—

লোকটা একটু মুশকিলে পড়লো। বললে—মহা মুশকিলে ফেললি তো। তোর জন্যে আবার আমাকে পুরোন খাতা-পত্তর ঘাঁটতে হবে! জ্বালাতন! এত লোক বাড়ছে পৃথিবীতে, দপ্তরে আরও লোক না হলে চলছে না হে—

আর একজন পাশের লোক বললে—এত লোক জন্মাচ্ছে কেন বলোতো পৃথিবীতে ? একটু বলে দিতে পারো না আমাদের ব্রহ্মার ডিপার্টমেণ্টে ? একটু কম করে জন্ম দিলেই হয়—

লোকটা বললে—আরে ভায়া, এখন যে সব ডিপার্টমেণ্টে-ডিপার্টমেণ্টে রেষারেষি চলছে, এখন সে-কথা কেউ শুনবে কেন ?

টিফিন-টাইম হবার সময় হতেই লোকটা বললে—কী করতিস্ তুই পৃথিবীতে ?

—হুজুর চাকরের কাজ !

লোকটা কী যেন ভাবল। তারপর পাশের লোকটার দিকে দেখিয়ে দিলে। বললে—যাও, ওঁর কাছে যাও—

পাশের লোকটা তার নাম-ধাম-ঠিকানা সব লিখে নিয়ে আবার তার পাশের লোকের কাছে পাঠিয়ে দিলে। তারপর এমনি করে কত দপ্তর পেরিয়ে শেষে ছুটি। কাজ কিছু নেই। কাজ পড়লো একমাস পর থেকে। উদয়াস্ত কাজ। কাজের ঠেলায় আর চোখে-মুখে দেখতে পেলে না কেষ্টা। কথায় বলে ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে।

যমরাজের দপ্তরে এসেও তাই। চিত্রগুপ্ত ভারী খুশী কেষ্টার ওপর। বলে —কেষ্টা তামাক সাজ—বেশ চুরিয়ে-চুরিয়ে ঠিক্‌রে দিয়ে তামাক সাজবি ব্যাটা, যেন মুখ দিয়ে টানলেই ধোঁয়া বেরোয়—

কেউ বলে—কেষ্টা পৃথিবীতে যা, কেউ বলে—কেষ্টা বাজারে যা—

এমনি করে কেষ্টার দিন কাটছে।

* * *

কর্তাবাবুর কিন্তু বড় কষ্ট। কেষ্টা মারা যাবার পর থেকেই একটা চাকর খুঁজছিলেন। কিন্তু চাকর তখন আর পাওয়া তেমন সহজ নয়। ছেলেরা সকালবেলা

অফিসে যায়। তাদের খাবার যোগাড় করতে কর্তাকেই ছুটতে হয় বাজারে। বাজার থেকে এসে নিজেই নিজের হাতে তামাক সাজতে বসেন। নিজেই নাতিদের নিয়ে বেড়াতে বেরোন। নাতিরা পুকুরের পাশের বড় মাঠটার ওপর খেলা করে, আর তিনি পাহারা দেন। রাস্তায় দেখা হলে দত্তবাবু বলে—চাটুজ্যেমশাই, বাজার হয়ে গেল নাকি ?

কর্তাবাবুর তখন কথা বলার সময় নেই। এক হাতে বাজারের থলি, আর এক হাতে লাঠি। বলেন—একটা চাকর যোগাড় করে দিতে পারেন দত্তবাবু, আর তো পারিনে—

মাঠে খেলতে-খেলতে বড় নাতি বলে—দাদু, আমি একটা বল কিনবো, আমায় একটা বল কিনে দাও—

কর্তাবাবু বড় নাতির আবদার এড়াতে পারেন না। বল কিনতে দৌড়োন। শুধু বড় নাতিই নয়। বাড়িতে একমাত্র বেকার লোক কর্তাবাবু। সকলেরই কাজ আছে, সকলেই কাজে ব্যস্ত, কেবল কর্তাবাবুরই কোন কাজ নেই। তাই সব কাজেই কর্তাবাবুর ডাক পড়ে।

সেদিনও তিনি মাঠে বসে রোদ পোয়াচ্ছেন, আর সামনে নাতিরা খেলা করছে। মাঠের সামনেই ঘাট-বাঁধানো পুকুর। পুকুরে ভদ্রলোকরা স্নান করতে নামছে। হঠাৎ বড় নাতি চেঁচিয়ে উঠেছে। বললে—দাদু, ওই দেখ—

কর্তাবাবু দেখতে পাননি। বললেন—কী রে ? কী দেখবো ?

বড় নাতি আবার বললে—ওই দেখ, আমাদের কেষ্টা—

কর্তাবাবু অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—কই রে ?

ভাল করে চশমাটা নাকের ডগায় টেনে দেখে তবে চিনতে পারলেন। দেখলেন, কেষ্টা পুকুর পাড়ের বটগাছটার গোড়ায় চুপ করে ঘাপটি মেরে বসে আছে। বসে ঘাটের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে।

ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারলেন না কর্তাবাবু। ঠিক কেষ্টা তো, না আর অন্য কেউ! কিন্তু না, তাঁদের কেষ্টাই বটে! ঠিক সেই চুল, সেই টেরি, সেই খালি গা, সেই মাল-কোঁচা-মারা ধুতি পরনে। জোরে একটা হাঁক দিলেন—এই ব্যাটা, কেষ্টা—

কেষ্টা শুনতে পেলে না। কর্তাবাবু আবার ডাকলেন—এই কেষ্টা—

এবার কেষ্টা শুনতে পেলে। সেখানে দাঁড়িয়েই কর্তাবাবুকে দেখতে পেয়ে

বললে—যাই বাবু—

তারপর দৌড়তে-দৌড়তে এসে একেবারে কর্তাবাবুর পায়ের সামনে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলে।

কর্তাবাবু বললেন—কী রে বেটা? তুই কোত্থেকে! তুই মরিস নি?

কেষ্টা বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর, আমি মরে গেছি—

কর্তাবাবু রেগে গেলেন। বললেন—ঠাট্টা হচ্ছে আবার আমার সঙ্গে? আমার সঙ্গে আবার ইয়ারকি হচ্ছে?

কেষ্টা বললে—বিশ্বাস করুন হুজুর, আমি মরে গেছি—

—তা মরে যে গেছিস তুই, সে তো আমি জানি! আমি তো নিজে শ্মশানে তোকে পোড়াতে গিয়েছিলুম! কিন্তু তুই আবার বেঁচে উঠলি কী করে?

কেষ্টা বললে—আমি তো বেঁচে উঠিনি হুজুর—কে বললে বেঁচে উঠেছি?

—আবার ঠাট্টা হচ্ছে আমার সঙ্গে? আবার ইয়ারকি? বেঁচে উঠিসনি তো এখন কথা বলছিস কী করে? এখন আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছিস কী করে? এই যে আমি তোকে দেখতে পাচ্ছি কী করে?

কেষ্টা হাত জোড় করে বললে—আজ্ঞে না হুজুর, আপনি ভুল করছেন, আমি মরে গিয়েছি—

—ঠিক বলছিস?

—হ্যাঁ কর্তাবাবু, ঠিক বলছি না তো কী বেঠিক বলছি? আমি কবে মরে গিয়ে সগ্যে চলে গিয়েছি—

—স্বর্গে চলে গিয়েছিস? বলছিস কী তুই ব্যাটা!

—আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর, আমি এখন সগ্যে থাকি!

কর্তাবাবু কেষ্টার মাথা থেকে পা পর্যন্ত আর একবার দেখে নিলেন। বললেন—তা স্বর্গেই যদি থাকিস তো এখানে এলি কী করতে? স্বর্গে তুই করিস কী?

কেষ্টা বললে—আজ্ঞে, সগ্যে আমি এখন চাকরি করি, যমরাজার প্রধান চাকর আমি আজ্ঞে—

—কী করিস সেখানে তুই? কী কাজ করতে হয় তোকে সেখানে?

কেষ্টা হাসলো। বললে—আজ্ঞে ঢেঁকি আবার কী করবে? সগ্যে গিয়েও তো সেই ধানই ভানবে? আমি সগ্যে গিয়েও ধান ভানি।

—তার মানে?

কেষ্টা বললে—আমি কর্তাবাবু যমরাজার ফাই-ফরমাস খাটি—

—তা যমরাজার ফাই-ফরমাশ খাটিস তো এখানে কী করতে এসেছিস ?

কেষ্টা বললে—আজ্ঞে, যমরাজার ফাই-ফরমাশ খাটতেই তো এসেছি—

—কী ফাই-ফরমাশ ?

কেষ্টা বললে—আজ্ঞে পৃথিবী থেকে মানুষ নিয়ে যেতে !

—পৃথিবী থেকে মানুষ নিয়ে যেতে মানে ?

কেষ্টা বললে—আজ্ঞে ঐ যে দেখছেন, একজন লোক পুকুরে চান করতে নামছে, ঐ যে দেখছেন গামছা গায়ে দিয়ে দাঁতন ঘষছে, ওই লোকটাকে নিয়ে যেতে এসেছি—

কর্তাবাবু খাপ্‌পা হয়ে উঠলেন। বললেন—নিয়ে যেতে এসেছিস্ মানে ?

—আজ্ঞে যমরাজার নোটিশ হয়েছে যে ওর ওপর !

কর্তাবাবু আরও তাজ্জব হয়ে গেলেন। বললেন—ওর ওপর যমরাজার নোটিশ হয়েছে মানে ? তুই বলছিস কী রে ? ও যে দিব্যি জোয়ান মানুষ ! চান করে খেয়ে দেয়ে উঠে এখনি অফিসে যাবে—ও যে দত্তবাবুর ছেলে রে—একমাত্র ছেলে !

কেষ্টা বললে—আজ্ঞে নোটিশ হলে আমি কী করব হুঁজুর ! আমি তো হুকুমের চাকর বই তো নয় !

তা সত্যিই কর্তাবাবু দেখলেন দত্তবাবুর জোয়ান ছেলেটি স্নান করতে নামতে গিয়ে হঠাৎ পা পিছলে পড়ে গেল। পঁইঠেতে লেগে মাথা থেকে গলগল করে রক্ত পড়তে লাগলো। মাঠসুদ্ধু লোক একেবারে আঁতকে চিৎকার করে উঠেছে ভয়ে। একটা হৈ-হৈ আওয়াজ উঠলো চারদিকে। কিন্তু ততক্ষণে ছেলেটি অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে শিবনেত্র হয়ে পড়েছে। দত্তবাবু খবর পেয়ে দৌড়ে এল। দত্ত বাবুর স্ত্রী এল। কান্নাকাটি চললো। ভিড় জমে গেল চারিদিকে। ডাক্তার এল সঙ্গে-সঙ্গে ! কিন্তু তখন রোগী ডাক্তারের সাধ্যের বাইরে চলে গেছে।

এতক্ষণ কর্তাবাবু অবাক হয়ে দেখছিলেন সমস্ত কাণ্ডটা ! কেষ্টা বললে—দেখলেন তো কর্তাবাবু, আমি যা বলেছিলুম, তা ফললো কিনা !

কর্তাবাবুর হঠাৎ যেন এতক্ষণে জ্ঞান ফিরে এল। তিনি ফিরে চাইলেন কেষ্টার দিকে। কেষ্টা তখন আবার মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে কর্তাবাবুকে প্রণাম করলে। বললে—আমি তা'হলে আসি হুজুর—

—কোথায় যাবি তুই ?

—আজ্ঞে, ওকে যে নিয়ে যেতে হবে। দেরি হলে যে আবার বকুনি খেতে হবে আমাকে! আসি হুজুর—

বলে কেষ্টা কিছুটা দূরে চলে গিয়েছিল। কর্তাবাবু বলবেন—তা বাবা, তুই চলে যাচ্ছিস, কিন্তু তোকে আমার একটা কাজ যে করতে হবে বাবা—

—তা কী কাজ বলুন না ?

কর্তাবাবু বললেন—তুই তো বাবা অনেকদিন আমার কাছে কাজ কর ছিস, এবার তোকে আমার জন্যে একটা কাজ করতে হবে।

—কী কাজ, বলুন কর্তাবাবু ?

কর্তাবাবু বললেন—সামান্য কাজ, এমন কিছু শক্ত কাজ নয়। তুই তো বাবা চারদিকে যমরাজার নোটিশ দিয়ে বেড়াস! তা আমারও তো একদিন যম রাজার নোটিশ আসবে—আমারও তো একদিন ডাক আসবে! তা তুই আগে থেকে আমাকে সে খবরটা জানিয়ে দিতে পারবি না, কবে নোটিশ আসছে ?

কেষ্টা বললে—তা চেষ্টা করবো আপনাকে খবরটা আগে দিতে।

—চেষ্টা নয়, তোকে খবরটা দিতেই হবে বাবা! এককালে তো তুই আমার খেয়েছিস-পরেছিস, এই কাজটি তোকে করতেই হবে আমার জন্যে—

বলতে-বলতে কর্তাবাবু কেষ্টার হাত দু'টো জড়িয়ে ধরলেন।

বললেন—কেন বলছি বুঝতে পারছিস তো ? এই এখনও একটা বাড়ি শেষ করা হয়নি, ছোট দিদিমণির বিয়েটা এখনও দিতে পারিনি, তারপর অভাবের সংসার, সে-তো দেখেইছিস, নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। চারদিকে কিছু দেনা হয়ে গেছে, সেইগুলো সব গুছিয়ে-গাছিয়ে তবে তো যাবো। না কি সব ফেলে চলে যাবো ? ও কাজগুলো ফেলে ছড়িয়ে তো যেতে পারি না! কী বল্—তুই তো বিচক্ষণ ছেলে ; তুই কী বলিস ?

কেষ্টা বললে—আজ্ঞে, তা-তো বটেই—

—তা সেই জন্যেই বলছি বাবা, তুই বাবা চিত্রগুপ্তের খাতাটা একবার দেখে এসে আমাকে সময় করে বলে যাস, বুঝলি ? ছ'মাস আগে জানতে পারলেও অনেক সুবিধে হবে আমার—দেনাগুলো শোধ করে ফেলবো, ছোট দিদিমণির বিয়েটা দিয়ে দেব, বাড়িটাও আরম্ভ করেছিলুম, শেষ করতে পারিনি, সেটাও তুলে ফেলবো! অনেক কাজ, বুঝলি বাবা অনেক কাজ

আমার বাকী রয়েছে! তুই খবরটা দিলেই সব গুছিয়ে রাখবো—তারপর যেই তুই আসবি, আমি একেবারে তৈরী হয়ে পা বাড়িয়ে বসে থাকবো—

কেষ্টা বললে—আজ্ঞে, ঠিক আছে, আমি আপনাকে আগের থেকে জানিয়ে যাবো, কবে যেতে হবে!

কেষ্টা চলে গেল। কর্তাবাবুও বাঁচলেন। যাক্, এতদিনে একটা কাজের মত কাজ হলো। আগে খবরটা পেয়ে তিনি সব কাজকর্ম শেষ করে হাত-পা ধুয়ে-মুছে তৈরী হয়ে বসে থাকবেন। তারপর যেদিন ডাক আসবে—সেদিনই যাত্রা!

বড় নাতি এতক্ষণ সব শুনছিল। বললে—তুমি তাহ'লে মরে যাবে—না দাদু?

কর্তাবাবু বললেন—না দাদু, আর মরে যাবো না। যেদিন মরে যাবো, তার আগেই তোমাদের সব মানুষ করে যাবো, তোমার ছোট পিসীমার বিয়েটা হয়ে যাবে, আমরা নতুন বাড়িতে উঠে যাবো। আমি মরে গেলেও তোমাদের কোন দুঃখ রেখে যাবো না—

* * *

ঠিক তার দু'দিন পরের কথা। দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়া করে নিজের হাতে তামাক সেজে খেয়ে একটু গড়িয়ে নিচ্ছিলেন কর্তাবাবু নিজের বিছানায়। বাইরে তখন খুব রোদ। সবে একটু চোখের পাতা দুটো বুঁজে এসেছে, এমন সময় বাইরের সদর দরজায় কে যেন কড়া নাড়লে!

কর্তাবাবু উঠলেন! কে এল আবার এই ভর-দুপুরবেলা! হয়ত ঝি এসেছে বাসন মাজতে! তা এত সময় থাকতে এই ভর-দুপুরবেলায় আসতে আসতে হয় গো বাছা! লোকে কী একটু ঘুমোবে না? লোকে কী একটু বিশ্রাম করবে না?

দরজা খুলে দিতে-দিতে কর্তাবাবু বললেন—তা হ্যাঁ গা পদীর মা, তুমি কী আমাদের একটু জিরোতে দেবে না বাছা?

কিন্তু দরজা খুলতেই সামনে যেন ভূত দেখছেন কর্তাবাবু! বললেন—তুই?

জলজ্যান্ত কেষ্টা দাঁড়িয়ে আছে সামনে। বললে—আজ্ঞে, চলুন হুজুর—

—কোথায় যাবো রে ব্যাটা? বলছিস কী তুই?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক বলছি, আপনাকে যেতে হবে—

কর্তাবাবু চমকে উঠলেন। বললেন—তার মানে? তার মানেটা কী?

কেষ্টা বললে—আমি আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি কর্তাবাবু—

—সে কী রে? তোকে যে বলেছিলুম আমাকে আগে থেকে খবরটা জানতে! বললুম যে আমি কাজ-টাজ গুছিয়ে-গাছিয়ে রাখবো, বাড়িটা তুলবো, তোর ছোট দিদিমণির বিয়েটা দিতে হবে, মাথার ওপর দেনাগুলো রয়েছে, সেগুলো শোধ করতে হবে—তোকে বলিনি? ভুলে গেলি সে-সব কথা? না-না, এখন এ অবস্থায় সব ফেলে ছড়িয়ে রেখে কী করে যাবো! আমার এখন যাওয়া হবে না—

বলতে-বলতে হঠাৎ কানে এল কান্নার শব্দ! কোথায় কেষ্টা, কোথায় কে! তাঁর মুখে কথা নেই। দেখলেন চারিদিকে সবাই তাঁকে ঘিরে রয়েছে। সবাই কাঁদছে তাঁকে ঘিরে। বড় বৌমা, মেজো বৌমা, বড় নাতি, ছোট নাতি, ছোট মেয়ে—সবাই হাপুস-নয়নে কাঁদছে।

দত্তবাবু দৌড়তে-দৌড়তে এলেন।

জিজ্ঞেস করলে—কী হয়েছিল চাটুজ্যেমশায়ের?

বড় বৌমা এক গলা ঘোমটা দিয়ে বললে—খেয়ে-দেয়ে উনি তো বিছানায় গিয়ে শুয়ে তামাক খাচ্ছিলেন, হঠাৎ ঝি এসে কড়া নাড়তেই উনি দরজা খুলে দিতে গেছেন, আর এই কাণ্ড—

দত্তবাবু বললে—ব্লাডপ্রেশার রয়েছে, এ বুড়ো বয়সে কী আর অত খাটুনি পোষায়!

কর্তাবাবু সব কথাই শুনতে পাচ্ছেন, কিন্তু কিছু জবাব দিতে পারছেন না। শুয়ে-শুয়ে সব দেখতে লাগলেন, সব শুনতে লাগলেন। বড় নাতিটি তাঁর বড় ন্যাওটা। সেও তাঁর পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে হাউহাউ করে কাঁদছে। বলছে—দাদু কোথায় গেলে তুমি!

কর্তাবাবুর ইচ্ছে হলো নাতির মাথায় হাত দিয়ে বলেন—ওরে, আমি মরি নি রে দাদু, আমি মরিনি, সব শুনতে পাচ্ছি, সব দেখতে পাচ্ছি—

কিন্তু তিনি কিছুই বলতে পারলেন না। অসাড়, অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইলেন সেইখানে। চিত্রগুপ্তের সামনে হাজির হলেন কর্তাবাবু। কেমন ভয়-ভয় করেছিল তাঁর। পা দু'টো কেমন নড়বড় করছিল।

কেষ্টা অভয় দিলে। বললে—কিছু ভয় নেই কর্তাবাবু, আমি রয়েছি,

ভয় কী ? চলে আসুন ভেতরে—

কত লোক, কত কাজ করছে একমনে। কেষ্টা কর্তাবাবুকে নিয়ে যেতেই কাগজপত্র পরীক্ষা হতে লাগলো কর্তাবাবুর।

—নাম কী আপনার ?

কর্তাবাবু বললেন—ভূমিপতি চট্টোপাধ্যায়—

লোকটা ভ্রূ কোঁচকালো। বললে—নিবাস ?

—বেহালা।

শুনেই লোকটা চিত্রগুপ্তর কাছে গিয়ে হাজির। বললে—এই দেখুন হুজুর, এই কেষ্টা ভুল করে কাকে আনতে কাকে এনেছে—

—কেন ?

—আজ্ঞে এই দেখুন না, আমি বলেছিলুম ধনেখালির ভূমিপতি বোসকে আনতে, এনে ফেলেছে বেহালার ভূমিপতি চাটুজ্যিকে—এখন এর কী বিহিত করবেন করুন !

শুনেই চিত্রগুপ্ত যেন একেবারে অগ্নিশর্মা। বললেন—শূয়ার, ইস্টুপিট। কাজে ফাঁকি দেওয়া, এ কী তোমার পৃথিবী পেয়েছ যে ভুল করলেও ঘুষ দিয়ে মাফ আছে। যাও, একে এখন ফেরৎ দিয়ে এসো—যাও—

—আর কেষ্টার কী শাস্তি হবে হুজুর ?

চিত্রগুপ্ত বললেন—ওর মাফ নেই, যেখান থেকে নিয়ে এসেছিল ওকে, সেইখানেই ফিরিয়ে দিয়ে আসুক, তারপর আমি দেখছি—

ব্যাপার-স্যাপার দেখে কর্তাবাবুর প্রাণ ধড়ফড় করছিল এতক্ষণ। এবার যেন আবার প্রাণ ফিরে পেলেন। যেন তাঁর বিশ্বাস হচ্ছিল না কথাগুলো। চারদিকে এত লোক, এত ঐশ্বর্য, এত কাজ।

চিত্রগুপ্ত আবার চিৎকার করে উঠলেন।

—আবার দেখছো কী ? যাও—যাও, এখান থেকে, দূর হয়ে যাও—

কেষ্টা বললে—চলুন কর্তাবাবু—চলুন—

কর্তাবাবুর তখনও পা সরছে না। দু'টো হাত জোড় করে বললেন—হুজুর, একটি নিবেদন আছে আপনার কাছে—

—কী নিবেদন ?

কর্তাবাবু বলতে লাগলেন—এবার তো বাঁচিয়ে দিলেন হুজুর, তার জন্যে

আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ! কিন্তু একদিন তো আমাকে সত্যি-সত্যিই আসতে হবে এখানে!

—হ্যাঁ, তা-তো আসতে হবেই!

—তাই বলছিলাম—আমার সংসারে অনেক কাজ পড়ে আছে হুজুর, অনেক কাজ পড়ে আছে। বাড়িটা আরম্ভ করেছিলুম, এখনও পুরো শেষ করতে পারিনি। নাতি দু'টো এখনও নাবালক রয়েছে, ছোট মেয়েটার এখনও পাত্র জোগাড় করতে পারিনি—অনেক কাজ—

চিত্রগুপ্ত বললেন—তা সেজন্যে কী করতে হবে?

কর্তাবাবু বললেন—হুজুর, তাই বলছিলুম, আমাকে যদি একটু আগের থেকে খবরটা দিয়ে দেন তো আমি সব কাজগুলো গুছিয়ে তৈরী হয়ে থাকতে পারি—

চিত্রগুপ্ত বললেন—তার মানে? আগের থেকে খবর তো দেওয়া হয় সকলকেই—

আজ্ঞে—আমি তো আগের থেকে খবর পাইনি। আমাদের বংশের কেউই খবর পায়নি। আমার বাবা হঠাৎ আমাদের রেখে মারা গেছেন—

চিত্রগুপ্ত বললেন—না-না, ও-রকম আগের থেকে খবর দেওয়া-টেওয়া নয়। ওই চুল পাকে, দাঁত নড়ে, চোখে ছানি পড়ে, ওইটেই তো নোটিশ—তার বেশী আর খবর দেবার নিয়ম নেই এখানে—ও-সব আবদার চলবে না—যাও এখান থেকে, বিরক্ত করো না—

* * *

তখনও সবাই খাটের চারপাশে বসে আছে। আশা আর নেই। ডাক্তারবাবু শেষ ওষুধ দিয়ে চলে গেছেন। কান্নাকাটি চলছে, হঠাৎ যেন কর্তাবাবুর চোখের পাতা দুটো নড়ে উঠলো।

দত্তবাবু বললে—ওকি, উনি বেঁচে আছেন, তোমরা কাঁদছো কেন বৌমা?

সত্যিই সবাই দেখলে অবাক্ হয়ে কর্তাবাবু যেন একটু নড়ে উঠলেন। বড় নাতি দাদুর মাথার কাছে বসে ছিল। সে ডাকলে—দাদু—

কর্তাবাবু একটু পাশ ফিরলেন। বড় নাতি বললে—দাদু, এই যে আমি দাদু, আমি তোমার মাথার কাছে বসে আছি যে—

দত্তবাবু বললে—আমি তখনই বলেছিলুম ও ডাক্তার ধন্বন্তরি—আবার ডেকে পাঠাও তাঁকে—

* * *

কর্তাবাবু দিন দু'য়েকের মধ্যেই ভাল হয়ে উঠলেন। ওষুধ পথ্য নিয়ম করে চলতে লাগলো। সকাল থেকে নিয়ম করে বিশ্রাম, নিয়ম করে খাওয়া, নিয়ম করে ঘুমোন—নিয়ম করে সমস্ত কিছু।

দত্তবাবু বললে—চাটুজ্যেমশাই, এ পাড়ার নতুন ডাক্তারটি একেবারে সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি, ঠিক সময়ে ওষুধটি পড়েছিল তাই রক্ষে—আর ভয় নেই, এবার দেখতে-দেখতে সেরে উঠবেন—আর ভয় করবেন না—

বড় নাতি বললে—তুমি আর মরবে না দাছু, তুমি এবার থেকে বেঁচে থাকবে—

কিন্তু কর্তাবাবুর মুখ গম্ভীর। একটা কথারও উত্তর দেন না তিনি। তাঁর নোটিশ হয়েই গেছে। সব কাজ গুছিয়ে ফেলতে হবে। বাড়িটা তুলতে হবে, দেনাগুলো শোধ করতে হবে, নাতিদের মানুষ করতে হবে, ছোট মেয়ের বিয়ে দিতে হবে—

নাতিরা বলে—দাছু, বেড়াতে নিয়ে চলো—

কর্তাবাবু বললে—না দাছু, আর সময় নেই, সব কাজ গুছিয়ে ফেলতে হবে, কিছু ফেলে রাখবে চলবে না—আর সময় নেই—

বাকীটা আর মুখে বলেন না। সেটা মনে-মনেই রাখেন। তার চুল পেকে গেছে, তাঁর দাঁত নড়েছে, তাঁর চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে এসেছে—তাঁর তো নোটিশ এসেই গেছে। এবার সব কাজ গুছিয়ে ফেলতে হবে—কিছু ফেলে রাখলে চলবে না। আর সময় নেই তাঁর!

নাতিরা তবু ছাড়ে না। তারা নতুন। তারা কর্তাবাবুকে টানতে টানতে মাঠে নিয়ে যায়। তারা খেলে আর কর্তাবাবু বসে-বসে পাহারা দেন। নাতিদের সঙ্গে কর্তাবাবুও হাসেন, কথা বলেন। আবার বাজারে যান, তামাক খান, সংসার করেন। কিন্তু নাতিরা বুঝতেও পারে না, কখন সবার অগোচরে দাছুর নোটিশ এসে গেছে।

———

এ এক অদ্ভুত অসুখ। ভারতবর্ষে এ-অসুখের নাম আগে কেউ শোনে নি। কাকা খায় না, স্নান করে না। গান-বাজনা বন্ধ, টেরি কাটাও বন্ধ। কোনও কথার জবাব দেয় না। অথচ দশদিন আগেও বেশ সুস্থ মানুষ ছিল। সকালবেলা উঠে তিন কাপ চা খেত। তিন দিস্তে লুচি খেত। তারপর স্নানে করতে যেত। সে-স্নান চলতো পুরো এক ঘণ্টা ধরে। তারপর আধ ঘণ্টা ধরে টেরি কাটা। চুল আঁচড়াবার তিন রকম চিরুনি ছিল। মোটা, মাঝারি আর সরু। প্রথমে মোটা চিরুনি দিয়ে চুলটা আঁচড়ে নিয়ে, মাঝারি চিরুনি দিয়ে টেরি কাটা হতো। তারপর চুলের কেয়ারী হতো সরু চিরুনিতে। টেরি কাটা শেষ হলে বেরুতে তানপুরা, তবলা। কাকা গানের রেওয়াজ করতো চার ঘণ্টা ধরে। ধ্রুপদ, খেয়াল নিয়েই কাকার কারবার। কেউ ধরে বসলে—টপ্পা ধরতো। কিন্তু ঠুংরী? কাকা বলতো—ওসব হাল্‌কা চালের জিনিস এখানে চলবে না—ওতে সাধনার ব্যাঘাত হয়—

গান শেষ করে কাকার খাওয়া। কাকা একলা এক ঘরে বসে খাবে। বাড়ির অন্য লোকেদের সঙ্গে হট্টগোলের মধ্যে খেতে দিলে পেট ভরবে না কাকার। তা'হলে পেট ভুটভাট্ করবে, গলা মোটা হয়ে যাবে—

কাকা বলতো—খাওয়াই বল আর গানই বল, সব সাধনার ব্যাপার, বেঁচে থাকাটাই একটা তপস্যা কিনা—

মুনি-ঋষিরা হিমালয়ের গুহায়, গভীর জঙ্গলের মধ্যে তপস্যা করতেন। আমাদের কাকা সেই একই তপস্যা করতো বাড়িতে বসে। চিবিয়ে-চিবিয়ে, চুষে-চুষে, চেটে-চেটে যখন খাওয়ার সাধনা শেষ হতো, তখন শুরু হতো ঘুমের

সাধনা। বড় কঠিন সে-সাধনা। বিকেল চারটে, পাঁচটা, ছ'টা বেজে গেলেও কারুর সে সাধনা ভাঙাবার অধিকার ছিল না।

ঘুম থেকে উঠে কাকা বলতো—সকাল ক'টা বাজলো রে ?

বলতাম—সকাল কোথায়, এখন সন্ধ্যে যে—

কাকা বলতো—দেখেছিস, কী রকম তন্ময় হয়ে ঘুমোচ্ছিলাম—বাহ্যজ্ঞান ছিল না—

তারপর আবার ঘুম থেকে উঠে চলতো কাকার স্নান আর টেরি কাটার সাধনা। শেষে আবার রাত দু'টো পর্যন্ত সঙ্গীত-সাধনা। তখন তেতলার দরজা-বন্ধ ঘরে চলতো ওস্তাদ বিল্লু খাঁ'র সঙ্গে ধ্রুপদ আর খেয়াল। সে-সাধনার তেজে সমস্ত বাড়িটা থরথর করে কাঁপতো। ছোট পিসির কোলের মেয়েটা এক-একদিন হাউমাউ করে কঁকিয়ে কেঁদে উঠতো—

কাকার কাছে ছোট পিসি কিছু বলতে গেলে, কাকা আমাদের বলতো, দেখেছিস—সাধনার কত বাধা—

সাধনা করে-করে কাকার শরীর ফুলে গেল। আমরা দু'হাতে জড়িয়ে ধরতে পারতাম না ভুঁড়িটা। ছ'মাস অন্তর-অন্তর জামা বদলাতে হত। সত্যিই বুঝতাম সাধনায় কত বাধা।

কাকা বলতো—ও-সব কেয়ার করতে গেলে চলবে না রে—তৈলঙ্গস্বামী তো ইয়া হাতীর মত মোটা হয়ে গিয়েছিলেন, তা বলে কী সাধনা ছেড়েছিলেন ?

কাকার বিরুদ্ধে কে কী বলবে ? ঠাকুর্দা ছিলেন অমায়িক। বলতেন—ওকে কিছু বলো না কেউ—ও একটা কিছু নিয়ে বেঁচে থাকলেই হলো !

ছোটবেলায় নাকি কাকার একবার বেদম টাইফয়েড রোগ হয়েছিল। ডাক্তারেরা হাল ছেড়ে দিয়েছিল একবারে। রোগে ভুগে-ভুগে প্যাকাটির মত রোগা হয়ে গিয়েছিল কাকা। বাড়িতে প্রায় কান্নাকাটি শুরু হবার জোগাড়। শেষে কোন্ এক সন্ন্যাসীর কী ওষুধ খেয়ে বেঁচে গেল সে-যাত্রায়। যাবার সময়ে সন্ন্যাসী বলেছিল—এ-ছেলে অসাধারণ ছেলে তোর—একে বাঁচিয়ে রাখিস—

সাধুর কথা অক্ষরে-অক্ষরে যে সত্যি, তা বুঝতে পারা যেত। কাকা সাতবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছিল, কিন্তু সাতবারই ফেল। কাকা যখন 'প্রথম ভাগ' শুরু করে, তখন বাজারে 'বর্ণ পরিচয়' বইটাই ফুরিয়ে গিয়েছিল।

কলকাতা থেকে ভি-পিতে একশো-দু'শো টাকার বই আসতো। দেড় দিনের মধ্যেই আবার তা নিঃশেষ। শেষে কলকাতার বই-এর দোকানওয়ালারা লিখলে—'বর্ণ পরিচয়' সব শেষ হয়ে গেছে, বাজারে আর বই ছাপা নেই। ঠাকুর্দা তখন খরচা দিয়ে ছাপাখানা থেকে নিজেই ছাপিয়ে নিলেন সে বই। বড় হয়েও কাকার সে অভ্যেস যায়নি। ডুগি-তবলাই যে কত জোড়া এল, তারই কী ঠিক আছে! কাশী থেকে ফরমাশ দিয়ে তবলা এল কাকার। চিৎপুরের কালু মিস্ত্রী বাঁয়া-তবলা বাঁধিয়ে দিলে রুপো দিয়ে।

বাগানের একটা নিমগাছও আর আস্ত রইল না। সে গাছ থেকে কাঠ কেটে তবলা তৈরি করে দিতো কালু মিস্ত্রী বাড়িতে বসে। তানপুরা এল ওয়াগন ভর্তি হয়ে। চিৎপুরের এনায়েত ভালো তানপুরা করে। তার কাছে ফরমাশ দেওয়া হলো। দশটা-বারোটা করে তানপুরা আসতো। কাকা একবার তারে পিড়িং করে একটা শব্দ তুলেই বলতো—না রে, সুরে বলছে না—

অনেকদিন বলেছি—এবার একদিন জলসা করো কাকা, দশজনকে শোনাও তোমার গান—

কাকা বলতো—এ জিনিস দশজনের জন্যে নয় রে—নিজের সাধনা দশজনকে জানাতে নেই। তা'হলে সব গুণ নষ্ট হয়ে যাবে—

এমনি করেই দিন কাটছিল কাকার। সাধনার আর বিরাম ছিল না। সাধনার কোন্ স্তরে যে কাকা পৌঁছেছিল তাও, টের পাইনি। শুধু এইটুকু বুঝতাম যে কাকা একটা কিছু ভীষণ সাধনায় মগ্ন, নইলে ছোট পিসীর কোলের মেয়েটা অমন ঘুমের ঘোরে হাউমাউ করে ককিয়ে কেঁদে ওঠে কেন?

তা' এই কাকাই এক ভীষণ অসুখে পড়লো। এ-অসুখের নামও আগে কেউ শোনেনি। খাওয়া নেই, গান-বাজনা নেই, টেরি কাটা নেই। সে এক ভয়াবহ অবস্থা। কাকা শুয়ে থাকে খাটের ওপর। আর বলে—এত তুলো!

ঠাকুর্দা বুড়ো অথর্ব শরীর নিয়ে দোতলায় উঠে এসে জিগ্যেস করেন —কেমন আছো বাবা পটল?

কাকা উত্তর দেয়—এতো তুলো!

—কোথায় তুলো বাবা, ও-সব তো তানপুরো আর তবলা, আর দেয়ালের গায়ে ও-সব তো তোমার ওস্তাদের ছবি আর ওখানে আলনায় তো তোমার

জামা-কাপড়, আর তো কিছু নেই—

ঠাকুরর্দা চোখের ক্ষীণ দৃষ্টি দিয়ে ঘরের চারদিকে আতি-পাঁতি করে খুঁজে দেখেন। কোথাও তুলো নজরে পড়ে না।

মা গিয়ে বলে—কী খেতে ইচ্ছে করে তোমার ঠাকুরপো ?

কাকা সে-কথার উত্তরেও তেমনি উদাস গলায় বিড়বিড় করে—এত তুলো !

এবার আর অমনি ফেলে রাখা যায় না। কবিরাজ ডাকাতে হয়। চিন্তামণি কবিরাজ এলেন তাঁর ঘোড়ার গাড়ি চড়ে। বৃদ্ধ মানুষ। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চাকর আর তাঁর গড়গড়াটা গাড়ি থেকে এনে সামনে রাখলে। বৃদ্ধ চিন্তামণি কবিরাজ বাঁ হাতে কাকার নাড়ি টিপে ডান হাতে গড়গড়ার নল ধরে তামাক খেতে লাগলেন। অনেকক্ষণ গম্ভীরভাবে পরীক্ষা করে বলেন—হুঁ—

বাবা বলেন—কী বুঝলেন কবিরাজ মশাই ?

কবিরাজ মশাই ধোঁয়া ছেড়ে বলেন—বুঝলুম, বেশ গুরুতর ব্যাধি অস্থিতে গিয়ে ঠেকেছে—ভালো করে চিকিৎসা করাতে হবে—

ঠাকুর্দা বললেন—সারবে ?

চিন্তামণি কবিরাজ বললেন—না সারলে ছাড়বো কেন ?

—রোগটা কী ?

—রুধিরাস্থি। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে এর বিধান আছে—

—রুধিরাস্থি মানে—? বাবা জিগ্যেস করলেন।

হাত ধুতে-ধুতে কবিরাজ মশাই বললেন—অস্থির মধ্যে, অর্থাৎ হাড়ের মধ্যে রুধির অর্থাৎ রক্ত ঢুকেছে···

সবাই ভয় পেয়ে গেলাম। কিন্তু চিকিৎসা চললো। সব ওষুধের নাম মনে নেই। স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজের সঙ্গে গুলঞ্চ, অশ্বপুচ্ছ ভস্ম আর সব কী-কী লাগলো। মহা ধুমধামের চিকিৎসা। তিন মাস ধরে চললো। কিন্তু কিছুই ফল হলো না। ঠাকুর্দা এসে কাকাকে জিগ্যেস করেন···কেমন আছো বাবা ?

কাকা তেমনিভাবে উত্তর দেয়—এত তুলো !

আমি গিয়ে জিগ্যেস করি—কাকা, আমাদের চিনতে পারো ?

কাকা বলে—এত তুলো !

ওস্তাদ বিল্লু খাঁ প্রশ্ন করে—বেটা, কেয়া হুয়া তেরা ?

কাকা আবার হিন্দীতে বলে—এত্‌না তুলো !

এবার হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার এল। নীলকণ্ঠ মজুমদার। কোট-প্যাণ্ট পরা। স্টেথিস্‌কোপটা গলায় ঝুলিয়ে। চাকর রিক্‌শা থেকে ওষুধের ব্যাগটা নিয়ে এল। নীলকণ্ঠ মজুমদার বললেন—কে দেখছে ?

কবিরাজের নাম বলা হলো। বললেন—রোগী গরম খেতে ভালবাসে না ঠাণ্ডা ?

বাবা বললেন—গরম—

—জিভে গরম না হাতে গরম ?

সব খবর নিলেন। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে তিন পুরুষের ইতিহাস শুনলেন।

ঠাকুর্দা জিজ্ঞেস করলেন—কী রোগ ডাক্তারবাবু ?

নীলকণ্ঠ মজুমদার টাকা হাতে নিয়ে গুণতে-গুণতে বললেন—রোগের নাম শুনে আপনারা কী বুঝতে পারবেন ? এর নাম হলো ফিজিও-সাইকোসিস—

—সারবে ?

নীলকণ্ঠ মজুমদার বললেন—আমরা রোগ সারাই না, রোগীকে সারাই—তা' মহাত্মা হ্যানিম্যানের শাস্ত্রে দুরারোগ্য বলে কোনও জিনিস নেই—

এতেও তিনমাস চললো। পুরিয়ার পর পুরিয়া। কিন্তু কিছুই হলো না। ওই অত বড় যে কাকার ভুঁড়ি, তাও বেহালার মতন পেট-চ্যাপ্টা হয়ে গেল। ঘুম নেই, গান বাজনা নেই, টেরি কাটা নেই কেবল এত তুলো ! এত তুলো !

আমরা ভেবে পেতাম না কোত্থেকে 'এত তুলো' দেখতে পায় কাকা।

কলকাতা থেকে বড়-বড় ডাক্তার আসে, মোটা-মোটা ফি নিয়ে যায়। সন্ন্যাসী, সাধু, জলপড়া, ঠাকুরের প্রসাদ সব নিষ্ফল ! কাকাকে দেখে এবার চোখে জল আসে। 'এত তুলো'র সমস্যার সমাধান হয় না।

মামা এতদিন বাইরে ছিল। হঠাৎ খবর পেয়ে এল দেখতে। বললে কী হয়েছিল ? বাবা বললেন—কী আর হবে, ক'দিন আগে কলকাতায় গিয়েছিল তবলা কিনতে, পরের দিন ফিরে এল—এসে পর্যন্ত 'এত তুলো', 'এত তুলো' করছে—

মামা বললে—কাকে কাকে দেখিয়েছ ?

বাবা বললেন—কাউকে আর দেখাতে বাকী রাখিনি—

মামা তুড়ি দিয়ে হেসে উঠলো ! বললে—আরে, এই সামান্য ব্যাপারটা নিয়ে তোমরা এত মাথা ঘামাচ্ছো, আর এতগুলো টাকা জলে ফেলে দিলে ?

তারপর কাকার ঘরে গিয়ে বললে—কী হয়েছে তোমার পটল ?

কাকা বললে—এত তুলো ! মামা গম্ভীর হয়ে দু'হাত তুলে বললে—যাচ্ছি আমি কলকাতায়—দেখে আসছি—

বাইরে আসতেই বাবা জিগ্যেস করলেন—কলকাতায় যাচ্ছো কেন ?

—যাচ্ছি দেখতে, একটা বিহিত করতে—

বলে সত্যিই মামা কলকাতায় চলে গেল। আমরা অবাক হয়ে গেলাম। কলকাতায় গিয়ে মামা কী বিহিত করবে ? আবার সেই রকম দিন কাটে। ঠাকুর্দা কথা বলতেন কম। সাধুবাবা বলে গিয়েছিলেন তোর এ ছেলে অসাধারণ, একে বাঁচিয়ে রাখিস। তা বাঁচানো বুঝি আর গেল না ! গান বাজনা, তবলা, তানপুরো, চুল, টেরি, খাওয়া নিয়ে ছিল একরকম পটল।

কিন্তু শেষকালে এ কী হলো ! এত তুলো কোত্থেকে আসে ! এত সব জিনস থাকতে তুলো !! ধুলো নয়, বালি নয়, রসগোল্লা নয়, মানুষ নয়, বোমা-বারুদ নয়, সামান্য তুলো সামান্য তুলো শেষে এমন অসামান্য কাণ্ড বাধিয়ে তুললো !

হঠাৎ দিন পনেরো পরে মামা কলকাতা থেকে এসে হাজির !

লাফাতে-লাফাতে এসে বললে—হয়েছে, পেয়েছি—

কী পেয়েছ ?

মামা বললে—এসো, পটলের ঘরে এসো—

সবাই মামার পেছন পেছন কাকার ঘরে গেলাম।

মামা সোজা গিয়ে কাকাকে জিগ্যেস করলে—কেমন আছো পটল ?

কাকা তেমনি বললে—এত তুলো !

মামা দু'হাতে তুড়ি দিয়ে হো হো করে হেসে উঠলো। বললে—কোথায় তুলো—তুলো আর এতটুকুও নেই, দেখে এলাম নিজে সব, তুলো পুড়ে ছাই হয়ে গেছে—

কাকার চোখ দু'টো যেন আস্তে-আস্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। যেন আবার চোখে সব দেখতে পাচ্ছে। ধীরে-ধীরে নীচুগলায় বললে—সে কী। সত্যি ?

মামা এবার হৈ-হৈ করে ঘর ফাটিয়ে হাসতে হাসতে বললে—কোথায় আছো তুমি পটল, সে সব ফক্কা, সে গুড়ে বালি—আর এক ফোঁটা তুলোও নেই—তুলোপাটিতে আগুন লেগে একেবারে সব ফরসা হয়ে গেছে যে, তা

জানো না ?

এতক্ষণে নজরে পড়লো আমাদের। কাকার রোগা-মুখে যেন ক্ষীণ হাসি বেরিয়েছে। বাইরে এসে বাবা জিজ্ঞেস করলেন মামাকে—ব্যাপার কী সম্বন্ধী ?

মামা বললে—কলকাতায় গেলাম। খোঁজ নিতে লাগলাম কোথায় পটল গিয়েছিল, কেউ কোন হদিস দিতে পারে না। তবলার দোকানেও গেলাম। পনেরো দিন ধরে বেড়ালাম। কেবল শেষে একজন বললে পটল নাকি বড়বাজারে কটন ষ্ট্রীটে গিয়েছিল, সেখানে তুলোপটিতে ঢুকে মাথা ঘুরে গেছে ওর সেই পাহাড় প্রমাণ তুলো দেখে মাথা ঠিক রাখতে পারেনি আর কী। তা ওর দোষ নেই, সে যা তুলোর পাহাড়, তুমি গেলে তোমারও মাথা খারাপ হয়ে যেত।

———

মহারাজ মনু শুধু রাজাই ছিলেন না, একাধারে বিরাট জ্ঞানী পুরুষও ছিলেন। জ্ঞান মানুষকে অহংকারী করে না, বিনয়ী করে। ক্ষমতা পেয়ে অনেক মানুষই বিবেক বিসর্জন দেয়। ক্ষমতার অধিকারী হয়ে মানুষ আমূল বদলে যায়। আজকের যুগে রাজা-রাণীর অস্তিত্ব কমে আসছে। কারণ মানুষ দেখেছে রাজ্যের অধিকার পেয়ে রাজা অনেক সময় সুবিচার করতে ভুলে যায়। তার বদলে তাদের প্রতিনিধি করেছে প্রেসিডেণ্টকে। সেকালের রাজাদের পদ অধিকার করেছে প্রেসিডেণ্টরা। প্রেসিডেণ্ট অন্যায় করলে তার প্রতিকার আছে। কিন্তু রাজা অপরাধ করলে তার আর প্রতিকার নেই। সেই কারণেই রাজা-রাণীর দল ক্রমেই কমে আসছে আমাদের পৃথিবী থেকে! মহাভারতের শান্তিপর্বে ভীষ্ম বলেছেন—চোদ্দ বছর সন্ন্যাসাশ্রম পালন করলে, যে পুণ্য সঞ্চয় হয়, এক বছর সুখে প্রজাপালন করলেও সেই একই পুণ্য সঞ্চয় হয়। কিন্তু আজকের দিনে তেমন প্রেসিডেণ্টই বা ক'জন আছেন? তাই ইতিহাসের পাতায় এত ঘন-ঘন প্রেসিডেণ্ট বদলের নজীর রয়েছে।

কিন্তু মনুই একমাত্র রাজা, যিনি প্রজাপালনকে ধর্মপালন মনে করতেন। ইতিহাসে তাঁর মত রাজার দৃষ্টান্ত আর দু'টি নেই বলেই এখানে তাঁর প্রজাপালনের নীতি সম্বন্ধে একটা কাহিনী বলছি।

যে-রাজ্যে সুবিচার নেই, সেই রাজ্যকে 'অরাজক' বলে। প্রজারা যদি সুবিচার না পায় তাহলে সে-রাজ্যে শান্তি থাকে না। রাজ্যের স্থায়িত্ব নির্ভর করে রাজার সুবিচারের ওপর। সুবিচারের অভাব হলেই রাজ্যের প্রজাদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়। তারা রাজাকে সিংহাসন থেকে তাড়িয়ে

দেয়। এই তাড়িয়ে দেবার অধিকার প্রথম স্বীকৃত হয় আমেরিকায়। ১৭৮১ সালে। ১৭৮৯ সালে ফরাসী-বিপ্লবের সময় সেখানকার রাজাকে কেমন করে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়, তার বিবরণ লেখা আছে ইতিহাসের পাতায়। বড় হয়ে তা তোমরা পড়বে।

এই বিচারের ব্যাপারেই একবার মহারাজ মনুকে দারুণ বিভ্রাটের মধ্যে পড়তে হয়েছিল। এই ভূখণ্ডেরই এক প্রজার সঙ্গে আর এক প্রজার বিবাদ বেধে গিয়েছিল একদিন। বিবাদের উপলক্ষ্য বড় সামান্য। কিন্তু সেই সামান্য জিনিসটাই একদিন মহারাজ মনুর কানে গিয়ে পৌঁছল।

সুধর্ম ছিল ছোট চাষী। ক্ষেতে চাষ-বাস করে দিন চালাত। কোনও অভাব ছিল না তার। প্রয়োজনের বেশি উপার্জন করার আকাঙ্ক্ষা ছিল না বলে মনেও তার শান্তি ছিল। আর সৌম্য ছিল তারই প্রতিবেশী। সেও চাষী। পাশাপাশি বাড়ি। দু'জনের বন্ধুত্বও ছিল যথেষ্ট। দেখা হলে দু'জনকে দু'জনেই নমস্কার করতো। কুশল জিজ্ঞেস করতো। পরস্পরের বিপদে-আপদেও দু'জনে দু'জনকে দেখতো। একজনের গাছে ফল পাকলে আর একজনকে তা দিয়ে আসতো। বহুদিন ধরে পাশাপাশি বাস করার ফলে আত্মীয়ের মতন হয়ে গিয়েছিল তারা। একে মহারাজ মনুর মত রাজা, তায় পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের প্রীতি, তার ওপর সংসারের স্বচ্ছলতা, এ যেন কল্পনাও করা যায় না আজকাল। দেশে দুর্ভিক্ষ নেই, খাদ্যাভাব নেই, সকলের সুন্দর স্বাস্থ্য। সদ্ভাব থাকবে না-ই বা কেন ?

কিন্তু হঠাৎ একদিন বিবাদ বাধলো একটা সামান্য লাউ নিয়ে। সোনা নয়, হীরে নয়। এমন কী মোহরও নয়। সামান্য একটা লাউ ! এমন কত দিন কত লাউ সুধর্ম দিয়ে এসেছে সৌম্যের বাড়িতে গিয়ে। আজ কিন্তু লাউ নিয়েই মন কষাকষি শুরু হলো। শেষে মন কষাকষি থেকে বিবাদ। বিবাদ থেকে ঝগড়া মারামারি ! ঘটনাটা ঘটেছে এইভাবে—

একটা লাউ গাছ সুধর্মর বাড়ির উঠোনের এক কোণে জন্মেছিল। বেশ লকলকে গাছটা। নরম সবুজ হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তারপরে যখন আর যাবার জায়গা পায়নি, তখন মাচায় উঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই বাঁশের মাচাতেও যখন আর ধরলো না, তখন পাশের সৌম্যের বাড়ির চালে গিয়ে উঠেছিল। মাচাতেও যেমন লাউ ফলেছিল,

সৌম্যর বাড়ির খড়ের চালের ওপরও একটা লাউ ফলেছিল। ফলেছিল তো ফলেছিল। ও রকম কত লাউ ফলে, আবার কত লাউ শুকিয়ে যায়, তার হিসেব রাখার কোনও দরকার মনে করে না কেউ।

কিন্তু একজন একটা খবর দিয়ে গেল সুধর্মকে, যে তার গাছের লাউ কেটে নিয়েছে সৌম্য। খবরটা শোনার পর সুধর্মর রাগ হলো মনে-মনে। লাউটা চেয়ে নিলেই পারতো সৌম্য। না বলে কেটে নেবার দরকার কী? চাইলে কী সুধর্ম লাউটা দিত না তাকে? কত দিন কত জিনিসই তো সে দিয়ে এসেছে তাকে। তবে?

সেদিন সুধর্ম ঘুম থেকে উঠেই সোজা হাজির হলো সৌম্যের বাড়িতে। বললে—কী হে, আমার লাউটা চুরি করলে?

সৌম্য অবাক্ হয়ে বললে—চুরি করলাম মানে?

সুধর্ম বললে—না চাইতেই তো তোমাকে কতদিন কত জিনিস দিয়েছি, তা'হলে না-বলে তুমি লাউটা নিলে কেন?

সৌম্য বললে—তুমি আমাকে চোর বলছো? মুখ সামলে কথা বলবে!

সুধর্ম বললে—কী! চুরি করে আবার চোখ রাঙানি?

—কে বললে আমি চুরি করেছি?

—আমার গাছের লাউ তুমি কেটে নাও নি?

সৌম্য বললে—আমার চালের লাউ আমি কেটেছি, তোমার লাউ কে বললে? আমার নিজের বাড়ির চালের ওপর থেকে আমি কেটেছি। তোমার জমিতে আমি পা দিয়েছি?

সুধর্ম বললে—কিন্তু গাছটা তো আমার—

—গাছটা যারই হোক, তা আমার দেখবার দরকার নেই, আমার নিজের চাল থেকে কেটেছি, তাতে কারো কিছু বলবার নেই—

—তার মানে?

কথা-কথাকাটি থেকে শুরু হলো গালাগালি। আর তারপর গালাগালি থেকে হাতাহাতি। দু'টো পরিবারে আগে অত বন্ধুত্ব ছিল, অথচ একটা সামান্য লাউ নিয়ে বিবাদ আরম্ভ হয়ে গেল। চিৎকার শুরু হলো দু'পক্ষের। লাঠি বেরলো, সড়কি বেরলো। কেউ আর তখন কারোর নয়। দু'জনেই দু'জনের শত্রু। মারামারির খবর পেয়ে রাজদরবার থেকে রাজ্যের শান্তি-

রক্ষক এল। শান্তিরক্ষক এসে দু'জনকেই ধরে নিয়ে গেল। মহারাজ মনুর সামনে হাজির করা হোল তাদের। মনু জিজ্ঞেস করলেন—কী হয়েছে?

দু'জনেই দু'জনের বক্তব্য বললে।

—তোমার একটা সামান্য লাউ নিয়ে ঝগড়া করছো?

সুধর্ম বললে—ধর্মাবতার, লাউ সামান্য জিনিস হতে পারে, কিন্তু ও আমার জিনিস চুরি করবে তা বলে?

—তা চুরি করলেই বা, তুমি ওকে ক্ষমা করে দাও না—

সুধর্ম বললে—আমি আজ যদি ওকে ক্ষমা করি, তা'হলে কাল যে ও আমার আরো কোনও জিনিস চুরি করবে না তার প্রমাণ কী?

সৌম্যের দিকে চেয়ে তখন মহারাজ মনু বললেন—তুমিই না হয় ওর জিনিসটা ফেরত দিয়ে দাও—

সৌম্য বললে—ফেরত দেব কী করে হুজুর,, আমি যে সে লাউ রান্না করে খেয়ে ফেলেছি—আর না-খেলেও আমি ফেরৎ দেব কেন? ওটা তো আমি আমার নিজের জমিতেই পেয়েছি, আমি তো ওর এলাকায় যাইনি—

—তাহ'লেও তুমি ওর কাছে ক্ষমা চাও—

—কেন আমি ক্ষমা চাইতে যাব ধর্মাবতার? আমি অন্যায়টা কী করেছি?

গণ্ডগোলটা কিছুতেই মিটলো না। মহারাজ মনু অনেকক্ষণ ভেবে। কিছুতেই মীমাংসা করতে পারলেন না, কী বিচার করবেন, কাকে শাস্তি দেবেন! কে দোষী! বললেন—সাতদিন পরে এর বিচার করবো—আজ থাক—

সাত দিন সময় বড় দুর্ভাবনায় কাটলো। বড় চিন্তিত রাজ্যের সবাই। মহারাজ এর কী বিচার করবেন, দেখা যাক! এমন অভিযোগ কখনও আগে মহারাজার সামনে ওঠেও নি, সুতরাং এমন অভিযোগের বিচার করতেও হয়নি তাঁকে! কিন্তু মহারাজ মনুকে সবাই বিশ্বাস করে। মহারাজার ওপর সকলেরই আস্থা আছে। সবাই জানে মহারাজ মনু কখনও অবিচার করতে পারেন না। কেউ বলতে লাগলো—সুধর্মই জিতবে, লাউটা তারই—

আবার কেউ বললো—সৌম্যই জিতবে, লাউটা তারই—

জল্পনা-কল্পনা চলতে লাগলো দেশের মধ্যে। অত্যন্ত কঠিন সমস্যার সামনে দাঁড়াতে হয়েছে সকলকে। কেউ ঠিক বুঝতে পারছে না, কোনটা

ন্যায় আর কোন্‌টা অন্যায়।

সাত দিন পরে আবার মহারাজ মনু বিচারশালায় এসে বসলেন।

শান্তিরক্ষকেরা তাঁর সামনে হাজির করলে সুধর্ম আর সৌম্যকে।

মহারাজ মনু তাদের উদ্দেশ্যে বললেন—আমার বিচারে সুধর্মই অপরাধী। সুধর্মর বাড়ির জমিতে গাছটা জন্মেছিল বটে, কিন্তু যখন লাউটা সৌম্যর চালের ওপর ফলেছে, তখন ওটা ওরই, ওর কোন অন্যায় নেই—

তারপর একটু থেমে বললেন—আমার বিধানে সুধর্ম শাস্তি ভোগ করবে, সৌম্যকে অন্যায় ভাবে অপমান করার জন্যে। সুধর্মকে আমি চার মাস কাল কারাদণ্ড ভোগের আদেশ দিলাম!

মহারাজ মনু সেদিনকার মত উঠলেন। সভা ভঙ্গ হলো। একপক্ষ তুমুল হর্ষধ্বনি করে উঠলো। আর এক পক্ষ বিমর্ষ। রাজ্যের ভেতরে-বাইরে নানা আলোচনা চলতে লাগলো। মহারাজ মনু যখন বিচার করেছেন, তখন তাতে আর কোনও ভুল থাকতে নেই।

সুধর্মও নতমস্তকে দণ্ড গ্রহণ করলে। মহারাজ নিজে বিচার করেছেন, সুতরাং তারই অন্যায়। সে-ই অপরাধী, তাতে আর কোনও ভুল নেই। সে অন্যায় করেছে, সে অপরাধ করেছে। সে হাসিমুখে দণ্ড নিতে প্রস্তুত!

কিন্তু মহারাজ মনুর মনে শান্তি নেই। দণ্ড দেবার পরমুহূর্ত থেকেই তিনি যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। তাঁর মাথায় চিন্তার পাহাড় নেমে এল। তিনি খেতে পারেন না, তিনি ঘুমোতে পারেন না। তিনি কারো সঙ্গে দেখা করাও বন্ধ করলেন। আত্মচিন্তাতেই কাটতে লাগলো তাঁর দিন আর রাত। তিনি কি নিরপরাধকে শাস্তি দিলেন? তিনি কি নির্ভুল বিচার করলেন? তিনি কি বিবেকের অনুশাসন অনুযায়ী বিচার করলেন? কোন্‌টা ঠিক আর কোন্‌টা বেঠিক, কে তাঁকে বলে দেবে? তাঁর এতদিনের জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেচনা-বিচার সমস্তই কি নিখুঁত? তিনিও কি লোকের মতামত শুনে কর্তব্য নির্ধারণ করেন? তিনিও কি নিষ্পাপ? তাঁর বিচারে কি কোনও খাদ নেই? কোনও ভেজাল নেই? তিনি কি জনসাধারণের প্রীতি-ভালবাসার জন্যে এই বিচার করলেন? তিনি কি জনপ্রিয়তাই চান? না চান যে সত্য যত অপ্রিয়ই হোক, তার জয় একদিন হবেই? জনপ্রিয়তা বড়, না সত্য বড়?

ভেবে-ভেবে কিছুই সমাধান করতে পারেন না। আবার ভাবেন। পণ্ডিতদের পুঁথি এনে পড়েন। তাতেও কিছু সুরাহা হয় না। আরো ভাবনা বাড়ে। যত ভাবেন ততই মাথা ভার হয়ে যায়। কোন সিদ্ধান্তেই আসতে পারেন না তিনি। শেষে একদিন তিনি ঘোষণা করলেন—তিনি সিংহাসন ত্যাগ করবেন।

প্রজারা এসে করজোড়ে সামনে দাঁড়াল। বললে—কেন মহারাজ?

মহারাজ মনু বললেন—আমি তোমাদের মহ রাজা হবার অযোগ্য। এখনও আমার ন্যায়-অন্যায়, সৎ-অসৎ জ্ঞান হয়নি। নিজের ওপরে এখনও আমার সন্দেহ আছে। এখনও আমি ধ্রুব সত্যের দেখা পাইনি। আমি এখনও খুঁজছি—আমি আরো চিন্তা করবো, আমি আরো তপস্যা করবো—

আর তারপর মহারাজ মনু সংসার ত্যাগ করে বনে চলে গেলেন। বনে গিয়ে তপস্যা করতে লাগলেন। বনে গিয়েই তিনি লিখলেন—'মনু সংহিতা'। 'মনু-সংহিতা' সেই মহারাজ মনুর আমরণ তপস্যার ফল।

———

ছোটবেলাটা দেখেই হয়ত বোঝা যায় বড় হয়ে কে কী হবে। যে ছেলে লেখাপড়ায় অমনোযোগী, বড় হয়ে সে যে কিছুই হতে পারবে না এ ভবিষ্যদ্বাণী করতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না। আমাদের ছোটবেলায় একটা শ্লোক প্রায়ই শুনতামঃ 'লেখা-পড়া করে যে, গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সে।'

কথাটা যে কত বড় মিথ্যে, তা বহু মহাপুরুষের জীবনে বহুবার প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। 'ক্লাইভ' নামক লোক যাকে আমরা চিনি, লর্ড ক্লাইভ বললে যাকে পৃথিবীসুদ্ধ লোক এক ডাকে চিনে ফেলে, তাঁর আসল পরিচয়টা আজও পর্যন্ত অজানা রয়ে গিয়েছে। সেটাই আজ তোমাদের বলি।

* * *

বিলেত দেশটা ঠাণ্ডার। সে শীতের ঠাণ্ডা এখানকার ঠাণ্ডা নয়। সেই শীতের দেশের ঠাণ্ডা কনকনানির মধ্যেই একদিন একটা শিশুর জন্ম হয়েছিল। বড় গরীব সংসারের সেই সন্তান। শুধু গরীব নয়, সে পরিবারের যিনি কর্তা, তিনি দুর্দান্ত মদ্যপ। মানে মাতাল।

ছোটবেলায় শিশু কিছু বুঝতো না, কোথায় সে জন্মেছে। তার কাছে ধনী-নির্ধনী, উচ্চ-নীচ সবই সমান তখন। কিন্তু আস্তে-আস্তে যতই জ্ঞান হতে লাগলো, যতই বুঝতে শিখলো, ততই দেখলে যে বাবার স্নেহ-ভালবাসা তার কপালে নেই।

ভদ্রলোক বাইরে থেকে প্রচুর মদ খেয়ে এসে বাড়িতে চীৎকার করেন। পাড়ার লোকজনও ছুটে আসে সে, চীৎকারে। তারপর কোনও রকমে আবার সব মিটমাট হয়ে যায়। আবার সংসার যেমন চলছিল, তেমনি চলতে থাকে।

ছোটবেলার একটা সুবিধে আছে। সে সুবিধেটা হলো এই যে তখনকার কথা মানুষ বড় হবার পর সমস্তই ভুলে যায়।

তখন মাত্র তিন বছর বয়েস ক্লাইভের। সেই সময়ে একদিন তার বাবার ওপর রাগ করে তার মা তাকে নিয়ে তার মাসীর বাড়িতে চলে গেল। মাতাল স্বামীর সঙ্গে আর কতদিন একসঙ্গে থাকা যায়!

মাত্র তিন বছর বয়েস। মানুষের স্মৃতিশক্তির পরিধি অত পেছনে পৌঁছতে পারে না। কিন্তু খুব ক্ষীণ ভাবে মনে পড়তো মা যেন মাঝে-মাঝে কাঁদতো। ছোট শিশুটি মায়ের জল-ভরা চোখের দিকে চেয়ে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতো। হাসতে গিয়ে গম্ভীর হয়ে যেত। পরবর্তী জীবনে যাকে চিরকাল ভাগ্যের সঙ্গে অবিরল সংগ্রাম করতে হবে তারই হয়ত সূত্রপাত হয়ে গেল, সেই মায়ের কোলে থাকবার সময়েই।

কিন্তু ওই তিন বছর পর্যন্তই। তার পরেই তাকে পাঠানো হলো একটা স্কুলের বোর্ডিং-বাড়িতে। বাপের সঙ্গে আগেই বিচ্ছিন্ন হতে হয়েছিল। এবার হলো মায়ের সঙ্গে বিচ্ছেদ।

ভাগ্যদেবতার এ-বিধান হয়ত অনিবার্য। কিন্তু ক্লাইভের পক্ষে এ নির্বাসন ভালোই হয়েছিল। রাস্তার ফুটপাথে যে-ছেলে জন্মায়, তার কী এই পৃথিবীর ওপর অধিকার থাকে না? সেও তো এই পৃথিবীরই অধিবাসী। তার জন্যে আছে অবারিত আকাশ, সূর্যের তাপ, বৃষ্টির জল আর অফুরন্ত হাওয়া। তাকে তার জন্যে কোনও ট্যাক্স দিতে হয় না। সে আপন গরজেই মানুষের সমাজের একজন হয়ে বেড়ে ওঠে। ক্লাইভও তেমনি আপন গরজেই বেড়ে উঠতে লাগল।

এ সংসারে বড় হতে গেলে অনেক মূল্য দিতে হয়। কিন্তু সাধারণ হতে চাওয়ার অনেক সুবিধে। একটু আপোষ করতে জানলেই কোনও না কোনও জায়গায় একটা স্থান-সংকুলান হয়ে যায়ই।

স্কুলে এসেই ক্লাইভ প্রথম অনুভব করতে পারলে যে, পৃথিবীটা কত নিষ্ঠুর জায়গা! অন্য ছেলেদের বেলায় তাদের বাবারা আসে মায়েরা আসে। কত খাবার, কত স্নেহ তাদের জন্যে স্কুলের বাইরে জমা হয়ে থাকে। কিন্তু ক্লাইভের জন্যে কোথাও কেউ নেই। সে একলা। মা আছে তার, কিন্তু তা থাকা না-থাকা সমান। মা থেকেও যেন তার মা নেই।

মা নিজেরই অন্ন-সংস্থানের জন্যে পরের গলগ্রহ, ছেলের জন্যে কতটুকু দাক্ষিণ্য বাঁচাবে! সুতরাং ঈশ্বরের করুণা আর স্নেহকে মূলধন করে বড় হয়ে ওঠা ছাড়া আর কোনও উপায় রইল না। তখন থেকেই ঠিক করলে ক্লাইভ যে, যেমন করে হোক, তাকে এই অকরুণ পৃথিবীতে বেঁচে থাকতেই হবে। অকরুণ পৃথিবীটাকে নিজের বশে আনতে হবে।

যে-ছেলের লেখাপড়া হয় না, সে গোল্লায় যায় বলেই সাধারণ লোকের ধারণা। তখনকার দিনে সাধারণতঃ সেইসব ছেলেদেরই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চাকরিতে ভারতবর্ষে পাঠিয়ে দেওয়া হতো।

তেমনি একদিন রবার্ট ক্লাইভও চাকরি নিয়ে এল ভারতবর্ষে।

নামে 'রাইটার'। তার মানে হলো কেরানী। তখনকার দিনে কেরানীদের বলা হতো 'রাইটার', মাইনে মাসে আট টাকা। আট টাকা মাইনের কেরানী হওয়া ছাড়া আর কোনও যোগ্যতাই ছিল না তার। অন্ততঃ তার বাবা-মা, তার বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-পড়শীরা তাই-ই ভাবতো। বিশেষ করে তার চাকরি-স্থলের সবাই-ই জানতো যে, ও একটা অপদার্থ ছেলে!

আর আশ্চর্যের ব্যাপার, পৃথিবীর ইতিহাসে এমনি কত অপদার্থ যে তাদের কীর্তিকলাপ দিয়ে স্থায়ী-স্বাক্ষর রেখে গেছে, তার উদাহরণ ইতিহাসের পাতাতেই অজস্র ছড়িয়ে আছে। জীবনের সার্থকতা আর ব্যর্থতা সম্বন্ধে কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে? কার এত দূরদৃষ্টি?

প্রথমে চাকরি-স্থল হলো মাদ্রাজ।

একেবারে অন্য দেশ, অন্য আবহাওয়া। হঠাৎ চেনা-জগতের আবহাওয়া থেকে সাত-সমুদ্র তের-নদী পেরিয়ে কত দূর এক বিদেশ-যাত্রা। জাহাজেও মন খারাপ হয়ে যেত ছেলেটির। সবাই বলেছে, তার কিছু হবে না। সবাই বলেছে, তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। সবাই বলেছে, সে কোনও কাজের নয়।

অফিসে বসে সে কাজ করে। কিন্তু কাজের চেয়ে সে ভাবে বেশী। কোথায় ইংলণ্ডের কোন্ এক গ্রামের একটা বাড়িতে তার জন্ম, আর কোথায় কত দূরে ইণ্ডিয়ার এক প্রান্তে তার কর্মস্থল। মা নেই, বাবা থেকেও নেই। সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তার এই দূরযাত্রা, এর শেষ কোথায়? তাকে দিয়ে কি কোনও কাজ হবে? পৃথিবীতে কি সে কোনও দাগ রেখে যেতে পারবে?

আশে-পাশের যে-সব ছেলেরা তার সঙ্গে কাজ করে, সবাই তার নিজের জাতের লোক। তারা রবার্টকে ভাবে বোকা এবং অপদার্থ। আর ভাবে এ কোনও কাজের ছেলে নয়।

ভাবুক! রবার্ট ভাবে, যার যা খুশী, তাই তাকে ভাবুক। তবু তাকে কিছু করতেই হবে। তাকে কিছু কাজ করে দেখাতে হবে, সে বোকা নয়। সে সব বোঝে। সে অপদার্থ নয়। সে তাদের দেশের গৌরব।

কিন্তু তবু কিছু সুরাহা হয় না।

এক-একদিন সাঙ্গ-পাঙ্গদের সঙ্গে মারামারি হয়।

মারামারি মানে মারাত্মক মারামারি। মেরে সে সকলকে ঘায়েল করে দেয়। অভিযোগ ওঠে ওপরওয়ালার কাছে। রবার্ট তাদের সকলকে মেরেছে। কর্তা একদিন ডেকে পাঠান। বলেন—তুমি মারামারি করেছ?

রবার্ট বলে—হ্যাঁ—

—কেন?

রবার্ট বলে—ওরা আমায় ঘেন্না করে।

—কে বলেছে ওরা তোমায় ঘেন্না করে?

রবার্ট বলে—হ্যাঁ, আমি জানি। ওরা মনে করে আমি অপদার্থ। ওরা মনে করে আমি কোনও কাজের নই। কিন্তু আমি দেখিয়ে দিতে চাই যে ওদের চেয়ে কোনও অংশে কম নই। আমিও ওদের মত মানুষ, ওদের মত আমারও রাগ-ঘৃণা ভালবাসা আছে, ওদের মত মারলে আমারও ব্যথা লাগে।

কর্তা বললেন—যাও—

বললেন বটে 'যাও', কিন্তু অভিযোগ পাঠিয়ে দিলেন আরো ওপর ওয়ালার কাছে। ওপরওয়ালারা আরো ওপরওয়ালাদের কাছে জানিয়ে দিলেন যে রবার্ট ক্লাইভ রাইটার কাজের দিক থেকে খুবই অযোগ্য ব্যক্তি। শুধু অযোগ্য নয়, অভদ্রও বটে।

কিন্তু তাতে রবার্ট ক্লাইভের কিছু এসে গেল না। সে তেমনিই নিঃসঙ্গ অবস্থায় দিন কাটাতে লাগলো।

শেষে জীবনের ওপর একদিন তার ঘৃণা হলো। যে জীবন ব্যর্থ সে জীবন রেখে কী লাভ? একদিন ঠিক করলে সে আত্মহত্যা করবে।

ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে দিয়ে একদিন সে পিস্তলটা নিয়ে

নিজের বুকের দিকে তাগ্ করলে। তারপর আস্তে-আস্তে ট্রিগারটা টিপলে।

কিন্তু গুলি বেরোল না। অবাক কাণ্ড!

আবার তাগ্ করলে নিজের বুকের দিকে। আবার ট্রিগার টিপলে।

কিন্তু সেবারও গুলি বেরোল না। তখন ক্লাইভের কেমন যেন সন্দেহ হলো। পিস্তলটা ভালো করে পরীক্ষা করলে। কিন্তু না, কোথাও কোনও খুঁত নেই। গুলি ভরাই রয়েছে।

তখন পরীক্ষা করবার জন্যে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাগ্ করে ট্রিগার টিপলে। প্রচণ্ড শব্দ করে গুলি তীব্র বেগে ছুটে বেরোল।

রবার্ট ক্লাইভ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল।

এটা কী হলো? এও তো এক দৈব-ঘটনা? রবার্টের মনে হলো ঈশ্বরের বোধহয় ইচ্ছে নয় সে আত্মহত্যা করুক। ঈশ্বরের হয়ত অভিপ্রায় যে, তাকে দিয়ে কিছু মহৎ কাজ তিনি করাবেন। তাহ'লে তাই হোক, সে বেঁচে থাকবে। সে বেঁচে থেকে একটা মহৎ কাজ করে তার স্বদেশবাসীকে দেখিয়ে দেবে যে সে মহৎ!

ঘরের দরজা খুলে সে বাইরের উদার আকাশের তলায় বেরিয়ে এল।

তখন থেকে তার জীবনের মোড় ঘুরে গেল। যে মানসিক অশান্তিতে রবার্ট ভুগছিল, তা থেকে সে খানিক মুক্তি পেল।

এর পরেই একটা অদ্ভুত সুযোগ এসে গেল তার জীবনে।

মাদ্রাজের লাটসাহেব মিস্টার মার্শের একটা বিরাট লাইব্রেরী ছিল। তিনি একদিন নিজের লাইব্রেরীটা রবার্টকে ব্যবহার করতে দিলেন। সে এক নতুন জগৎ। লাইব্রেরীর বিভিন্ন লেখকের বই পড়তে-পড়তে রবার্টের মনে হলো জীবনে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। হতাশাই পাপ। অতীতে যাঁরাই বিখ্যাত হয়েছেন, স্বনামধন্য হয়েছেন, তাঁদের সকলকেই বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে আজন্ম সংগ্রাম করতে হয়েছে। সংগ্রামই জীবন। যে জীবনে সংগ্রামশীলতা নেই সে বড় সাধারণ। সংগ্রামে কেউ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, আবার সংগ্রামই কাউকে প্রতিষ্ঠার উত্তুঙ্গ শিখরে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। শত্রু-সৃষ্টি শক্তিরই লক্ষণ। যার শত্রু নেই, সে দুর্বল অক্ষম। রবার্টের যে শত্রু আছে, তার কারণ সে বলবান। বলবানেরই শত্রু থাকে, দুর্বলের কে শত্রুতা করবে?

তারপর রবার্টের দৃষ্টিতে পৃথিবীটা অন্য রকম চেহারা নিলে। সেই মাদ্রাজেই এমন অনেক বন্ধুর সাক্ষাৎ পেলে যাদের প্রকৃতির সঙ্গে তার প্রকৃতির মিল আছে। তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে, তাদের সঙ্গে মিশে দেখলে তারাও সবাই সংগ্রামী। সংগ্রাম করতে-করতেই তারা এত দূর এগিয়েছে। সংগ্রাম করতে-করতেই তারা আরো এগোবে।

মনটা অনেকটা শান্ত হয়ে এল তার। নতুন উদ্যম নিয়ে সামনের দিকে সে এগিয়ে যেতে লাগলো। বুঝতে পারলো, এতদিন যে-পথে সে চলে এসেছে সেটা ভুল পথ। এবার তাকে তার সব ভুলের সংশোধন করতে হবে। কিন্তু কিসে কেমন করে তা সম্ভব তা তখন তার মাথায় এলো না।

কিন্তু যে সত্যিকারের উদ্যমী, সুযোগের তার কখনও অভাব হয় না। সুযোগ অনেকটা সৌভাগ্যের মত। তাকে চিনতে পারা চাই, তাকে গ্রহণ করতে পারা চাই।

রবার্ট ক্লাইভ ঠিক এই সময়ে এমনি সুযোগেরই প্রতীক্ষা করছিল। ফ্রান্স আর ব্রিটেনের মধ্যে তখন প্রচণ্ড যুদ্ধ বেঁধে গেছে ইউরোপে। ভারতবর্ষেও তার ঢেউ এসে পৌঁছেছে।

মাদ্রাজের সেই জনপদের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হতে শুরু করলো। সে-বিবাদ ক্রমে পরিণত হলো যুদ্ধে।

আবার সঙ্গে-সঙ্গে রবার্ট ক্লাইভেরও ভাগ্যোদয় হয়ে গেল। ফরাসী আর ব্রিটিশদের মধ্যে সেই যুদ্ধে রবার্ট ক্লাইভের বীরত্ব দেখে সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেল। সামান্য একটা হাবাগোবা গোঁয়ারগোবিন্দ ছেলের যে এত সাহস তা আগে কে জানতে পেরেছিল? সেদিনকার সেই রক্তক্ষয়ী লড়াইতে সবাই অবাক্ হয়ে গেল তাদের রাইটার রবার্ট ক্লাইভের নিয়মানুবর্তিতা, নিষ্ঠা, সংযম আর সকলের ওপর সূক্ষ্ম বিচার-বোধ দেখে। এ ক্ষমতা সকলের থাকে না। মানুষ স্বভাবগত কতকগুলো গুণের জন্যেই বড় হয়। বড় কেউ কাউকে করতে পারে না। বড় হতে হয়। কাউকে ঠেলে উপরে উঠিয়ে দিলে সে আবার পড়ে যেতে পারে। কিন্তু যে নিজের শক্তিতে ওঠে, তার ভিৎ পাকা। তাকে নীচেয় নামানো বড় শক্ত। রবার্ট ক্লাইভের তাই ছিল।

তাই সেদিনকার সেই ফরাসী-ব্রিটিশের যুদ্ধে এ-কথা সবাই এক বাক্যে স্বীকার করতে বাধ্য হলো যে সেন্ট্ ফোর্ট ডেভিড নামে যে-কেল্লা ছিল, তার

উদ্ধারকর্তা হওয়ার গৌরব যদি কারোর প্রাপ্য হয় তো সে রবার্ট ক্লাইভ।

সেন্ট্ ফোর্ট ডেভিডের জয়ের সংবাদ গিয়ে পৌঁছুলো ইংলণ্ডে।

পৌঁছলো খবরটা মাতাল বাপের কাছেও। বাপও অবাক! বাপ কোনও দিন ছেলের ভালো-মন্দ নিয়ে মাথা ঘামায়নি। ছেলে তার মানুষ হলো, না বাঁদর হলো, তা ভেবে কখনও মাথা খারাপ করেনি।

খবরটা পেয়ে বাপ বললে—আরে, রবার্টটা এত বড় বীর হয়েছে—

এমনি হয় সংসারে। মানুষ যখন বড় হয়, তখন তার বড় হওয়ার কীর্তিটাই লোকের চোখে পড়ে। কিন্তু তার পেছনের কৃচ্ছ্রসাধনের কঠোর ইতিহাসের খবর ক'জন রাখে, আর ক'জনই বা তা দেখতে পায়!

এই সময়টাই বড় সুখে কেটেছিল রবার্ট ক্লাইভের। এই ক'টা দিন। চারিদিকে খাতির, চারদিকে সম্মান, পদোন্নতি, দেশের লোকের প্রশংসা। রবার্ট ক্লাইভের সেই সময়েই প্রথম মনে হয়েছিল যে তার জীবন সার্থক।

কিন্তু তখনও ক্লাইভের বয়েস তো কম তাই বুঝতে পারেনি যে, জীবন অত সহজ নয়। সাফল্য সাময়িক। সাফল্যের সার্থকতা মানুষকে শুধু আরো বড় সংগ্রামের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। সাফল্য মানুষকে সুখী করে না, আরো দুর্গম পথের যাত্রী করে, বৃহত্তর সাফল্যের সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রলুব্ধ করে।

ক্লাইভের জীবনেও তাই হলো।

তখন ক্লাইভের বিয়ে হয়ে গেছে। মাদ্রাজে থাকতেই একটি স্বজাতীয়া একটি মেয়ের সঙ্গে তার বিবাহ সমাধা হয়ে গেছে। অর্থ হয়েছে, সম্মান হয়েছে, স্ত্রী হয়েছে! আর কী চাই!

যুদ্ধ থেমে যাবার পর স্ত্রীকে নিয়ে ইংলণ্ডে গিয়ে পৌঁছুলো রবার্ট ক্লাইভ। সেখানে তখন প্রচুর অভিনন্দন তার জন্যে অপেক্ষা করছিল। শুধু শুকনো অভিনন্দন নয়, তার সঙ্গে পদ, পদবী, পদমর্যাদা। নানা লোকের বাড়িতে নিমন্ত্রণ। কৃতার্থ হয়ে গেল রবার্ট ক্লাইভ।

ছিল সামান্য একজন দুঃস্থ পিতার সন্তান। অখ্যাত অবজ্ঞাত। হলো সম্মানীয়, স্মরণীয়, পূজনীয় ব্যক্তি। সমাজের একজন, দেশের গৌরবস্থল!

কিন্তু বেশীদিন ভালো লাগলো না এই তথাকথিত নিষ্ক্রিয়তা। পুরুষ-সিংহ যে, সে কখনও নিষ্কর্মা হয়ে থাকতে পারে না। সে চায় কাজ। একটা

কাজ ফুরিয়ে গেলে আর একটা কাজ। আরো-আরো কাজ। যতদিন দেহে শক্তি আছে, ততদিন কাজ করার মধ্যেই সে তৃপ্তি খোঁজে।

সুযোগও এসে গেল আবার।

পুরুষ সিংহের জন্যে বোধ হয় সুযোগের অভাবও হয় না সংসারে।

বাঙলা দেশে তখন ব্রিটিশের ভাগ্যতরী টলমল করছে। বাঙলার নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা ব্রিটিশ-শক্তিকে কলকাতা থেকে হটিয়ে দিয়ে একেবারে ফলতার পাঠিয়ে দিয়ে কোণঠাসা করেছে। যাতে আর তারা কলকাতায় ঢুকতে না পারে, তার ব্যবস্থাও করেছে।

ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে কথাটা উঠলো।

এ অপমান অসহ্য। এর একটা প্রতিকার করা অপরিহার্য। এ অপমানের প্রতিশোধ নিতে হবে। কিন্তু কে এর প্রতিকার করবে? তেমন সাহস, তেমন নিষ্ঠা, তেমন তেজস্বীতা কার আছে? ক'জনের আছে?

সকলেরই মনে পড়লো কর্ণেল ক্লাইভের কথা।

ক্লাইভকে সাদরে ডাকা হলো। জিজ্ঞেস করা হলো—আপনি আর একবার ভারতবর্ষে যেতে পারবেন?

—কেন?

—আমাদের ইংরেজ জাতির সম্মানহানি করেছে বাঙলার নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা। আপনি পারবেন ইংরেজের লুপ্ত-গৌরব ফিরিয়ে আনতে? আপনার ওপর সমস্ত ইংরেজ-জাতের ভাগ্য নির্ভর করছে। যাবেন আপনি সেখানে?

রবার্ট ক্লাইভ এই সুযোগের জন্যেই যেন এতদিন প্রতীক্ষা করছিল। বীরের রক্ত বীরত্ব দেখাবার সুযোগ পেয়ে গরম হয়ে উঠলো।

বললে—আমি রাজি—

এ সেই ১৭৫৭ সালের বাঙলা দেশ। জলা-জমি আর মশা-মাছির জন্মভূমি। ঠাণ্ডা-শীতের দেশের লোক আবার এসে পৌঁছুলো এ-দেশে। আবার সংগ্রাম শুরু হলো। এবার আরও কঠিন সংগ্রাম। এখানেও ছিল ফরাসী শক্তি।

ফরাসীরা তখন চন্দননগরের মত অঞ্চলে বেশ কেল্লা বানিয়ে পাকাপোক্ত হয়ে বসেছে। তাছাড়া বাঙলার নবাবের সঙ্গে তাদের বেশ ভাবও জমে গেছে। ব্যবসা-বাণিজ্য সুত্রে তারা পরস্পার পরস্পরের বন্ধু।

আর ইংরেজদের অবস্থা তখন শোচনীয়। তাদের এখানে না আছে চাল,

না আছে চুলো। থাকার মধ্যে একটা কেল্লা বানিয়েছিল কলকাতায়, তাও ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে নবাব। বলতে গেলে তখন তাদের একেবারে নিরাশ্রয় অবস্থা। ফলতার কাছে একটা জাহাজের ওপর সবাই মিলে বাস করছে। কোথাও কারো কাছে খাবার-দাবার কিনতে পায় না। ইংরেজদের কাছে কিছু বিক্রি করা নবাব আইন করে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে।

এ হেন অবস্থায় ক্লাইভের ওপর দায়িত্ব পড়লো আবার কলকাতার ইংরেজদের সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

এখানেই ক্লাইভ তার বুদ্ধিমত্তা আর বিচক্ষণতার চরম পরিচয় দিলেন।

এখান থেকেই সূত্রপাত হলো ব্রিটিশ-শক্তির ভাবী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা! যে সাম্রাজ্যে কোনও দিন সূর্য অস্ত যেত না।

যেমন করে সেদিন সেই এককালের অখ্যাত অবজ্ঞাত ছেলেটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার বুনিয়াদ পাকা পোক্ত করে দিল সে এক দীর্ঘ কাহিনী। কী দুর্ধর্ষ সাহস, কী অপরিমেয় ধৈর্য, কী রহস্যজনক কূটকৌশল বিস্তার, কী কঠোর নিয়মানুবর্তিতার স্বাক্ষর তিনি রেখে গেছেন, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে।

সেই যুগে জালিয়াত জুয়াচোর প্রভৃতি আখ্যা দিয়ে এদেশে ওদেশে অনেকেই ক্লাইভকে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন। তার অধিকাংশই সত্য। কিন্তু যুদ্ধে বা কূটনীতিতে আজো এ সব তো অবলীলায় চলে আসছে। যুদ্ধের মত ব্যাপারে আবার সততা কী বস্তু?

পলাশীর যুদ্ধই ক্লাইভের জীবনের এক অক্ষয় কীর্তি। ভারতবর্ষের পক্ষে অবশ্য সে এক কলঙ্কময় ইতিহাস। নবাবের অতি বিশ্বস্ত সেনাপতিদেরই সেই বিশ্বাসঘাতকতার সুযোগ তিনি গ্রহণ করেছিলেন, এই তাঁর অপরাধ।

পৃথিবীর সামনে যে একদিন মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিল, যে তার সমস্ত অপমানের প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল সকলকে পরাস্ত করে, তার জয় অনিবার্য, এ-কথা আর কেউ না-জানুক তার ভাগ্যলক্ষ্মী তো জানতেন।

নবাব সেই যুদ্ধে পরাজিত হলেন। সেই ন'ঘণ্টার যুদ্ধ।

আর ক্লাইভ হলেন বিজয়ী। বত্রিশ বছর বয়সের একজন ছেলের কাছে সাতাশ বছর বয়সের একজন নবাব পরাজিত হলেন।

ভারতবর্ষে বেলাতেই সন্ধ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে এল।

ভারতবর্ষের দিনের পরাধীনতার সেই-ই হলো সূত্রপাত।

কিন্তু যারা সে-কাহিনী পড়বে তারা জানতে পারবে সেদিন তা শুধু সম্ভব হয়েছিল ক্লাইভের কূটবুদ্ধির কৌশলেই। মাত্র ন'ঘণ্টার তো যুদ্ধ। কিন্তু সে কেবল যুদ্ধের অভিনয় মাত্র। যুদ্ধের বদলে সে যে অভিনয়ের পর্যায়ে পর্যবসিত হয়েছিল তার পেছনে ছিল কর্নেল রবার্ট ক্লাইভের কূট-কৌশল।

সে-যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত ক্লাইভের তরফ থেকে যে-অন্যায়ের আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল, তা আইনসঙ্গত কি বে-আইনী তা আজ বিচার করে লাভ নেই। কারণ যুদ্ধের মতন ব্যাপারে কখনও ন্যায় রক্ষিত হয়েছে, এমন উদাহরণ কেউ খুঁজে দেখাতে পারবে না।

বাঙলা দেশ অধিকার করে রবার্ট ক্লাইভ সেদিন ভারতবর্ষে ব্রিটিশের লুপ্ত গৌরব সত্যিই পুনরুদ্ধার করলেন। ইংলণ্ডে ধন্য-ধন্য পড়ে গেল। ভারতবর্ষে ব্রিটিশের সাম্রাজ্য বিস্তার হতে দেরী হলো না। সেদিন তিনি যে জয়ের সূত্রপাত করেছিলেন, তা অব্যাহত গতিতে চললো—অনাগত দুই শতাব্দী ধরে। ক্লাইভ ভাবলেন এবার তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ হলো।

কিন্তু তিনি জানতেন না যে সংগ্রামীর সংগ্রামের শেষ নেই। মানুষের সংগ্রাম শেষ হয় একমাত্র মৃত্যুতেই।

তাই বড় আশা নিয়েই তিনি দেশে ফিরলেন। একদিন আট টাকা মাইনের কেরানীর চাকরি নিয়ে দেশ থেকে বেরিয়েছিলেন, কিন্তু যখন আবার সেখানে পৌঁছলেন তখন ইংলণ্ডের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী লোক তিনি। নবাবের প্রচুর টাকা তিনি হস্তগত করে ধনী হয়ে গেছেন তখন।

কিছু লোকের এটা আর সহ্য হলো না। তাঁর বিরুদ্ধে পার্লামেণ্টে অভিযোগ হলো তিনি অন্যায়ভাবে বাঙলার নবাবের অর্থ আত্মসাৎ করেছেন। কোম্পানির হয়ে কাজ করতে গিয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি করেছেন।

বিস্মিত হয়ে গেলেন ক্লাইভ। রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে আবার তাঁর পুরনো স্বভাব ফিরে এল। যাদের জন্যে তিনি নিজের প্রাণ বিপন্ন করে এত করেছেন তারাই তাঁকে চোর অপবাদ দিচ্ছে! তিনি যদি চাইতেন তো আরো অর্থ চুরি করতে পারতেন, আরো অনেক কোটি টাকার মালিক হতে পারতেন।

কিন্তু না, তাঁর যুক্তি কেউ শুনলো না। সাব্যস্ত হলো, তিনি জালিয়াত,

তিনি জুয়াচোর। চারদিকে রটে গেল যে যে ক্লাইভ জালিয়াত। তিনি শেষকালে হার মানলেন। বললেন—তোমরা আমার সমস্ত সম্পত্তি কেড়ে নাও, কিন্তু তার বদলে আমায় আমার সম্মানটুকু শুধু দয়া করে ফিরিয়ে দাও—

যে-সম্মান ভালবাসা প্রীতির জন্যে তিনি সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন, শেষ জীবনে এসে সেই সম্মানটুকুই তাঁকে দিতে তারা অস্বীকার করলে। তাঁর স্বদেশবাসীর জন্যে তিনি দিলেন সাম্রাজ্য, আর তারা তাঁকে দিলে অখ্যাতি।

এরই নাম জীবন! তখন তাঁর বয়েস পঞ্চাশে পৌঁছেছে। সারা জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম আর অমানুষিক সংগ্রামের পর তিনি অবসন্ন। সমস্ত জীবনটা পরিক্রমা করে তিনি দেখতে পেলেন সেখানে কোথাও শান্তির একটু স্নেহচ্ছায়া নেই, নেই কোনও বিশ্রামের সুখাশ্রয়। জীবনের শেষের দিকেই মানুষের একটু বিশ্রামের দরকার হয়। তখন দেহ হয় অপটু, মন চায় একটু নির্ভরতা। তাঁর দেশবাসী তাও তাঁকে দিলে না। তিনি ভেঙে পড়লেন। স্বাস্থ্য আগে থেকেই ভাঙতে আরম্ভ করেছিল, এবার তা আরো ভাঙলো। সে-বয়েসে স্বাস্থ্য-উদ্ধারের আর আশা নেই। বিশেষ করে যখন সমস্ত কিছুই তাঁর প্রতিকূল। তারপর এল সেই অবধারিত দিন। ২২ শে নভেম্বর ১৭৭৪ সাল।

জন্মেছিলেন ২০ শে সেপ্টেম্বর ১৭২৫ সালে। পঞ্চাশ বছর হলো। পঞ্চাশ বছর বয়েসেই তিনি অতুল কীর্তি আর অপরিমেয় কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে শেষ বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হলেন।

পরিবারের সকলকে নিয়ে তিনি সেদিন তাস খেলতে বসেছিলেন। দানের পর দান চলছিল। কেউ কোনও আভাসই পায়নি কত বড় দুর্যোগ সেই মূহুর্তে তাদের জন্যে অপেক্ষা করে আছে।

একটা তাস আসতেই তিনি সেটা চিৎ করে দেখলেন।

সেটা কী রংয়ের তাস তা কেউ জানে না। সেখানা দেখেই কিনা কে জানে তিনি হঠাৎ খেলা ছেড়ে উঠলেন। উঠে পাশের ঘরে গেলেন গিয়ে দরজায় খিল বন্ধ করে দিলেন। আর তারপরেই দুম্-দুম্ করে পিস্তলের শব্দ হলো। দরজা ভেঙে ভেতরে গিয়ে সবাই দেখলে তাঁর সারা শরীর রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের দুর্ধর্ষ শক্তিমান প্রতিষ্ঠাতা তার আগেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছেন। নিজের দেশকে তিনি যাবার আগে দিয়ে গেলেন আ-দিগন্ত সাম্রাজ্য আর সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন এক দুরপনেয় কলঙ্ক। সেইজন্যেই লর্ড রবার্ট ক্লাইভ সারা পৃথিবীর ঐতিহাসিকদের কাছে আজও এক জিজ্ঞাসার চিহ্ন হয়ে আছেন।

আমার চাকরি থাকবে না—

সমীর এসে ঘরের জানালা-দরজা বন্ধ করে দিয়ে তারপর কোঁচড় থেকে বার করতো তেলেভাজাগুলো। আমরা নিঃশব্দে সেগুলো খেয়ে মুখ মুছে ফেলতাম।

কিন্তু এক-একদিন সমীরের বাবা কী করে যেন টের পেয়ে যেতেন। ঠাকুর দৌড়ে এসে সাবধান করে দিত—দাদাবাবু-দাদাবাবু, বড়বাবু টের পেয়ে গিয়েছে, এদিকে আসছে, লুকিয়ে ফেল, লুকিয়ে ফেল শিগ্‌গির—

কিন্তু আমরা তার আগেই সব তেলেভাজা খেয়ে সাবার করে দিয়েছি। আমরা তিন-চারজন সমীরের বন্ধু তখন নিরীহ ভালো মানুষের মত মুখ-হাত মুছে ক্লাসের পড়ার বই নিয়ে পড়তে বসে গিয়েছি। সমীরের বাবা খড়ম পায়ে দিয়ে খটখট করে ঘরের সামনে এসে দাঁড়াতেন। বুড়ো মানুষ। একটা আট-হাতি ধুতি পরনে। খালি গা। বুকে কাঁচা-পাকা চুল। মাথায় টাক। ঘরেয় দরজার সামনে এসে বলতেন—কী হচ্ছে সব? কী খাচ্ছো?

সমীর বলতো—খাবো আবার কী? আমরা তো কিছুই খাচ্ছি না। আমরা তো বই নিয়ে লেখাপড়া করছি—

সমীরের বাবা বলতেন—বেশ-বেশ-বেশ, মন দিয়ে লেখাপড়া করো, লেখাপড়া না করলে শেযকালে তোমরাই পস্তাবে বাবা, তোমরাই উপোস করে, মরবে, তখন কেউ তোমাদের দেখতে আসবে না—

তারপর আমাদের দিকে চেয়ে এক-এক করে জিজ্ঞেস করতেন—তুমি কোন্ বাড়িতে থাকো? তুমি? তুমি? তুমি?

প্রত্যেকের নাম-ধাম জিজ্ঞেস করতেন। কার বাবা কী করে, কার কোথায় দেশ, কার কী রকম অবস্থা, ক্লাসে কে কী রকম রেজাল্ট করে, সব খবর নিতেন খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে। তারপর যখন নিশ্চিন্ত হতেন যে, সবাই ভদ্রঘেরের সন্তান, সবাই মন দিয়ে লেখাপড়া করে, তখন আস্তে-আস্তে ঘর থেকে চলে যেতেন।

কিন্তু একটা ব্যাপারে ছিলেন বড় কড়া। টাকা-পয়সা। ওই টাকা-পয়সাই ছিল সমীরের বাবার গায়ের রক্ত। লোকে বলত—বিশ্বম্ভরবাবু টাকার কুমীর।

বিশ্বম্ভরবাবু টাকার কুমীর কিনা তা কিন্তু বিশ্বম্ভরবাবুর চেহারা, সাজ-পোশাক, বাড়ি, চাল-চলন দেখে বোঝা যেত না। ওই একটা খাটো

সেই সমীরের সঙ্গে হঠাৎ আবার এতদিন পরে দেখা হয়ে গেল। সমীর সরকার! মনে আছে সমীরের খুব দুঃখ ছিল। বলতো—জানিস, বড় হয়ে যখন আমার অনেক টাকা হবে আমি রোজ একশো লোককে খাওয়াবো—

একশো লোককে রোজ খাওয়াতে কত খরচ হবে, সে-ধারণা তখন আমাদের কারোরই ছিল না। তখন চালের দর কত, সরষের তেলের দর কত বা একটা জামা বা একজোড়া জুতো কিনতে ক'টাকা লাগে, সে-সব নিয়ে আমরা কেউ মাথাই ঘামাতাম না। শুধু এইটুকু দেখতাম সমীরের খুব খাওয়ার লোভ। সমীরের মা ছিল না, কিন্তু বাবা ছিল। পৈত্রিক ভাড়া একটা দোতলা বাড়ি। এককালে নিশ্চয়ই সমীরের অবস্থা ভালো ছিল। নইলে অত বড় বাড়ি হলো কেন ওদের। কিন্তু বাড়িটা তখন ভেঙে-ভেঙে পড়ে যাচ্ছে, সারানো হতো না। বিরাট-বিরাট অশ্বত্থ গাছ জায়গাটাকে ঘিরে থাকতো সব সময়। অত বড় বাড়িতে সমীর একলা একটা কোণের ঘরে বাস করতো।

আমরা সময় পেলেই যেতাম সমীরদের বাড়িতে। সমীরদের বাড়িতে আমাদের যেতে ভালো লাগতো। কারণ অত বড় বাড়িতে আমরা বেশ স্বচ্ছন্দে গল্প করতুম। সমীর খুব পেটুক ছিল। বলতো—তেলেভাজা খাবি?

ছেলেবেলায় আমরা তেলেভাজা খেতে পেলে আর কিছু চাইতাম না সমীর চুপিচুপি রান্নাঘরে চলে যেত। ওদের বাড়িতে রান্না করতো একজন ঠাকুর। ঠাকুরকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে জপিয়ে তেলেভাজা ভাজিয়ে নিয়ে আসতো।

ঠাকুর বলতো—খুব সাবধান দাদাবাবু, বড়বাবু দেখতে পেলে কিন্তু

নুন-ময়লা ধুতি আর এক জোড়া খড়ম। মাথায় চুলের জন্যে তেলের খরচ নেই। মাথা ন্যাড়া করে কামিয়ে ফেলতেন।

সকল থেকে তাঁর কাছে আসতো নানা ধরনের লোক। উদ্দেশ্য সকলেরই এক। টাকা ধার করা। টাকা বিশ্বম্ভরবাবু ধার দিতেন দু'হাতে। কেউ তাঁর কাছে এসে হতাশ হয়ে ফিরতো না। একশো টাকা চাইলে একশো টাকাই দিতেন না। খাতায় লেখা থাকতো একশো টাকা; কিন্তু দিতেন আসলে আশি। লোকেও তেমন গররাজি হতো না। বিপদের দিনে যা পাওয় যায়, তাই-ই লাভ। যখন সুদ দিতে হবে তখন দেখা যাবে। এখন তো বিপদ থেকে উদ্ধার পেলুম।

তা এমনি করে বিশ্বম্ভরবাবু অনেক সম্পত্তি করেছিলেন। সস্তা দরে বাড়ি কিনতেন আর মোটা ভাড়ায় তা ভাড়া দিতেন। মামলা করে পুরোন ভাড়াটেদের তুলে নতুন ভাড়াটে বসাতেন। কিন্তু অত সম্পত্তি করেও বিশ্বম্ভরবাবুর চাল-চলনের কোনও পরিবর্তন হয়নি। সেই ভাঙা-পোড়ো বাড়ির মধ্যে ছেলেকে নিয়ে বাস করতেন।

অথচ এই বাড়িই আগে মানুষ-জনে গমগম করতো। সমীরের কাকা জ্যাঠা, ভাই-বোন সবাই মিলে হই-চই করে কাটাতো। তখন সমীর সময়ই পেত না আমাদের সঙ্গে কথা বলবার। স্কুল থেকেই সোজা চলে যেত বাড়ি। সেখানে হৈ-হৈ আর হট্টগোলে কোথা দিয়ে যে সময় কেটে যেত কেউ টের পেত না। তারপরে একদিন বাড়ি ফাঁকা হয়ে গেল।

আমরা জিজ্ঞেস করতাম—কী রে, তোদের বাড়ি এত ফাঁকা কেন?

সমীর বললে—কেউ নেই যে বাড়িতে। আমি আর বাবা ছাড়া বাড়িতে আর কেউ নেই—

—কোথায় গেল সব?

সমীর বললে—বাবা মামলা করে সবাইকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

পরে শুনলাম সত্যিই তাই। অনেকদিন ধরেই ভেতরে-ভেতরে মামলা চলছিল। শরিকে-শরিকে রেষারেষি। হাঁড়িও আলাদা হয়ে গিয়েছিল। বলতে গেলে কাকা-জ্যাঠাদের সঙ্গে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বেশীদিন ওই অবস্থা চলতে পারে না। একদিন সবাই যে-যার নিজেদের আস্তানা খুঁজে নিয়ে কোথায় চলে গেল। আর কারোর সঙ্গেই সমীরের

যোগাযোগ রইল না।

সেই সময়টাই সমীরের বড় খারাপ কেটেছে। অনেক লোকজনের মধ্যে মানুষ হয়েছে সমীর, আবার তাকেই সেই ভুতুড়ে বাড়ির মধ্যে একলা-একলা কাটাতে হলো। সমীর বলতো—একলা থাকতে খুব খারাপ লাগে রে ভাই—

একলা-একলাই তখন থেকে কাটাতো সমীর। আর সময় পেলেই লুকিয়ে-লুকিয়ে আমাদের বাড়িতে ডাকতো। আমরা খিড়কি দরজা দিয়ে গিয়ে ঢুকতুম তার ঘরে। সেখানে দরজা বন্ধ করে আমাদের আড্ডা চলতো। আর ঠাকুর আমাদের জন্যে চা, সিঙাড়া, কচুরি, তেলেভাজা জুগিয়ে যেত। ঠাকুর বুঝতো সমীর ভালো করে পেট ভরে খেতে পায় না। তাই সংসারের খাবার থেকে বাঁচিয়ে সে আমাদের তা পরিবেশন করতো।

তারপর লেখাপড়ার যুগ শেষ হওয়ার পর জীবিকা উপার্জনের যুগ। আমরা জীবিকার প্রয়োজনে কে কোথায় ছিট্‌কে পড়লাম, তা নিজেরাও খবর রাখতুম না। ওই বয়েসটাই বড় বিপজ্জনক। ওই আঠারো থেকে পঁচিশ। মানুষের জীবনে যা কিছু বড় ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটে, তা সমস্ত ঘটে ওই বয়েসেই। কেউ চরিত্র হারায়, কেউ হঠাৎ বড় চাকুরি পেয়ে যায়। আবার কেউ-বা বাবা-মা'র মৃত্যুতে অনাথ হয়ে পড়ে। অর্থাৎ ভবিষ্যৎ জীবনে মানুষ যা হবে, তার সূত্রপাতটা হয় ঠিক ওই বয়েসের পরিধির মধ্যেই। এই বয়সেই হঠাৎ বিশ্বম্ভরবাবু মারা গেলেন। বিশ্বম্ভরবাবুর মারা যাবার বয়েস হয়নি, কিন্তু তবু তিনি মারা গেলেন। সব মানুষই একদিন না একদিন মারা যায়। চিরকাল বেঁচে থাকতে কেউ-ই এ সংসারে আসেনি। বিশ্বম্ভরবাবুও চিরকাল বাঁচবেন, এমন কল্পনা তিনি নিজেও করেননি।

এবং তারপরই সমীরের জীবনের বিপর্যয় শুরু হলো বলতে গেলে। অর্থাৎ ভবিষ্যৎ জীবনে সে যা হবে, তার আভাস তখনই দেখতে পাওয়া গেল।

বাবার মৃত্যুতে প্রথমটা সমীর একটু অবাকই হয়ে গিয়েছিল, কারণ এ ঘটনার জন্যে সে সত্যিই তৈরি ছিল না। শ্মশানে যখন তার বাবার দেহটা পুড়ছে, তখন সেই দিকে চেয়ে-চেয়ে তার অনেক কথা মনে পড়তে লাগল। মনে পড়তে লাগলো, বাবাকে সে আড়ালে কত নিন্দে করেছে! বন্ধু-বান্ধবের কাছে বাবাকে 'কৃপণ' বলে কত গাল-মন্দ করেছে। কিন্তু সেই শ্মশানে বাবার চিতার সামনে দাঁড়িয়ে তার প্রথম মনে হলো যে বাবাই ছিল তার সংসারে

সবচেয়ে আপনার জন। আর বন্ধু-বান্ধব ? তারা কে কোথায় আজ ? এই বিপদের দিনে তো কারোর সাহায্যই পাওয়া গেল না।

পাড়ার কয়েকজন ছেলে বিশ্বম্ভরবাবুর মৃতদেহ কাঁধে করে শ্মশানে সৎকার করতে এসেছিল। বাকী কাজটাও তারাই সব করলে। সমীরকে কিছুই করতে হলো না নিজের হাতে। সে-রাতটা অতবড় বাড়িতে সমীরের কোনও রকমে কাটলো।

কিন্তু তার পরদিন থেকেই শুরু হলো তার জীবনের দ্বিতীয় পর্ব।

অর্থাৎ অত বড় যে খালি বাড়িটা, যে-বাড়িটা খালি করবার জন্যে বিশ্বম্ভরবাবু সারা জীবন ভাইদের সঙ্গে মামলা-মকদ্দমা করলেন, তা আবার আত্মীয়-স্বজনে ভর্তি হয়ে উঠলো।

ন'কাকা সপরিবারে এসে হাজির। ট্যাক্সি থেকে নামার আগেই মড়াকান্না। হঠাৎ কেঁদে উঠলো—ওগো বড়দা, তুমি কোথায় গেলে গো ?

ন'কাকীমা এসে সমীরকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো।

বললে—তুই বাবা একবার আমাদের একটা টেলিগ্রাম করতে পারলি না ? শেষ সময়ে অন্ততঃ একবার বড়দাকে চোখের দেখাটা দেখতুম—

তারপর সান্ত্বনা দিয়ে বললে—দুঃখ করিসনে বাবা, কাঁদিসনে। চিরকাল কী কারো বাপ-মা বেঁচে থাকে। তিনি পুণ্যাত্মা লোক, তোমার সারা জীবনের খোরাক-পোশাকের ব্যবস্থা করে রেখে গেছেন। তোমার ভাবনা কী বাবা ?

মনটা খুব ঠাণ্ডা হলো সমীরের। পরের দিন সেজকাকা আর সেজ কাকীমা এলেন। তাঁরাও ওই একই কথা বললেন—তোমার কিচ্ছু ভাবনা নেই বাবা, আমরা তো আছি। বাপ-মা তো আর চিরকাল কারো থাকে না।

শুধু ন'কাকা আর সেজ কাকাই নয়, বড় কাকা, ছোট মামা, সেজ পিসীমা, মেজ মাসীমা, সবাই-ই একে-একে এসে হাজির হলেন। সবার মুখেই ওই একই কথা। সবাই-ই বলতে লাগলেন—আমি তো আছি, তোমার ভাবনা কী বাবা ?

যে-বাড়ি একদিন বিশ্বম্ভর সরকার মামলা করে খালি করে ফেলে ছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর সেই বাড়িই আবার লোকে-জনে গমগম করে উঠলো। যারা একদিন কাঁদতে-কাঁদতে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল, তারা এবার হাসতে-হাসতে আবার এ বাড়িতে এসে আসর জাঁকিয়ে বসলো। বড়দার

মতন পুণ্যাত্মা লোক গত হয়েছেন, সুতরাং খুব ঘটা করে শ্রাদ্ধ-শান্তি না করলে কী চলে ?

সমীরকে একান্তে ডেকে নিয়ে গেল সেজ কাকা। তাকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলে। বললে—একটা কথা বাবা, তোমাকে অনেকে অনেক কথা বলবে, তুমি কারোর কোনও কথা শুনো না। আমি তো এদের সকলকেই চিনি, এরা লোক কেউ ভালো নয়, যা কিছু করবে আমাকে জিজ্ঞেস করে করবে, বুঝলে ?

ন'কাকাও বিকেল বেলা ডাকলো—একটা কথা শোনো বাবা ; এদিকে এসো—

বলে নিজের ঘরের মধ্যে সমীরকে পুরে দরজা জানালা বন্ধ করে দিলে।

বললে—একটা কথা তোমাকে চুপি-চুপি বলি, শোনো বাবা, কথাটা যেন পাঁচ কান না হয়—

সমীর বললে—কী বলুন ?

ন'কাকা বললে—দেখো, তোমাকে অনেকে অনেক কথা বলবে। তুমি কারোর কোনও কথা শুনো না, বুঝলে ? এরা কিন্তু লোক কেউ ভালো নয়। এরা মুখে তোমার সঙ্গে সবাই খুব মিষ্টি কথা বলবে, কিন্তু এদের প্রত্যেকের মতলব খারাপ, এই তোমাকে বলে রাখলুম—

সমীর জিজ্ঞেস করলে—তা'হলে আমি কী করবো ?

ন'কাকা বললে—সবাই যা বলবে, তুমি ঘাড় কাৎ করে সব শুনে যাবে। 'হ্যাঁ'-'না' কিচ্ছু বলবে না। যদি তেমন বিপদে পড়ো তো আমার কাছে আসবে, আমি সৎ পরামর্শ দেব, সেই অনুযায়ী তুমি কাজ করবে। বুঝলে ?

সমীর বুঝলো। কিন্তু পরদিন থেকে বাড়িতে যতগুলো আত্মীয়-আত্মীয়া এসে জুটেছিল; সবাই সমীরকে আড়ালে ডেকে নিয়ে ওই একই কথা বললে। বললে, সে ছাড়া অন্য সবাই-ই খারাপ লোক। সকলেরই বদ মতলব, একমাত্র সে-ই সমীরকে সৎ পরামর্শ দিতে এসেছে।

তা হোক, সমীর অনেকদিন পর পুরোনো আত্মীয়-স্বজনদের নিজের কাছে পেয়ে খুব খুশী। বাপের টাকার অভাব ছিল না। সকলকে পেট ভরে খাওয়াতে লাগলো সমীর। বাড়িতে রোজ উৎসব, রোজই সমারোহ লেগে রইলো। সারা বাড়িতে ভাত-মাছের ছড়াছড়ি। শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকে যাবার নাম নেই।

সবাই সেই যে গ্যাঁট হয়ে বসে রইলো, কেউই আর চলে যেতে চায় না।

সেজ পিসীমা একদিন বললে—ওরে সমীর, আমাকে একদিন থিয়েটার দেখা না বাবা, শুনছি নাকি খুব ভালো থিয়েটার হয় আজকাল কলকাতায়—

সেজ পিসিমাকে নিয়ে গিয়ে সমীর একদিন থিয়েটার দেখিয়ে এল।

খবরটা ন'কাকীমার কানে পৌঁছোতেই তিনি ডেকে পাঠালেন সমীরকে নিজের ঘরে। জিজ্ঞেস করলেন—হ্যাঁ বাবা, তোমার টাকা-পয়সা এভাবে সাত ভূতে লুটে-পুটে খাবে, এ তো আমরা সহ্য করবো না বাবা! শুনলাম, সেজ পিসীমাকে নিয়ে তুমি নাকি দশ টাকার টিকিট খরচ করে থিয়েটার দেখিয়েছো?

সমীর অপরাধীর মত মাথা নেড়ে বললে—হ্যাঁ—

ন'কাকীমা বললেন—এটা কি তুমি ভালো কাজ করলে বাবা? তুমি জানো তোমার ওই সেজ পিসীমা তোমার মা'কে কী কষ্ট দিয়েছে? তা তুমিই বা তা জানবে কী করে? তুমি তো তখন ছোট, তোমার মা ওই ননদের জ্বালায় কেঁদে ভাসিয়েছে, তবু একটু মিষ্টি কথা বেরোয় নি ননদের মুখে। একদিন কী হয়েছিল জানো?

সমীর বললে—কী হয়েছিল?

ন'কাকীমা বললে—না, তুমি ছেলেমানুষ, তোমার আর সে-সব মেয়েলি কথা শুনে দরকার নেই। ননদ আমরা অনেক দেখেছি, কিন্তু তোমার সেজ পিসীমার মত ঘর-জ্বালানী ননদ আমরা জীবনে দেখি নি। তুমি কিনা আজ সেই সেজ পিসীমাকে গাঁটের পয়সা খরচ করে থিয়েটার দেখালে? তুমি ছেলেমানুষ, তোমারই বা কী দোষ! কিন্তু পিসীমার আক্কেল বলিহারি, তোমার মত ভাল ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে থিয়েটার দেখে এলো—

ন' কাকীমার ছোট ছেলেটা হঠাৎ পাশ থেকে বলে উঠলো—আমিও থিয়েটার দেখবো দাদা। আমি কখ্খনো থিয়েটার দেখি নি—

ন'কাকীমা ছেলেকে ধমক দিলে—ছিঃ, এখন বড় জ্যাঠামশাই মারা গেছেন, এখন কী থিয়েটার-বায়োস্কোপের কথা বলতে আছে?

সমীর তাড়াতাড়ি খুড়তুতো ভাইয়ের কাছে গিয়ে সান্ত্বনা দিলে। বললে—না-না, তুমি মন খারাপ করো না, তোমাদেরও থিয়েটার দেখাবো আমি—

সুতরাং দু'দিন পরে ন'কাকীমার দলকেও মাথাপিছু দশ টাকার টিকিটে

থিয়েটার দেখাতে হলো।

এমনি করে বাড়িসুদ্ধু সকলেরই থিয়েটার দেখা হয়ে গেল। শুধু থিয়েটারেই শেষ হলো না। সিনেমা, সার্কাস্, চিড়িয়াখানা, গান্ধীঘাট দেখিয়ে বেড়াতে হলো। তারপর এতগুলো লোকের খাওয়া-থাকা আছে। খাওয়া মানে খাওয়ার পর খাওয়া। বিশ্বম্ভরবাবুর বাড়িতে শ্রাদ্ধে উপস্থিত হয়ে শুধু শাক-চচ্চড়ি আর ভাত খেলে চলে না। মাছ-মাংস-পোলাও-কালিয়া খেতে হবে। গঙ্গায় নতুন ইলিশ মাছ উঠেছে। ষাট টাকা কিলো হয় হোক, বচ্ছরকার জিনিস না খেল কী চলে ? তাও খাওয়া চাই—নইলে সমীর আবার রাগ করবে। বলবে—আমাকে সবাই পর মনে করছেন নাকি আপনারা ? এ-বাড়ি আপনাদের নিজের বাড়ি মনে করুন। আপনারা চলে গেলে আমি এই ফাঁকা বাড়িতে থাকবো কী করে ? বাবার তো টাকার অভাব নেই। বাবা সুদের কারবার করে অনেক টাকা ব্যাঙ্কে জমিয়ে রেখে গেছেন, সে টাকায় আপনারা সবাই খান-দান, ফুর্তি করুন।

শ্রাবণ মাসে শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকে গেল। তারপর পুজো এল। কলকাতার পুজোটা না দেখে যাওয়া যায় না। সুতরাং পুজোর সময়ও সবাই রইলো। পুজোর পর বড়দিন। বড়দিনের সময় কলকাতার ফুলকপি, গলদা চিংড়ি আর কমলালেবু। তা ছাড়া আছে খেজুর-গুড়। শীতটা কাটলেই সবাই চলে যাবো।

কিন্তু সমীর তখনও বাধা দিলে। বললে—আর ক'টা দিন। তারপর চলে যাবেন। আমি একলা এই ফাঁকা বাড়িতে থাকবো কী করে ?

সুতরাং কারো আর যাওয়া হলো না। সবাই রয়ে গেল। মাসের পর মাস। বছরের পর বছর। ততদিন ব্যাঙ্কের টাকাও ফুরিয়ে এসেছে। একদিন চেক কাটতে গিয়ে খালি হাতে ফিরে এল সমীর।

ব্যাঙ্ক বললে—টাকা জমা নেই—

সমীর অবাক ! জিজ্ঞেস করলে—টাকা নেই কেন ?

—টাকা থাকবে কী করে ? আপনি মাসে-মাসে হাজার-হাজার টাকা তুললে একদিন ভাঁড়ার তো খালি হবেই—

সমীর আরো অবাক হয়ে গেল। বললে—আমি তো মাসে-মাসে হাজার-হাজার টাকা তুলি নি।

ব্যাঙ্ক বললে—এই দেখুন, তুলেছেন কিনা।

বলে খাতা খুলে দেখালে। সমীর দেখলে সেই বছরে তিন লাখ টাকা তুলেছে সে। অবাক কাণ্ড!

সমীর বুঝতে পারলে আসল ব্যাপারটা। বুঝলে আত্মীয়-স্বজন যারা, তার সই জাল করে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা চুরি করে নিয়ে পকেট ভরতি করেছে।

ব্যাঙ্ক থেকে সোজা বাড়ি ফিরে এল সে।

এসেই চীৎকার—বেরিয়ে যান আপনারা বাড়ি থেকে, বেরিয়ে যান—

সবাই হতবাক্। হঠাৎ কী যেন কাণ্ড হলো, তারা কেউ বুঝতে পারলে না। দু'একজন বলে উঠলো—আমরা কী করেছি বাবা? আমাদের বাড়ি থেকে বেরোতে বলছো কেন?

সে-সব কথার উত্তর দেবার সময় নেই তখন সমীরের। সে তখন কেবল চীৎকার করছে— বেরিয়ে যান আপনারা, বেরিয়ে যান—

* * *

আমাদের সঙ্গে যখন বহুকাল পরে দেখা হলো, তখন দেখলাম সমীর একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছে। জিজ্ঞেস করলাম—কই রে, তুই যে বলেছিলি, রোজ একশো লোক খাওয়াবি?

সমীর বললে—না ভাই, আমি দেখেছি আমারই ভুল হয়েছিল, বাবার কথাই ঠিক, এখন বাবার কথা অনুযায়ীই চলছি!

———

তোমরা যদি কখনও মাজদিয়া ইস্টিশানে নেমে হাঁটা পথে সোজা দক্ষিণ মুখো যাও, আর নোনাগঞ্জ পেরিয়ে খাঁটরোর বিল পার হয়ে পেঁপুলবেড়ের আমবাগান পার হও, ওই পেঁপুলবেড়ে আর ফতেপুরের মাঝখানে যে মাঠটা পড়বে, ওইখানে কৃষ্ণা-চতুর্দশীর রাতে হঠাৎ শুনতে পাবে বাঘের ডাক। আশেপাশে কোথাও জঙ্গল নেই, শুধু ধু-ধু করা মাঠ। বাঘ থাকবার কোনও জায়গাই নেই—তবু বাঘের ডাকে তোমরা চমকে উঠবে। ভয় পাবে। কিন্তু ভয় তোমরা পেও না। ও বাঘ নয়, কিছু নয়। তোমরা শুধু ভেবো, ওই বাঘের ডাকের পেছনে এক রহস্য লুকিয়ে আছে। ও এক বহু শতাব্দী আগের রহস্য। ও ওই বাঘমারির ভিটের রহস্য……

* * *

অনেক কাল আগের কথা। মুর্শিদকুলি খাঁ তখন বাঙলার নবাব। পোর্তুগীজরা বাংলার নদীপথে ডাকাতি করে বেড়ায়। বাংলার জায়গায়-জায়গায় তখন নানা রাজা, নানা জমিদারের প্রতাপ। কেউ কাউকে মানে না। রাত্তির বেলা রাস্তা চলতে ভয় করে। টাকা-কড়ি নিয়ে পথ-চলা বিপদ। এ সেই যুগের কাহিনী।

পতিরামের ভিটে ছিল ওইখানে। একদিন পতিরামের কী খেয়াল হলো—বলা নেই, কওয়া নেই, বউ নিস্তারিণী আর তার এক বছরের ছোট ছেলে রাখোহরিকে রেখে বেরিয়ে পড়লো যেদিকে তার দু'চোখ যায়। চোর-ডাকাতের রাজ্যি। কোথায় মানুষটা গেল? প্রাণে বেঁচে আছে কিনা কে জানে—বছরের পর বছর কেটে গেল; তবু নিস্তারিণী সকাল-বিকাল-সন্ধ্যেয়

রাস্তার দিকে চেয়ে বসে থাকে। আর রাখোহরিকে কোলে করে চোখের জল মোছে।

বছর কয়েক পরে ভর-সন্ধ্যেবেলা হঠাৎ পতিরাম একদিন বাড়ি এসে হাজির। বড়-বড় গোঁফ দাড়ি হয়ে গেছে। চেনাই যায় না। বলে—ফিরে এলাম কামরূপ থেকে—

নিস্তারিণী বলে—এমন ভাবিয়ে তুলেছিলে—একটা খবর নেই, কিছু নেই—শুনি তো কামরূপে গেলে নাকি ভেড়া-ছাগল করে রাখে—তুমি যে প্রাণে বেঁচে ফিরেছ, এই-ই অশেষ সর্বমঙ্গলার দয়া—

পতিরাম বলে—ভেড়া-ছাগল আমাকে করবে কি ছোট বউ, আমিই কত মন্তর-তন্তর শিখে এসেছি—মন্তরের চোটে পাখি হয়ে উড়তে পারি, কুমীর হয়ে জলে ডুবতে পারি—বানর হয়ে গাছে উঠতে পারি—

যা'হোক, সর্বমঙ্গলার মন্দিরে পূজো দিয়ে এলো নিস্তারিণী। ভালোয়-ভালোয় যে মানুষটা বাড়ি ফিরে এল, এই যথেষ্ট। রাখোহরিকে পতিরামের কাছে রেখে গেল। সাত বছরের ছেলে রাখোহরি। যখন বাড়ি ছেড়ে যায়, তখন রাখোহরি এই এতটুকুন। পতিরাম ছেলে নিয়ে পাড়া বেড়াতে বেরুল।

তার পরদিন থেকে বাড়িতে লোক আর ধরে না। এ বলে—মন্তর শিখিয়ে দাও, ও বলে—অসুখ সারিয়ে দাও। হাতে আসতেও লাগলো দু'পয়সা, নবীন পণ্ডিতের পাঠশালায় ভর্তি হলো রাখোহরি। এখন অবস্থা ভালো হয়েছে। জল-পড়া, চাল-পড়া নিয়ে লোকে কলাটা-মূলোটা, টাকাটা-সিকেটা দেয়। ভিটের সামনে চণ্ডীমণ্ডপ উঠলো। পেছনে ঢেঁকিশাল হলো। বাড়ির উঠোনে পাত্‌কো কাটানো হলো। নিস্তারিণীর সুখ দেখে কে! কিন্তু সুখ তার বেশীদিন বুঝি থাকে না।

একদিন নিস্তারিণী বললে—সবাই বলছিল—তুমি নাকি ইচ্ছে করলে বাঘ হতে পারো—

পতিরাম বললে—খবরদার, এমন কথা বলো না ছোট বউ—শেষে ভয়ে আঁতকে উঠে সে-এক ভীষণ কাণ্ড করে বসবে তোমরা, তখন আমার সামলানোই দায় হয়ে উঠবে—তাছাড়া রাখো শুয়ে আছে ঘরে—ছোট ছেলে, যদি ভয় পায়—

রাত তখন বোধহয় দেড় প্রহর। খাওয়া-দাওয়া সেরে নিস্তারিণী ঘরে

এসেছে। রাখোহরি বিছানার একপাশে শুয়ে অকাতরে ঘুমুচ্ছে। কিন্তু নিস্তারিণীর উপরোধ-অনুরোধ শেষ পর্যন্ত এড়ানো গেল না। সে জীবনে কখনও বাঘ দেখে নি। পতিরাম বললে—তা' দু'টো পেতলের ঘটি আনো—

ঘটি আনতেই দু'টো ঘটিতে জল ঢেলে মন্তর পড়ে দিলে পতিরাম।

—এই ঘটির জলটা আমার গায়ে ঢাললে আমি বাঘ হয়ে যাবো, আর এই অন্য ঘটির জলটা আমার গায়ে ঢাললে আমি আবার মানুষ হয়ে উঠবো —খুব সাবধান কিন্তু ছোট বউ—

তারপর তাই হলো। সে এক বীভৎস ব্যাপার। দেখতে-দেখতে সেই চালা-ঘরের ভেতর প্রকাণ্ড একটা এগারো হাত সুন্দরবনের বাঘ দাঁড়িয়ে উঠলো। গায়ে বড়-বড় ডোরা-ডোরা দাগ। ইয়া গোঁফ, ইয়া বড়-বড় গোল-গোল চোখ, জিভ বের করে লক্ লক্ করতে লাগলো—আর ল্যাজটা পাকিয়ে-পাকিয়ে ওপরে ছাদের দিকে উঠতে লাগলো। আর সঙ্গে-সঙ্গে ভয়ে আঁতকে উঠে নিস্তারিণী অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল সেইখানে—

তারপর সর্বনাশ। নিস্তারিণীর চীৎকারে রাখোহরিরও ঘুম ভেঙে গেছে। সেও বিছানার ওপর উঠে দেখে—বিরাট একটা বাঘ। বাঘ দেখে সেও পালাতে গেল। কিন্তু পালাতে গিয়ে মন্ত্রপড়া অন্য জলের ঘটিটা তার পায়ে লেগে উল্টে পড়ে গেল।

পতিরামের চোখ দু'টো তখন জ্বলছে! রাগে নয়, ভয়ে। সেই অবস্থায় আর কোন উপায় নেই মানুষ হয়ে ওঠবার। নিস্তারিণী তখনও অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। রাখোহরিরও সেই অবস্থা। ভয়ঙ্কর একটা বুক-ফাটানো চীৎকার করে উঠলো পতিরাম। সে-চীৎকারে আশে-পাশের পাড়া-পড়শীরা সবাই ছুটে এল। বাঘ এসেছে নাকি ওদের বাড়িতে? লাঠি-সড়কি-বল্লম-রাম-দা, যার যা অস্ত্র আছে নিয়ে এল। কিন্তু ততক্ষণে চোখের পলকে পতিরাম ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। ভিটে পার হয়ে সোজা রাস্তা ধরে সে ছুটতে লাগলো। পেঁপুল-বেড়ের আমবাগানের ধারে খাঁটরোর বিলের দু'পাশে ঘন জঙ্গল—সেইখানে গিয়ে ঢুকে পড়লো পতিরাম।

পাড়ার লোক সবাই এসে জিজ্ঞেস করলো—কী হলো গো—

তখন জ্ঞান হয়েছে নিস্তারিণীর। সমস্ত অবস্থাটা বুঝতে পারলে। বুঝতে পারলে মহা সর্বনাশ হয়ে গেছে তার। কেন সে বাঘ দেখবার জন্যে অমন

পীড়াপীড়ি করলে। তারপর সেইদিন থেকে আবার দুঃখের দিন শুরু হলো! নিস্তারিণীর হাতের পয়সাও ফুরিয়ে এল।

ওদিকে খাঁটরোর পথে বাঘের উপদ্রবে লোকে আর চলতে পারে না। কেষ্ট চাঁড়ালের যাঁড়টাকে একদিন পাওয়া গেল না আর। কাছারির সেপাই রামভদ্র একদিন ভোর রাত্তিরে নোনাগঞ্জের হাটে যাচ্ছে, হঠাৎ পেছন থেকে কে ঝাঁপিয়ে পড়লো পিঠে। ছাগলগুলোকে ওদিক চরাতে নিয়ে যাওয়া বিপদ।

এদিকে নিস্তারিণীর দিন আর চলে না। এর ওর কাছ থেকে হাত পেতে নিতে হয় কলাটা-মুলোটা। নইলে রাখোহরিকে তো মানুষ করতে হবে। তবু নিস্তারিণী তার সিঁথির সিঁদুর, হাতের শাঁখা-নোয়া খুলে ফেলে নি।

পাড়ার বৌ-ঝিরা এসে বলে—সধবা মানুষ তুমি—কেন থান পরবে বাছা—সোয়ামী তো তোমার বেঁচেই রয়েছে—শুধু—

নবাবের সুবেদার আর ফৌজদারের কাছে খবর গেল। সবাই বললে—এমন করে বাঘের অত্যাচার চললে আর তো পারবো না বাঁচতে—এতো বাঘ নয়, এ মানুষ-বাঘ যে।

ফৌজদার মহম্মদ জান্ সেপাই পাঠালে। কিন্তু সারা জঙ্গল ঘিরেও কাউকে পেলে না। এ তো আর সোজা বাঘ নয়—এ বাঘ যে মন্তর জানে।

কিন্তু রাত্তিরবেলা যখন সবাই ঘুমে অচেতন, খাঁটরোর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসে পতিরাম। রাস্তা দিয়ে হেঁটে-হেঁটে এসে পৌছোয় নিজের ভিটেয়। ভিটের পেছনে ঢেঁকিশাল! সেখানে ঢেঁকিতে উঠে পাড় দেয়—নিস্তারিণী এত রাত্রে ঢেঁকির শব্দ শুনে ঢেঁকিশালে এসে দেখে—বাঘ। বাঘ কিছু বলে না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে নিস্তারিণীর দিকে চেয়ে। কোনওদিন একটা বিরাট পাকা কলার কাঁদি এনে ফেলে দেয়।

কোনদিন একটা মরা পাঁঠা! ওদের ঘরে চাল নেই—খাবার নেই। বাঘ এসে খাবার জুগিয়ে দিয়ে যায়। ভোরের আকাশ ফরসা হবার আগেই বাঘ কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়, দেখতে পায় না কেউ। নিস্তারিণী চোখের জল রাখতে পারে না। ফিরে এসে রাখোহরিকে বুকে জড়িয়ে ধরে। এমনি করে দিন চলে।

এদিকে বর্গীর হাঙ্গামা শুরু হয়েছে দেশে। কোথা থেকে হঠাৎ ঝাঁকে-ঝাঁকে বর্গীরা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। লুঠপাট করে গ্রাম। ক্ষেত-খামার

লোপাট করে নিয়ে যায়। সে-ক'দিন ঘরের দরজা বন্ধ করে কাটায় সবাই। বড় অশান্তিতে কাটে জীবন। ওদিকে নবাবের খাজনা আদায়, খাঁটরোয় জঙ্গলে বাঘের উপদ্রব, আর তারপর এল বর্গী!

তখন কিছু বড় হয়েছে রাখোহরি। কিন্তু রাখোহরির এমন এক কঠিন অসুখ হলো, তা সারে না আর কিছুতেই। ছেলে শুকিয়ে প্যাঁকাটির মত হয়ে যাচ্ছে। ওষুধ-পথ্য কিছু গলে না গলা দিয়ে। সিধু কবরাজ বড়ি খাইয়ে-খাইয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল অনেকদিন। আর বুঝি বাঁচানো যায় না।

বাঘ রোজ আসে। ঢেঁকিশালে এসে ঢেঁকিতে পাড় দেয়। আর নিস্তারিণী ছেলের রোগশয্যা ছেড়ে উঠে আসে। মনের কথা সব খুলে বলে আর ঝরঝর করে কাঁদে। বাঘ সেইখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সব শোনে। কিন্তু কথা বলবার ক্ষমতা নেই। চুপ করে শোনে—আর তারও বুঝি ছেলের অসুখে বুকটা কেঁপে-কেঁপে ওঠে—ল্যাজটা পাকায় তখন কেবল।

সেদিন সিধু কবিরাজ বললে—বাঘের চর্বি জোগাড় করতে হবে—বুকে মালিশ না করলে আর বাঁচাতে পারা যাবে না—কফ বসে গেছে বুকে—

কিন্তু কে আনবে বাঘের চর্বি কিনে! কবিরাজ নিজেই আনতে পারছে না। বর্গীর যা হাঙ্গামা বেঁধেছে, ঘর থেকে কেউ বেরুতেই চায় না! নোনাগঞ্জে গেলে হয়ত কিনতে পাওয়া যাবে! কিন্তু সে তো এখান থেকে মাইল দশেক রাস্তা। পথে বাঘের উপদ্রব আছে, ইছামতীতে পোর্তুগীজ ডাকাতরা আছে, তারপর আছে বর্গী! কেউ আনতে রাজী হলো না। নিস্তারিণীর জোরে কাঁদতে ইচ্ছে হলো—

সেদিন কৃষ্ণা-চতুর্দশীর রাত। বাঘ তেমনি এসে ঢেঁকিশালে দাঁড়াল। নিস্তারিণী শব্দ পেয়েই এল। সিধু কবিরাজের কথা বললে—কোনও উপায় নেই। রাখোহরিকে বুঝি এবার বাঁচানো গেল না গো—

নিস্তারিণী শেষকালে বললে—তুমি যাও এবার, ভোর হয়ে আসছে—

বাঘ কিন্তু নড়লো না। ঢেঁকিশালে থাবা রেখে তেমনি ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হঠাৎ একবার আর্তনাদ করে উঠলো—একবার, দু'বার, তিনবার। পাড়াপড়শী সবাই-এর ঘুম ভেঙে গেছে।

নিস্তারিণী বললে—করেছো কী, সর্বনাশ করেছো আমার—এখুনি যে

ফৌজদারের সেপাইরা ছুটে আসবে গো—দেখতে পেলে আর আস্ত রাখবে না তোমাকে—

তারপর যা হবার তাই হলো। খবর পেয়ে এল চারিদিক থেকে সবাই। সেপাই এল গাদা বন্দুক নিয়ে। কিন্তু কী যে বাঘের গোঁ। লোকজন দেখেও পালালো না। ঠায় সেইখানে দাঁড়িয়ে গাঁক-গাঁক করে চীৎকার করতে লাগলো।

তারপর সেপাই গুলি করলে বাঘটাকে। লুটিয়ে পড়ল বাঘটা ঢেঁকিশালে। রক্তে ঢেঁকিশাল ভেসে গেল। নিস্তারিণীও সঙ্গে-সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে গেছে। তা হোক্, নিস্তারিণী একসময় সুস্থও হয়ে উঠলো। স্বামীর শোক রাখোহরির মুখের দিকে চেয়ে ভুলতে লাগলো। শাড়ি ছেড়ে থান ধুতি পরলো নিস্তারিণী। সিঁথি থেকে সিঁদুর মুছে ফেললে, হাতের শাঁখা-নোয়া খুলে ফেললে।

আর তারপর? তারপর—লোক বলে—সেই বাঘের চর্বি বুকে মালিশ করে রাখোহরিকে সিধু কবিরাজই বাঁচিয়ে তুললো তার দিন পনেরো পরে।

কিন্তু তারপর কত শতাব্দী কেটে গেছে। মুর্শিদকুলী খাঁ, সিরাজদ্দৌল্লা, লর্ড ক্লাইভ—কত লোক এল আর গেল। তবু আজও কৃষ্ণা চতুর্দশীর রাতে ওখানে বাঘের ডাক শোনা যায়।

———

রাত্রে আমি আর সুখলাল এক তক্তপোষে শুয়ে থাকি। সুখলাল বেচারা সারাদিন রিক্‌শা টেনে এমন ক্লান্ত থাকে, যে চোখজোড়া খুলে থাকবার পর্যন্ত ধৈর্য থাকে না তার। আমি তখন আস্তে-আস্তে পাশে যাই। সুখলাল টেরও পায় না। আস্তে-আস্তে গলার কাছে মুখটা নিয়ে যাই, তারপর নিজের কাজ সেরে, পেটটি ভরে আবার নিজের ফুটোটির মধ্যে ঢুকে পড়ি। সুখলালের খাটিয়াটা নতুন। এখনও আমাদের দলের কেউ টের পায় নি। যতদিন টের না পায়, ততদিন ধরা পড়বার ভয় নেই।

মা থাকে পাশের আর একটা খাটিয়ায়। মাঝে-মাঝে দিনের বেলা মা'র সঙ্গে দেখা হয়। বলে—কীরে, ভাল আছিস তো ?

বলি—খাসা আছি মা, আমার জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না—

আমার এক বোন ছিল, ভারি বোকা। শাস্ত্রে আছে—'অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।' লোভের জন্যে অকালে প্রাণ হারাতে হোল তাকে ! আর সাহস ! সাহসও কম ছিল না। দিনের বেলায় লোকজন ঘোরা-ফেরা করছে, তখন পাড়া বেরুতে যাওয়া ! কেন, রাত্রে বেরুলেই হয়। যখন লোকেরা সব অকাতরে ঘুমোয়, তখন যত খুশি বেরোও, কেউ কিছু বলবে না। মরলোও অকালে সেই জন্যে।

কিন্তু আমার এত সুখ কারোর সহ্য হলো না। চারদিক থেকে লোভী দৃষ্টি পড়লো। তারা বললে—তুমি একা বসে-বসে একছত্র রাজত্ব করবে, এ সে-যুগ নয়। এখন গণতন্ত্রের যুগ। সাম্যবাদের যুগ। যদি সবার সঙ্গে মিলে

মিশে থাকতে পারো তবেই থাকো, সবাইকে সন্তুষ্ট করে সবাইকে সুখের ভাগ দিয়ে তোমায় থাকতে হবে। বোঝো যুক্তি! কী আর করবো? সবাই এল। একেবারে পাল-পাল বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে সুখলালের খাটিয়ায় এসে হাজির হোল। সুখলালকে যেন একটু বিরক্ত মনে হোল। বেচারা সারাদিন খেটে-খেটে আসে, রাত্রে অত অত্যাচার সইবে কেন? আমি একবার প্রস্তাব করলাম যে, এসো সবাই পাঁচ মিনিট করে আমরা ভোগ করি। অর্থাৎ সবাই সমান ভাগ পাবে। আমরা রাত বারোটা থেকে 'কিউ' ক'রে দাঁড়িয়ে একের পর একজন করে খাই। কিন্তু সবাই আগে-ভাগে কাড়াকাড়ি করে খেতে যাবে। শেষে যা হবার তাই হোল। একদিন মাঝরাত্রে ঘুম ভেঙে গেল সুখলালের। ল্যাম্পটা জ্বাললে। জ্বেলে বিছানার কাছে নিয়ে এল। বললে—উঁ, কী ছারপোকা রে বাবা—

বালিশ-শতরঞ্জি সব উল্টে-পাল্টে দেখতে লাগলো। সে এক অরাজক অবস্থা। যা ভয় পেয়েছিলাম আমি! ভয় হবে না? শক্তিতে আমরা মানুষের সঙ্গে পারবো কেন! একটা বুড়ো আঙুল দিয়ে টিপলেই অক্কা! দু'-একজন ধরা পড়ে গেল। ঠিক সময়ে পালাতে পারে নি। বাঁচোয়া যে. আর সবাই খাটিয়ার ট্রেঞ্চের মধ্যে লুকিয়ে পড়লুম। নেহাৎ সুখলালের খুব ঘুম পেয়েছিল তাই আর জ্বালালে না। সে-রাত্রের মত আমরা বেঁচে গেলুম। কিন্তু আমি আর নিশ্চিন্ত হতে পারলুম না। একবার যখন টের পেয়েছে, তখন আর বেশী দিন শান্তিতে থাকতে পারা যাবে না। মা আমাকে প্রায়ই বলতো—বেশী অত্যাচার করো না, নইলে নিরীহ বেড়াল, সে-ও বিপদে পড়লে থাবা উঁচিয়ে দাঁড়ায়—সইয়ে-সইয়ে রক্ত খাবে—

তা বটে,অত্যাচার সহ্য করতে-করতে যখন তা সহ্যের শেষ সীমা অতিক্রম করে যায়, তখন নিরীহ মানুষেরাও মারমুখো হয়ে ওঠে! মা অনেক দেখেছে, অনেক শুনেছে। মা'র কাছে অনেক গল্প শুনতাম। এই এ-দেশের লোকেরাও নাকি এককালে সাহেব দেখলেই সেলাম করতো। ভক্তিতেও বটে ভয়েও বটে। পোশাকে, চলায়, বেলায় সাহেবের অনুকরণ করতো!

মা বলে—সে সব দিন আর নেই।

ভয়ও হলো, বিরক্তিও হলো, দূর ছাই, এই সব অপোগণ্ডদের জন্যেই তো আমাদের সমস্ত ছারপোকা জাতটার নামে বদনাম। এই যে লোক এখন

ছারপোকার নাম শুনলেই ভয়ে আঁতকে ওঠে, যেন বিছে না সাপ, এর জন্যে দায়ী ওই সব আহাম্মকেরা। এখন মানুষ চালাক হয়েছে, কত রকমের অস্ত্র বার করেছে আমাদের মারবার জন্যে। মা বলে—আমাদের মারবার কত রকম সব তেল, কত রকম ওষুধ বেরিয়েছে, কাগজে নাকি হাজার-হাজার টাকা খরচ করে তার বিজ্ঞাপন দেয়। যারা তা তৈরী করে, তারা অগাধ বড়লোক হয়ে গেছে।

এখনও সময় আছে। এখনও যদি সাবধান হওয়া যায়, তা'হলে হয়তো আমাদের জাতি নিশ্চয় মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি পাবে! আবার আমাদের অধঃপতিত ছারপোকা জাতি জগতের উচ্চ শিখরে···

যাক্ গে সব বাজে কথা! সেই রাত্রেই ঠিক করলাম গৃহত্যাগ করবো—দুর্জনদের সংস্রব ত্যাগ করবো।

খুব ভোর বেলা সুখলাল শয্যা ত্যাগ করবার সঙ্গে-সঙ্গে আমি তার পোশাকে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। মা'কে জানাই নি, নইলে মা হয়ত আমার গৃহ-ত্যাগের খবর পেয়ে বাধা দেবে, কিংবা কান্নাকাটি করবে। কাজ কী ঝঞ্ঝাটে! গৌতম, চৈতন্যদেব সবাই গৃহত্যাগ করেছিলেন স্ত্রীর অজ্ঞাতে।

সুখলাল সকালবেলাই রিক্শা নিয়ে বেরোয়। সুখলাল যখন রিকশা পরিস্কার করছে, তখন এক ফাঁকে রিকশার গদিতে গিয়ে আশ্রয় নিলুম। সুখলালের ময়লা খোলার চালের ঘর থেকে এ অনেক স্বাস্থ্যকর জায়গা। সুখলালের ভিজে স্যাঁতস্যাতে ঘরের মত নয়। চমৎকার লাগলো আমার। কত দেশ ঘুরি রিক্শায় চড়ে। চৌরঙ্গীর ময়দানের পাশ দিয়ে খোলা হাওয়া খাই! স্বাস্থ্য আমার দু'দিনে ফিরে গেল! গায়ে মাংস লাগলো, লাল্চে আভা বেরোতে লাগলো গা দিয়ে। এক-একবার মনে হয়, দেশের লোকেদের সঙ্গে দেখা করে আসি। তারপর মনে হয়, থাকগে। তাতে শুধু হিংসা, কলহ, গৃহবিবাদ—ছারপোক জাতির যা চিরন্তন স্বভাব—তারই সূচনা হবে।

বেশ আরামেই ছিলাম। কোনও দিন চীনেম্যানের রক্ত, কোনও দিন ইংরেজের, কোনও দিন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানের, কোনও দিন বা আমেরিকানদের। বিভিন্ন দিন, বিভিন্ন স্বাদ। সুখলাল ধর্মতলার মোড়ের হোটেলগুলোর সামনে গিয়ে রিক্শা নিয়ে দাঁড়ায়, আর হোটেল থেকে মাংস, পোলাও ডিম, চপ, কাটলেট, মাখন, দুধ খেয়ে বেরোতো সোলজারেরা। গায়ে সব কী রক্ত তাদের। মুখ আমার জুড়িয়ে যেত! সুখলালের রক্ত এদের কাছে তেতো নিম। মদ

খেয়ে জোড়া-জোড়া সৈন্য উঠতো রিকশায়। মদের নেশায় তারা অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে পড়ে থাকতো। আর আমি আয়েস করে রক্ত খেতাম। তারা টেরও পেত না। আর আমিও মন কায়দা করে খেতাম, তারা বুঝতেই পারতো না। রক্ত খাওয়ার ওইতো নিয়ম। মনে হতো—এরা কত কী খায় রাজার জাত ওরা—স্বাধীন জাতের লোক ওরা—ওদের রক্তের স্বাদই আলাদা, আর দুঃখ হতো আমাদের মানুষদের দেখে। ও-সব হোটেলে ঢুকতেই পায় না বেচারারা। যদি দৈবাৎ এরা উঠতো সুখলালের রিকশায়, আমি তাদের কৃপা করে ছুঁতাম না। আহা, সবাই মিলে শুষছে ওদের, ওদের আর শুষে কী হবে। রেশনের দোকানের কাঁকর ভর্তি চাল, ভেজাল ঘি খেয়ে বেচারীদের রক্তে আর তেজ নেই। ওদের একেবারে মেরে ফেলেছে।

মা বলেছিল—আর বছরে নাকি ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়ে লক্ষ-লক্ষ লোক মারা গেছে। তা মরার আর বাকী আছে কী! আমি তো পারতোপক্ষে ছেড়েই দিতাম। সাহেবদের রক্ত খেয়ে-খেয়ে শরীরটা বেশ ফিরে গেছে, এমন সময় এক দুর্ঘটনা ঘটলো।

মা বলেছিল—ভাগ্য কা'রো সমান যায় না চিরদিন। বিশেষ করে দেখেছি, ছারপোকা-জাতির ভাগ্য। আমার তো কোনও কষ্টই ছিল না। আমি তো দিন-দিন লালই হচ্ছিলাম। লাল গদির সঙ্গে লাল চেহারা একেবারে বেমালুম মিশে গিয়েছিল। মাঝে-মাঝে খুব রোদ্দুর হলে একটু কষ্ট হতো। চৌরঙ্গীর রাস্তার পাশে ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ্দুর, সেখানে রিকশাটাকে রেখে দিয়ে সুখলাল যখন পাশের গাড়ি বারান্দার নীচে গিয়ে বসত, তখন মনে হতো যেন আগুন জ্বলছে। আমি তখন গদির স্লিট্-ট্রেঞ্চ থেকে বেরিয়ে গদির পাশের ফাঁক দিয়ে একেবারে ভেতরে চলে যেতুম, যেখানে রিকশাওয়ালার গামছা-দেশলাই থাকতো। ঘাম-মোছা গামছাটা ভিজে থাকতো। সেইখানে তখন খানিকটা আরাম পাওয়া যেত।

আমাদেরও ছারপোকাজাতির মধ্যে একটা কথা প্রচলিত আছে যে—কাউকে বিশ্বাস করো না। কথাটা শুনতে খারাপ, বলতে খারাপ। কত যন্ত্রণা দিয়েছি, কিন্তু আমি সুখলালকে বিশ্বাস করতাম। সুখলালকে কত কামড়িয়েছি, কিন্তু সুখলাল আশ্রিত-পালক। বিশেষ করে আমার কাছে। শোষণ করি বলে কখনও সুখলাল আমার গায়ে হাত পর্যন্ত তোলে নি। যে যদি কখনও বিদ্রোহ

না করে, তবে শোষক তাকে প্রশংসাই করে থাকে--এইটেই রীতি। কিন্তু আমার সুখলাল-প্রীতি সেজন্যে নয়—প্রীতি অন্য কারণে! আমি দেখতাম, সুখলাল দিনরাত খেটে যা উপায় করতো, তার হাজার গুণ বেশী উপায় করতো কিছু না করে যারা রিকশায় চড়তো, সেই সাদা চামড়ার জাত। আর তা ছাড়া দেখতাম সুখলালকে রাত্রে শোষণ করছে ছারপোকার জাত, আর দিনের বেলা শোষণ করছে সাদা চামড়ার জাত।

সুখলালের জাতের ওপর সহানুভূতি আমার দশগুণ বেড়ে গেল, যেদিন সেই দুর্ঘটনাটা ঘটলো। সন্ধ্যেবেলা কোনও সওয়ারী নেই। একা খালি রিকশাটা নিয়ে ঠুন্-ঠুন্ করতে-করতে চলছিল সুখলাল। হঠাৎ বলা নেই, কওয়া নেই, একটা মিলিটারী লরী এসে ধাক্কা মারলে রিকশার ওপর। আমাকে নিয়ে রিকশাটা শুদ্ধ ছিট্‌কে পড়লো দশহাত দূরে, আর লরীর ভারী-ভারী ছ'-ছটা চাকা সুখলালের শরীরের ওপর দিয়ে গড়-গড় করে গড়িয়ে চলে গেল।

আমার আর কী হবে। কিন্তু সুখলালের দিকে চেয়ে দেখি—রক্তে রাস্তা একেবারে ভেসে গেছে। রক্ত অবশ্য সুখলালের গায়ে ছিল না। যেটুকু থাকতো, তা-ও আমরা আর ওরা খেয়ে শেষ করে দিয়েছি। নড়বার-চড়বার সময় দিলে না, সুখলালকে একেবারে চেপ্টে, গুঁড়িয়ে-পিষে-থেঁতলে নিরাকার করে দিলে। দেখে আমার চোখ দু'টোতে আগুন জ্বলে উঠলো। ভাবলাম একদিন এর প্রতিশোধ নিতেই হবে।

চারপাশে ততক্ষণে পুলিশ, লোকজন, ভিড়ে একাকার। ভাঙা রিক্‌শা-টার কাছে পুলিশ এল। রিক্‌শার কাছে ঘেঁষে এসে দাঁড়াল সৈন্যরা। কী হাসি তাদের। দেখে আমার গা জ্বলে গেল। একজন ভাঙা রিক্‌শাটার ওপর বসলো। আমি সুযোগ পেয়েই উঠে বসলুম তার গায়ে। তারপর তার সঙ্গে-সঙ্গে গেলুম। ওরা ঢুকলো হোটেলে।

মা বলছিল—দেশে দুর্ভিক্ষ হয়েছে। কোথায় দুর্ভিক্ষ? কী আলো, কী হাসি, কী খাওয়া! অত খেয়ে-খেয়েই রক্ত হয়েছে ওদের অত!

হোটেলের খাওয়া শেষ হলো। উঠলো ওরা। তারপর গেল ওদের ক্যাম্পে। সে এক অদ্ভুত রাজ্য ভাই। একশো-দু'শো-হাজার খাটিয়া। খাটে আমাদের ছারপোকা জাতের সঙ্গে দেখা হলো না। কেমন যেন অদ্ভুত গন্ধ। দম আটকে আসে। একটা রাত কাটাতে হবে এখানেই। তারপর

কাল সকাল বেলা যা হয় করা যাবে। একজনের সঙ্গে দেখা হলো।

আমাকে দেখে নমস্কার করে বললে—কি দাদা, হঠাৎ এখানে যে?

বললাম—কেন, তোমাদের এখানে কী আসতে নেই?

বললে—আরে পালাও-পালাও এখুনি—

—কেন?

—এখুনি দেবে ওষুধ ছিটিয়ে, তখন প্রাণ নিয়ে টানাটানি—এখানে বড্ড কড়াকড়ি; এটা তোমার দিশি-কোয়ার্টার পাওনি—

ভয় পাবারই কথা। কিন্তু ভয় আমি পেলুম না। আমার উদ্দেশ্য আলাদা। সুখলালের কথা মনে পড়লো। আহা বেচারী। প্রাণ নিয়ে প্রাণান্ত যার, তারই ওপর এ সংসারে যত রাহাজানি। সুখলালের জন্যে সত্যিই মন কেমন করতে লাগলো। সুখলালের সঙ্গে কতদিন ঘর করেছি, সে ঘরের আবহাওয়াই আলাদা। তেলের অভাবে সেখানে আলোই জ্বলতো না। সুখলাল কতদিন ছাতু ভিজিয়ে খেয়েছে দু'টো কাঁচা লঙ্কা দিয়ে। তারপর ঘরের চাল দিয়ে জল পড়ছে অনবরতই! যেখানে জল পড়তো, সেখান থেকে খাটটা সরিয়ে শুতো শুধু। সুখলাল কিন্তু ঘুমোতো খুব আরামে। ঘুমোলে আর সুখলালের জ্ঞান থাকতো না। কিন্তু এ কী রাজ্য! এখানে আলোয় আলো। তাস খেলছে কেউ, গান গাইছে, মদ খাচ্ছে। হোটেল থেকে এত খেয়ে এল, তবু আরো খাচ্ছে। না খেলে কি আর লড়াই করতে পারবে? সাদা-সাদা চেহারা। খালি গায়ের ওপর বিজলী বাতি পিছলে পড়ছে। রাত্রে উপোস করে রইলুম। কে জানে, এখানে টের পেলে হয়ত পুড়িয়ে দেবে খাটিয়া, বিছানা, মশারী। দরকার নেই! একটা দিন নয় উপোষেই গেল।

পরদিন সকালবেলাই সব সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। আমি আগেই উঠেছি। জোঁকের মত লেগে রইলুম একজনের গায়ে। যা থাকে কপালে। না হয় প্রাণই যাবে। কিন্তু ছারপোকা জাতির বদনাম আমায় ঘোচাতেই হবে। সুখলাল—আমার মনিব—তার কথা মন থেকে দূর করতেই পারি না।

সবাই উঠলো গিয়ে সব মোটরে। বড়-বড় বিরাট সব লরী। এই রকম একটা লরীই সুখলালকে চাপা দিয়েছে। ছ'-ছটা চাকা। যেন এক-একটা আস্ত বাড়ি। একেবারে ড্রাইভারের গায়েই আটকে ছিলাম। গাড়ি ছেড়ে দিলে। কোথায় যাচ্ছে কে জানে! হু-হু শব্দে রাস্তা কাঁপাতে লাগলো। ড্রাইভারের

বসবার জায়গায় আশ্রয় নিলাম। গান ধরলে সবাই, সে কী গান! সুখলালও গান গাইত। কিন্তু সে গানে এমন তেজ ফেটে পড়তো না। রক্তে তেজ থাকলে তবেই এমন গান বেরোয়। সমস্ত শহরটা কাঁপিয়ে ছাড়ছে। মনে-মনে বললাম—এ তেজ আমি ভাঙবো, তবে আমার ছারপোকা-জন্ম সার্থক। সুখলালের জান নিয়েছে এরাই। কোন অপরাধ করেনি সে। দুনিয়াকে যেন জয় করতে ছুটছে এরা। সাদা চামড়াতে ছেয়ে গেছে শহর। রাস্তা দিয়ে ছুটে চলেছে, নয়তো আকাশপথ দিয়ে উড়ে চলেছে। নিরীহ লোকগুলো রাস্তায় প্রাণ হাতে করে সরে দাঁড়ায় ট্রাম-বাসের পাশে। চলতে চলতে হু-র্-রে শব্দ করে চীৎকার করে ওঠে। পাথরের রাস্তাটা কেঁপে ওঠে, দু'পাশের বাড়ির লোকজন আঁতকে ওঠে ভয়ে। ভাবে, ভূমিকম্প হলো বুঝি।

লরীটা ছুটে চলেছে। আমি মুখ বাড়িয়ে দেখলাম, অব্যর্থ সুযোগ। ড্রাইভার পর্যন্ত তালে-তাল দিয়ে গানে যোগ দিয়েছে। সবারই ফুর্তির মেজাজ। আমি প্রস্তুত হয়ে নিলাম। সুখলালের রক্তাক্ত মুখটা মনে পড়লো। এদেরই একজন সুখলালের মৃত্যুর জন্যে দায়ী। আর দ্বিধা নয়। হুলটি বের করে প্রাণপণে আচমকা ফুটিয়ে দিলাম ড্রাইভারের হাঁটুতে। দু'হাত দিয়ে স্টিয়ারিং-হুইল ধরা ছিল। যন্ত্রণার জ্বালায় তাড়া-তাড়ি একটা হাত দিয়ে হাঁটু চুলকোবার চেষ্টা করতেই বেসামাল হয়ে গেল। ঘুরে গেল স্টিয়ারিং-হুইল। প্রচণ্ড একটা শব্দ হলো। রাস্তার গ্যাসপোস্টে ধাক্কা লাগলো; সেখান থেকে ছিট্‌কে লাগলো বিরাট একটা বাড়ির থামে। আর সঙ্গে-সঙ্গে কয়েকটা মিলিটারি একেবারে চূড়ান্ত জখম। ড্রাইভারটার অবস্থা হলো ঠিক সুখলালের মত।

প্রাণটা আনন্দে নেচে উঠলো। মনে হলো—অদৃশ্য জগৎ থেকে সুখলাল যেন আমার দিকে চেয়ে হাসছে। এতদিনে প্রতিশোধ নিতে পেরেছি।

তারপর এমনি ঘটনা ঘটেছে কত। সবের মধ্যেই আছি আমি, আর আমার আরো সাত-আটটি নতুন বন্ধু। তাদেরও আমারই মতো ঐ একই পণ। ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডটাই আমাদের পক্ষে সবচেয়ে সুবিধে। ঘণ্টায় আশি মাইল বেগে চলে গাড়ি—আর বড়-বড় গাছ আছে রাস্তায়। আর সুবিধে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউতে। মাসের মধ্যে দশ-বারোটা দুর্ঘটনা আমরা ঘটাই। হয়ত সুখলালের আত্মা এতে সন্তুষ্ট হয়। লোকে মনে করে ওরা মদ খেয়ে চালাবার সময় অসতর্ক হয়ে দুর্ঘটনা ঘটায়। কিন্তু এর পেছনে আছি আমরা। ছারপোকা জাতির যে বদনাম আছে পৃথিবীতে, তা যদি কিছুটা মুছতে পারি, তাই এই প্রচেষ্টা। মানুষের জাতি না জানুক, ছারপোকা-জাতির সবাই এ খবর জেনে গেছে। তারা বলে—কালো মানুষ আর ছারপোকা দু'জনেই এশিয়ার অধিবাসী। এশিয়ার অধিবাসীদের সবাই মিলে এশিয়ারই উন্নতি করতে হবে। তারা তাই আমার নাম দিয়েছে 'ছারপোকা জাতির কর্মবীর'।
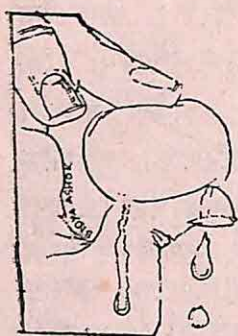
রসগোল্লা পর্ব

আমি যখন প্রথম কবিতা লিখতে শুরু করি, কী বিষয় নিয়ে লিখি জানো? সে এক অদ্ভুত বিষয়। চাঁদ, আকাশ, পাখি, তারা, বসন্ত, শরৎ কিছু নয়। মা, ভগবান, কিংবা স্বদেশ, তাও নয়। যা নিয়ে সবাই লেখে, তা নিয়েও নয়। তোমরা ভাবলে অবাক হয়ে যাবে, এমন ছন্নছাড়া বিষয় নিয়ে আমি কবিতা লিখলুম কেন? কিন্তু তোমরা তো কেউ রসগোল্লা খেতে আমার মত ভালবাসতে না। রসগোল্লা খেতে তোমরা যদি আমার মত ভালবাসতে, তা'হলে তোমরা বুঝতে, কেন আমি ওই বিদকুটে বিষয় নিয়ে কবিতা লিখেছিলাম।

কাকা বললেন—হ্যাঁরে, তোর কবিতার কী আর কোন বিষয়বস্তু পেলি নে—

মনে-মনে বললাম—হায় রে কাকা, তুমি তো আর রসগোল্লা খেতে ভালোবাসো না—তুমি কী বুঝবে, আর তোমাকেই বা আমি কী বোঝাবো। অথচ রসগোল্লা নিয়েও আমি কবিতা লিখি নি। এখন কী নিয়ে লিখেছিলাম আমার প্রথম কবিতাটা—বলো তো!

—যা হোক—গোড়া থেকেই গল্পটা বলি।

* * *

তখন আমার বয়েস কত আর। নেহাতই ছোট। সেই ছোট বয়সে আমি পুজোর ছুটির সময় বিলাসপুরে গিয়েছিলাম একবার। কালো মাটির দেশ বিলাসপুর। ছত্রিশগড়। পেঁড়া, বালুসাই, গুলাবজাম আর জিলেবির দেশ। মামা ওখানে বহুদিনকার উকিল। আমাকে দেখে বড় ভাবনায় পড়লেন। মা'কে বললেন—তোর ছেলেকে নিয়ে তো মহাভাবনায় পড়লাম মেন্তি—

মা-ও ভাবনায় কিছু কম পড়ে নি। আর মামারবাড়িতে কে-ই বা ভাবেনি?

মামা বললেন—বজ্‌রঙ্‌ পেঁড়াটা তৈরি করে ভালো, ত্রিশ টাকা কিলো নেয় বটে, কিন্তু জিনিসটা করে বাজারের সেরা—

সকালবেলা গিয়ে পৌঁছিয়েছি। কলকাতা থেকে দু'দিনের রসগোল্লা সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দু'টো দিন না হয় কাটলো, কিন্তু তারপর? তারপরের কথা ভেবেই মা অস্থির। বিলাসপুর শহরটা সমস্ত চষে ফেলা হলো। রসগোল্লা কেউ তৈরী করতে পারবে না। পঞ্চাশ টাকা কিলো দিলেও না। মা তো কলকাতায় ফিরে আসবেন বলেই স্থির করলেন। রসগোল্লাহীন দেশে কেমন করে আমি বাঁচবো—একথা মা'র চেয়ে বেশী করে কেউ জানতো না।

মা বললেন—তা'হলে বিলুকে নিয়ে কলকাতাতেই ফিরে যাই বড়দা—রসগোল্লা না পেলে যে ছেলে আমরা বাঁচবে না—

মামা আর কী বলবেন। শুধু নিজের মনেই যেন বললেন—কী বিদকুটে নেশাই করিয়েছিস্ বাবা তোর ছেলেকে—

কিন্তু না, নেশার খোরাক শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল বটে। এই বিলাসপুরের কালো মাটিতে তা'হলে রসিক লোক আছে। কিন্তু হুজ্জুতি অনেক। বিলাসপুর শহর থেকে সাড়ে তিন মাইল দূরে এক হালুইকর থাকে। রাস্তার ধারে লাড্ডু আর গুলাবজাম বেচে। সে বললে—চল্লিশ টাকা দিলে রোজ পাঁচশো গ্রাম করে রসগোল্লা তৈরী করে দিতে পারে। কিন্তু কোনও লোক গিয়ে তা নিয়ে আসতে হবে।

তা, তাই সই। পরদিন থেকে রোজ সন্ধ্যেবেলা গিয়ে তিন মাইল হেঁটে একটি চাকর রসগোল্লা আনবার জন্যেই বহাল হলো। নইলে আমার কান্নায় বাড়িসুদ্ধ লোকের জীবন তো ব্যতিব্যস্ত হয়ে যেত।

আমার কাণ্ড দেখে পাড়াসুদ্ধ কেন, গ্রামসুদ্ধ লোক তাজ্জব হয়ে গেল।

তা হোক্, লোকলজ্জার ভয়ে আমার মন টলে না। আমি অচল-অটল হয়ে রসগোল্লার স্বাদ গ্রহণ করতে লাগলাম। ভোরবেলা ঘুম ভাঙার সঙ্গে আমার দু'টি রসগোল্লা চাই। আমার বিছানার পাশে একটি বাটিতে ঢাকা থাকবে রসগোল্লা দু'টি। আর আমি ঘুমচোখে হাত বাড়িয়ে রসগোল্লা দু'টি নিয়ে আলগোছে মুখে পুরে দেব। এ আমার বহুদিনের অভ্যোস। সেই অভ্যোস কখন যে নেশায় পরিণত হয়ে গেছে, তা জানতেও পারিনি।

কিন্তু সেদিন এক বিপদ বাধলো। বিপদ বলে বিপদ! সকালবেলা

অভ্যেসমত ঘুম-চোখে হাত বাড়িয়েছি. জানলার কাছে, যেখানটিতে আমার রসগোল্লা রাখা থাকতো। দেখি বাটিটা ঠিকই আছে, রসগোল্লা দু'টো নেই।

সর্বনাশ! নেশা উড়ে গেল মাথায়। সকালবেলা চা না পেলে চা-খোরদের যে দশা হয়—আমারও তাই হলো। ছোট ছেলে হলে কী হবে, আদুরে-দুলাল! কান্নায় বাড়ি ফাটিয়ে ফেললাম। যেখান থেকে হোক, রসগোল্লা এনে দেওয়া চাই। সেই সকালবেলাই আমার চিৎকারে সকলের মেজাজ মাথায় উঠলো। কার এত সাহস, কার এত তেজ, কার এত বজ্জাতি, কার এত...

মা বললে আহা ছেলেমানুষ তো—অভ্যেস হয়ে গেছে—এখন ওর দোষ কী? না পেলে কাঁদবেই তো!

মামা বললে—এই আদর দিয়ে-দিয়েই ছেলেটার মাথা খাবি মেন্তি!

সবাই খুঁজতে লাগলো কে খেলে রসগোল্লা দু'টো। ইঁদুর খেলে কী?

মা বললেন—ইঁদুরে কি অমন চেঁছে-পুছে রসগোল্লা খায়?

মামা বললেন—ইঁদুরে কী খায় না খায়, পড়িস নি ছোটবেলায়? 'উই আর ইঁদুরের দেখ ব্যবহার, যাহা পায় তাই কেটে করে ছারখার'।

মা বললেন—ইঁদুরে কখনো নয়—বেড়াল।

মামা বললেন—বেড়াল রসগোল্লা খেতে যাবে কেন? বেড়াল কখনও রসগোল্লা খেয়েছে, এমন কথা তো কোনোদিন শুনি নি—

পরের দিনও আবার সেই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি। সর্বনাশের মাথায় পা—কিন্তু কার ঘাড়ে ক'টা মাথা, নেশার জিনিস এমন করে চুরি করে। সামান্য শিশুর খাদ্য দু'টি মাত্র রসগোল্লা! পরের দিনও এল রসগোল্লা—কিন্তু আমার ভোগে এল না। কে খায়? কিছুই বোঝা যায় না।

মামা শেষ পর্যন্ত রেগে বললেন—একবার যদি ধরতে পারি তো···

ধরতে পারলে মামাবাবু কী যে করবেন, তা আর মুখে বললেন না, মুখের চুরুটটা দাঁত দিয়ে জোরে চিবুতে লাগলেন।

পরের দিন শোবার বিছানার পাশে রসগোল্লা রেখে একমাত্র দরজাটা খিল দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হলো। রাত্তিরবেলা যে টিপি-টিপি পায়ে ঘরে ঢুকে টুপ করে রসগোল্লা দু'টো মুখে পুরে দেবে, তা চলবে না। ঘরের ভেতরেই প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু পরের দিনও সেই অঘটন। অবাক্ কাণ্ড! আচ্ছা, যদি ইঁদুরই হয়, তো এবার বাটি চাপা দিয়ে তার ওপরে ইঁট চাপা দেওয়া হলো

ইঁদুরের সাধ্যি নেই ওই থান ইঁট তুলে রসগোল্লা খাবে।

কিন্তু অবাক কাণ্ড! ওই থান ইঁট তুলেও কে রসগোল্লা খেয়ে গেল পরদিন! তার পরের দিন একটা বিরাট লোহার ঢাকা চাপা দেওয়া হলো। যদি বেড়াল হয় তো, নড়ালে শব্দ হবে। কিন্তু পরের দিনও চুরি হলো।

মামাবাবু যেন কেমন হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। তাঁর ওকালতি বুদ্ধিতে কিছু সমাধান হলো না এ-সমস্যার। তিনি হাল ছেড়ে দিলেন। মা বললেন—বিলু এমন রোগা হয়ে যাচ্ছে যে ওর দিকে আর চেয়ে তাকানো যায় না।

চুরি হলে পুলিশে খবর দেওয়াই নিয়ম। কিন্তু বাড়ির ভেতর থেকে রসগোল্লা চুরি—এর কী প্রতিবিধান হবে?

সেদিন রাত্রে মামাবাবু এক কাণ্ড করলেন। রসগোল্লা দু'টো যেমন বাটি চাপা দেওয়া থাকে, তারই পাশে একটা জাঁতিকল পেতে রাখলেন। যে-ই হোক রাত্রির অন্ধকারে যে চুরি করতে আসবে, তার আর রক্ষে নেই। রসগোল্লার ঢাকা খুলতে গেলেই ওই জাঁতিকলে ধরা পড়বে। সমস্ত ঠিক্‌ঠাক্ রেখে সবাই উদগ্রীব আগ্রহ নিয়ে শুতে গেলেন।

তখন রাত তিনটে কি চারটে···

—বাপ রে বাপ, মর গিয়া, জান্ গিয়া···জান্ গিয়া···

একটা বিকট চিৎকারে সবাই দৌড়ে এসেছে। মামাবাবু জেগেই ছিলেন। তিনি এসেই জানলার ভেতর থেকে জাঁতিকলটা চেপে ধরলেন! জাঁতিকলে একটা বিরাট পাহারাওয়ালা ধরা পড়েছে ইয়া গোঁফ, ইয়া লাল পাগড়ি, ইয়া বুকের ছাতি তার! ছ'ফুট লম্বা একটা পাহারাওয়ালা জানলার বাইরে যন্ত্রণায় লাফাচ্ছে, চীৎকার করছে···বাপ রে···মর গিয়া, জান গিয়া···জান গিয়া···

কিন্তু মামাবাবু এমন জোরে ধরে আছেন জাঁতিকলটা যে পাহারাওয়ালাটা কিছুতেই হাত বার করে নিতে পারছে না। আর যন্ত্রণা! জাঁতিকলের দাঁতগুলো হাতের আঙুলগুলোকে আর হাতের পাতাটা একেবারে কামড়ে ধরেছে। বাড়িসুদ্ধ লোক একেবারে তাজ্জব। খল্‌সে পুঁটি নয়, একেবারে বিরাট তিমি! এমন তো ভাবা যায় নি।

সেই রাত তিনটের সময় পাড়াসুদ্ধ লোক ভিড় করে এলো আমাদের বাড়ির সামনে। তারাও অবাক! সবাই বললে—বেশ জব্দ, ঠিক হয়েছে—

মামা পরদিন কোর্টে গিয়ে দিলেন এক কেস ঠুকে। কিন্তু তক্ষুণি হাস-পাতালে নিয়ে যেতে হলো পাহারাওয়ালাটাকে। আঙুলগুলো ডাক্তার কেটে বাদ দিয়ে দিলে। যে আঙুলগুলো দিয়ে রসগোল্লা চুরি করতো রোজ, তা চিরদিনের মত বাতিল হয়ে গেল।

আমার জীবনের প্রথম কবিতা তাই লিখেছিলুম পাহারাওয়ালাকে নিয়ে।

ট্রাম রাস্তার ধারেই বাড়ি। দক্ষিণদিকে ট্রামটা সোজা চলে গেছে। খুকু রেলিঙের ফাঁক দিয়ে অনেক দূর দেখতে পায়। দুপুরবেলা ট্রামগুলো ফাঁকা-ফাঁকা চলেছে। ওরই একটাতে চড়লে অনেক দূর যাওয়া যায়। দাদা গেছে অফিসে। শশধর তখন নিচের কলতলায় বাসন মাজছে। চুপি-চুপি খুকু একটা ভাল ফ্রক পরে নিলে।

দোতলার সিঁড়ির দরজাটা খোলা ছিল। পা টিপে-টিপে খুকু নিচে নেমে এসেছে। শশধর টের পেলে এখুনি ধরে ফেলবে। দূর থেকে খুকু উঁকি মেরে দেখলে শশধর আপন মনে তখন নিজের কাজ করছে। একটু আড়াল দিয়ে টপ্ করে বেরিয়ে পড়ল খুকু। সদর দরজায় খুট করে একটু আওয়াজ হতেই শশধর চীৎকার করে উঠেছে—কে?

শশধরের গলার আওয়াজ পেয়েই খুকু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

শশধর কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয়। কাজ ফেলে রেখে দৌড়ে এসে খুকুকে দেখেই অবাক হয়ে বললে—কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি—

শশধর একটা হাত ধরে খুকুকে টেনে নিয়ে এসেছে ঘরের মধ্যে।

এক ধমক দিয়ে শশধর বললে—বার-বার না তোমার বলেছি, কোথাও বেরুবে না, দাঁড়াও, আজ বাবু এলে বলে দেবো।

শশধর ধমকই দেয় শুধু, সত্যি-সত্যি কিন্তু বাবাকে বলে দেয় না। দরজা বন্ধ করে শশধর খুকুকে ওপরে নিয়ে এসে বলে—থাকো এইখানে, যদি ঘর থেকে বেরোও তো তোমার পা ভেঙে দেব বলে রাখছি—

ঘরের মধ্যে খুকুকে রেখে দিয়ে শশধর আবার নিজের কাজে চলে যায়। বিছানায় গিয়ে খানিকক্ষণ শোয় খুকু ; তারপর আবার ওঠে। বড় আলমারির নিচে পুতুলের বাক্স সাজানো থাকে। পুতুলগুলোর জামা করে দিয়েছিল মা। একটা পুতুলকে নিয়ে খুব ধমক দিলে—তোমায় না বলেছি যে, খালি গায়ে মোটেই থাকবে না—পরো জামা।

পুতুলগুলোকে জামা পরিয়ে দিলে খুকু। সাজিয়ে-সাজিয়ে রাখলে পুতুলগুলোকে বাক্সের ভেতর। কিন্তু পুতুলখেলা বেশীক্ষণ ভাল লাগে না। শশধরটা ভারি পাজি! মোটে বাইরে বেরুতে দেবে না। একটু বাইরে বেরুতে দেখলেই ধরে নিয়ে আসবে। খুকুর মনে হয়—সে যখন বড় হবে, শশধরের চেয়ে অনেক বড় হবে, তখন সে শশধরকেও ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘরে পুরে রেখে দেবে। সন্ধ্যেবেলা বাবা বাড়ি আসে, যার নাম সাতটা। বাবা এসে নিচেয় থাকে। বন্ধুরা আসে, মক্কেলরা আসে, তাদের সঙ্গে গল্প করে। খুকুর মোটে ভাল লাগে না। ওই লোকগুলোকে একদম দেখতে পারে না খুকু।

রাস্তা দিয়ে ঠুন-ঠুন করে একটা রিক্শা যায়। খুকু ডাকে—ও রিক্শাওয়ালা।

রিক্‌শাওয়ালা দাঁড়িয়ে পড়ে। বলে—কী খুকু, কে যাবে?

—আমি যাবো, আমায় নিয়ে যাবে?

—পয়সা আছে?—রিক্‌শাওয়ালা জিগ্যেস করে।

—বাবার কাছে পয়সা আছে, অফিস থেকে এসে বাবা দেবে—বলে খুকু।

রিক্‌শাওয়ালা সময় নষ্ট করবার লোক নয়। ঠুন-ঠুন করতে-করতে চলে যায়। বাবার কাছে কতদিন পয়সা চেয়েছে খুকু। বাবা পয়সা দিতে চায় না। পয়সা থাকলে একদিন লুকিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে রিক্‌শায় চড়ে অনেক দূর চলে যেত। ওই রাস্তার মোড়ে যে দেবদারু গাছটা আছে, ওটা ছাড়িয়ে একটা বড় দোতলা বাড়ির যে চুড়োটা দেখা যায়, সেটাও ছাড়িয়েও অনেক··· অনেক···দূর।

রাস্তা দিয়ে সাইকেল চড়ে একটা লোক যাচ্ছে। খুকু ডাকলে—ও সাইকেলওয়ালা।

লোকটা ভ্যাব্যাচাকা খেয়ে সাইকেল থেকে নেমে পড়ে। ওপরের দিকে চেয়ে দেখে একটা পাঁচ-ছ' বছরের ফুটফুটে মেয়ে দোতলার বারান্দা থেকে ডাকছে! ও সাইকেলওয়ালা, আমাকে সাইকেল চড়াবে?

ভদ্রলোক তো অবাক! তবু জিগ্যেস করে—কোথায় যাবে খুকি? খুকু বললে—ওই যে দেবদারু গাছটা দেখছো রাস্তার মোড়ে, ওটা ছাড়িয়ে ওখানে একটা দোতলা বাড়ির চুড়ো দেখা যাচ্ছে, সেটাও ছাড়িয়ে অনেক দূর——অনেক দূর—নিয়ে যাবে?

লোকটা হয়তো কোনও জরুরী কাজে যাচ্ছিল। একবার একটু হেসে অবাক হয়ে সাইকেল চড়ে যেদিকে যাচ্ছিল, সেদিকে চলে গেল।

খুকু হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কেউ তাকে অনেক দূরে নিয়ে যাবে না। ভারি রাগ হয় সকলের ওপর। বাবা, শশধর কেউ ভালো নয়। সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে পুতুলগুলোর ওপর। বড় খোকা-পুতুলটাকে মেঝের ওপর দড়াম করে আছাড় মেরে ফেলে দেয়। সব ভেঙে যাক, দরকার নেই কিছুতে। তারপর আবার মায়া হয় বুঝি। পুতুলের ভাঙা টুকরোগুলো আবার কুড়িয়ে রাখে। মা'র তৈরী করা পুতুলের জামাগুলো গুছিয়ে পাট করে রাখে। তারপর আবার খেলা করতে-করতে মেঝের ওপর ঘুমিয়ে পড়ে খুকু, টের পায় না কেউ।

শশধর বিকেলবেলা দুধ আর খাবার নিয়ে এসে ডেকে তোলে।

সেদিন কিন্তু একটা ভারী সুযোগ পাওয়া গেল। শশধর নিজের কাজ শেষ করে সিঁড়ির কাছে মাদুর পেতে শুয়ে পড়েছিল। পা টিপে-টিপে খুকু নিচেয় নেমে এসেছে। তারপর আরও চুপি-চুপি খিলটা খুলে বাইরে বেরিয়ে পড়েছে। এক ছুট্-ছুট্-ছুট্! শশধর টের পেলেই এখুনি ধরে নিয়ে গিয়ে ঘরে পুরে বন্ধ করে রাখবে!

ট্রামগুলো যেখানে থামে, সেখানে এসে একদল লোকের আড়ালে লুকিয়ে রইল খুকু। ট্রাম আসতেই মানুষের ওঠা-নামার খুব হিড়িক। ট্রামে ওঠা যায় কি সহজে! বুড়ো লোকগুলো তাকে ঠেলে-ঠেলে আগে উঠতে যাবে। শেষকালে একটা লোকের কোঁচার খুঁট ধরে এক ফাঁকে উঠে পড়ে খুকু বললে—সরো, সরো তো—

অনেক লোকের ভিড়ের মধ্যে ছোট মেয়ের পক্ষে লুকিয়ে থাকা ভারি সহজ কিন্তু। কেউ দেখতে পাচ্ছে না তাকে। তা-ছাড়া কিছু ধরবারও দরকার নেই। চারিদিকেই লোক, পড়ে যাবার ভয় নেই। বুকটা তখনও দুরদুর করছে ভয়ে। ট্রামটা যখন চলতে আরম্ভ করলো, তখন ভয়টা কিছু কাটলো খুকুর।

একটু ফাঁক দিয়ে খুকু চেয়ে দেখে—খুব জোরে চলেছে ট্রামটা দক্ষিণ দিকে। ঠিক যেদিকে সে যেতে চেয়েছিল, সেইদিকেই চলেছে। রাস্তার মোড়ের বড় দেবদারু গাছটা পেরিয়ে গেছে, তারপর সেই অনেক দূরে যে দোতলা বাড়িটার চুড়ো দেখা যায়, সেটার কাছেও এসেছে। তারপর সেটাও ছাড়িয়ে গেল। ট্রাম ছুটেই চলেছে। এ-দিকটা মোটে চেনে না খুকু! আরও অচেনা। ক্রমেই একেবারে অচেনা জায়গার জালে জড়িয়ে গেল খুকুর দৃষ্টি। এখানেও নয়। এখনও অনেক দূর। অনেক-অনেক দূর যেতে হবে তাকে। জায়গায়-জায়গায় মোটরের সঙ্গেও পাল্লা দিয়ে চলেছে ট্রামটা। ছু'-একটা রিক্শা। রিক্শাওয়ালারও পেছনে পড়ে রইল। রিক্শায় কী আর এতদূর সে আসতে পারতো ?

—ও খুকু, এখানে বসবে এসো—দাড়িওয়ালা একটা লোক ডাকলে।

খুকু চেয়ে দেখলে লোকটার মুখখানা একেবারে দাড়ি-গোঁফের আড়ালে ঢেকে গেছে। একটু ভয় হলো তার। তবু দ্বিধা না করে লোকটার পাশে বসলে। সারা ট্রামে লোক ভর্তি, লোকটা দয়া করে তাকেই বসতে দিয়েছে। বসে একটু আরাম হলো তার। এখানেও নয়। আরো দূরে—অনেক দূরে তাকে যেতে হবে। বিকেল হয়ে আসছে। শশধর এখুনি তাকে ছুধ আর খাবার খাওয়াতে ঘরে আসবে। এসে দেখবে—খুকু নেই। ভারি মজা। যেমন পাজী শশধরটা, তেমনি জব্দ।

হু-হু শব্দে ট্রাম চলছে। চলতে-চলতে এক এক জায়গায় এসে থামে, কিছু লোক নামে, আবার কিছু লোক ওঠে। ভিড় আর কমে না। খুকু জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে দেখলে—এ একেবারে আজব জায়গা। রাস্তাটা এখানে সরু হয়ে এসেছে। ছু'পাশে অনেক টিনের চালা। লুঙ্গী-পরা সব লোক। এখানেও নয়। একেবারে অনেক দূরে যেতে হবে তাকে। রাস্তার মোড়ের সেই দেবদারু গাছটা কখন পেরিয়ে এসেছে, সেই দোতলা বাড়ির চুড়োটাও ছাড়িয়ে এসেছে। এবার যেন মনে হচ্ছে, সে বাড়ি ছেড়ে অনেক দূরে চলে এসেছে।

—টিকিট ?

খাকি পোশাক-পরা কণ্ডাক্টার এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। পয়সা নেয় আর টিকিট দেয় লোকটা।

শুধু সবাইকে বল ছ—আপনার টিকিট ?

যে-যার পকেট থেকে পয়সা বার করছে আর দিচ্ছে, তার বদলে কণ্ডাক্টারটা টিকিট দিচ্ছে !

—খুকি তোমার টিকিট ?—তার দিকে হাত বাড়ালে কণ্ডাক্টারটা।

খুকু মনে-মনে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু বাইরে গম্ভীর ভাব দেখিয়ে বললে—টিকিট আমার দরকার নেই—

উত্তর শুনে আশেপাশের লোকগুলো তার দিকে চাইলে।

কণ্ডাক্টারটা কিন্তু বড় একরোখা। আরো অনেক লোক রয়েছে, তাদের টিকিট নাও না বাপু ! কতটুকুই বা জায়গা সে নিয়েছে তোমাদের। সে তো এতটুকু মেয়ে। কতই বা ভারী হবে। তোমাদের ট্রাম তো এমনিই চালাতে হতো ! আমি না উঠলেও চালাতে, উঠলেও চালাচ্ছো। ধরে নাও না, আমি উঠি নি। তা ছাড়া অর্ধেক রাস্তা তো সে দাঁড়িয়েই এসেছে।

—তোমার সঙ্গে কে আছে ?

—কে আবার সঙ্গে থাকবে, আমি তো একলা—

—তা'হলে পয়সা দাও—

—পয়সা আমার কাছে থাকলে তবে তো দেব, বাবা কি আমাকে পয়সা দেয় ?

লোকটা নাছোড়বান্দা। বললে—ভারি মজা তো ! যাবে কোথায় খুকি ?

খুকু গম্ভীর চালে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললে— সে অনেক দূর—

চারিদিকে সবাই জানলো, সকলের কৌতুহলী দৃষ্টি পড়লো খুকুর ওপর।

—খুকি, তোমার বাড়ী কোথায় ?

—বাবার নাম কী জানো ?

অসংখ্য সব প্রশ্ন এসে ঘিরে ফেললে তাকে। সবাই যেন একযোগে তাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। সবাই যেন পরোপকার করতে ব্যস্ত একেবারে। একটা কথারও জবাব না দিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চেয়ে রইল খুকু। কারোর কথার সে উত্তর দেবে না। একজন বড় বেশী রকমের নাছোড়বান্দা লোক ছিল। সে-লোকটা নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে এসে তার সামনে নিচু হয়ে জিজ্ঞেস করলে—বাড়ি কোথায় তোমার বলো তো খুকী ?

খুকু রেগে গেল। বললে—হ্যাঁ, বাড়ির ঠিকানা বলে দিই, আর তুমি

শশধরকে গিয়ে বলে দাও—

হাসির রোল উঠলো আর এক তোড়। কেউ-কেউ অবাকও হলো। মেয়েটা তো কম নয়। এতটুকু মেয়ের খুবক্যাঁটকেটে কথা তো! বেশ পাকা মেয়ে! যা হোক, নিশ্চয় বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে মেয়েটা। ও আর দেখতে হবে না। কালে-কালে হলো কী। আজকাল ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা বাড়ি থেকে পালাতে শিখেছে! এতক্ষণে পাশের দাড়িওয়ালা লোকটা কথা বলে উঠলো—

—ও তুমি বুঝি শশধর বাবুর মেয়ে! কী আশ্চর্য! তাই বলি মুখটা চেনা-চেনা ঠেকছে, আরে মশাই এ যে আমার পাশের বাড়ির লোক—ইস্, এতক্ষণ শশধরবাবু বোধহয় ভেবে-ভেবে অস্থির হচ্ছেন—কী আশ্চর্য—

—চেনেন নাকি আপনি?

—শশধরবাবুকে চিনিনে মশাই? পাড়া প্রতিবেশী লোক, চল্লিশ বছর পাশাপাশি বাস করছি আর চিনতে পারবো না—চলো, সব কাজ আমার পড়ে থাক, চলো তোমাকে আগে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি, কী গোল—

দাড়িওয়ালা লোকটি দাঁড়িয়ে উঠে বললে—এসো, আমার হাত ধর, তোমার বাবার হাতে জিম্মা দিয়ে তবে আমার অন্য কাজ—

খুকু কিছুতেই যাবে না। বলে—কে বললে আমার বাবার নাম শশধরবাবু! শশধর তো আমাদের চাকরের নাম—

—এই বয়েসেই এত মিথ্যে কথা শিখেছো মা, কী হয়েছে খুলে বলো তো, মা বুঝি খুব মেরেছে? তাই রাগ করে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছ! তা কিছু ভয় নেই, আমি শশধরবাবুকে গিয়ে বলে দেব'খন, তোমায় যেন না বকে—এস খুকি, এস—

ট্রামসুদ্ধ সব লোক অভয় দিলে—যাও না খুকী, যাও, বাড়ি যাও। বাড়ির ওপর রাগ করতে আছে? তোমার বাবা কিছু বলবে না,—যাও—

একরকম জোর করেই ট্রামসুদ্ধ লোক খুকুকে ধরে ট্রাম থেকে নামিয়ে দিলে! দাড়িওয়ালা লোকটাকে দেখে খুকুর যেন কেমন ভয় করতে লাগলো।

—আমি যাবো না তোমার সঙ্গে—

—এসো, লক্ষ্মীটি, গোল করো না—

বলে দাড়িওয়ালা লোকটা তাকে কোলে তুলে নিলে।

—আমি কামড়ে দেব তোমার হাতে—

—না-না, আমি তোমায় কত কী দেব, লেবেঞ্চুস কিনে দেব, অনেক পয়সা দেব—বললে দাড়িওয়ালা লোকটা। পয়সার কথাটা শুনে শান্ত হলো খুকু! তার যদি অনেক পয়সা থাকতো, তা'হলে এমন করে জোর করে তাকে ট্রাম থেকে নামিয়ে দিত না। পয়সা থাকলে রোজ সে অনেক দূরে যেতো।

দাড়িওয়ালা লোকটা তাকে কোলে করে নিয়ে অনেক দূর চলতে লাগলো। তারপর একটা গলির ভেতর এসে একটা বাড়িতে কড়া নাড়তে লাগলো। কেমন বিশ্রী নোংরা জায়গাটা! দাড়িওয়ালা লোকটা চীৎকার করে ডাকলে—ও সেরাজু, সেরাজু দরজা খোল—

দরজা খুলে দিল একজন মেয়েমানুষ। তার চেহারা দেখে আরো ভয় হলো খুকুর। এ তাকে কোথায় নিয়ে এসেছে লোকটা!

সেরাজু বললে—এ কে গা?

—চুপ কর্—মুখে আঙ্গুল দিয়ে ইঙ্গিত করলে দাড়িওয়ালা লোকটি!

ভেতরে গিয়ে তক্তাপোশের ওপর বসিয়ে দিলে খুকুকে। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। রান্নাঘরের ধোঁয়া আসছে চারদিকে থেকে। দম আটকে আসছে খুকুর। সে কাশতে লাগল। এতক্ষণ বোধহয় তার বাবা অফিস থেকে এসে গেছে। শশধর হয়ত খুঁজতে বেরিয়েছে তাকে।

—কিছু খাবে খুকি? খিদে পেয়েছে?

দাড়িওয়ালা লোকটা জিজ্ঞেস করলে।

—আমি কিছু খাবো না, আমায় পয়সা দেবে বলেছিলে, পয়সা দাও—বললে খুকু।

—দেবো'খন পয়সা—

—না আগে দাও, নইলে চেঁচাবো—

দিতেই হলো পয়সা। দাড়িওয়ালা লোকটা ব্যাগ থেকে একটা ফুটো পয়সা দিলে খুকুকে। খুকুর আর ভাবনা নেই। এবার সে ট্রামে উঠে বুক ফুলিয়ে টিকিট চাইতে পারবে। আর নয়তো রিক্‌শায় চড়বে। যেখানে অনেক দূরে—ট্রাম চড়ে সে সেখানেই যাবে।

তাকে বসিয়ে রেখে দাড়িওয়ালা লোকটা দরজায় ভালো করে খিল লাগিয়ে দিলে। ভেতরে যেতেই সেরাজু বললে—কী মতলব গা তোমার?

লোকটা বললে—মতলব কিছু টাকা পেটবার, আর কিছু নয়, মেয়েটাকে

চুরিও করবো না, বেচবেও না—

—না বেচলে কে তোমায় টাকা দেবে, এই এক ফোঁটা মেয়ের রূপ দেখে?

দাড়িওয়ালা লোকটা বললে—রূপ দেখে টাকা দেবে কেন? চেহারা দেখে বুঝেছো না ও মেয়ে খুব বড়লোকের ঘরের মেয়ে? দু'-চার দিন ওকে এখানে লুকিয়ে রাখি, তারপর ওর বাবা কাগজে বিজ্ঞাপন দেবেই। মেয়েকে যে ফিরিয়ে দিতে পারবে, তাকে মোটা টাকাও দেবে, হাজার না দিক পাঁচশো, কী দু'শোও তো দেবে—মোফত্ আসছে টাকাটা—

—ও এক রকম চুরিই তো—সেরাজু বললে।

দাড়িওয়ালা বললে—তা চুরি না করে বড়লোক হয়েছে কেউ দুনিয়ায় দেখেছ?

—তা যা হোক ওর খাওয়ার, শোয়ার একটা ব্যবস্থা করে দাও দিকি—

বলে দাড়িওয়ালা লোকটা ওঘরে ঢুকে দেখে মেয়েটা নেই। এই তো তক্তপোষের ওপর বসিয়ে রেখে গিয়েছিল! পালালো নাকি? দরজার খিলটা খোলা। নিশ্চয়ই পালিয়েছে। দাড়িওয়ালা লোকটা দরজা পেরিয়ে রাস্তায় এসে এদিক-ওদিক চেয়ে দেখলে। কোথাও নেই। গেল কোথায়?

খুকু তখন রাস্তায় ছুটছে। ছুট, ছুট, ছুট। সকালবেলা শশধরের হাত থেকে পালাবার সময় যেমন ছুটেছিল।

চারদিকে অন্ধকার করে এসেছে। দু'-চারটে আশেপাশের দোকানে আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে। খুকুর তখন কোনও দিকে খেয়াল নেই।

বড় রাস্তার ওপর এসে একটা রিক্‌শা পাওয়া গেল। খুকু টপ্ করে রিক্‌শায় উঠে বসে বলে—চলো শিগগির—

—কোথায় যাবে?—জিগ্যেস করলে রিক্‌শাওয়ালাটা।

এতটুকু এক সোয়ারীকে দেখে রিক্‌শাওয়ালা প্রথমে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল তবু রিক্‌শাটা টানতে-টানতে নিয়ে চলল। খুকু বললে—শিগগির—

সত্যি-সত্যি রিক্‌শাওয়ালাটা জোরেই চলতে লাগলো। ঠুন-ঠুন করে ঘন্টা বাজিয়ে তালে-তালে চলেছে। অনেক দূর যেতে হবে তাকে এবার। এবার আর কারুর সঙ্গে সে কোথাও যাবে না। তার কাছে পয়সা আছে—তার ভাবনা কী। আজ আর খুকু বাড়ি ফিরছে না! অনেকদিন পরে সে সুযোগ পেয়েছে। আজ সে সোজা গিয়ে অনেক দূরে যাবে। বেশ অন্ধকার

ঘনিয়ে এল। রাত্তিরও হচ্ছে। এদিকটায় রাস্তার দু'পাশে ব্যাঙ ডাকছে। ছোট-ছোট দোকান। কেরোসিন তেলের আলো।

রিক্শাওয়ালাটা ভেবেছিল, ছোট মেয়েটি বোধহয় রিক্শা ডাকতে এসেছিল। বাড়ি থেকে বাবা-মা কেউ যাবে। কিন্তু এখন দেখছে যে সোজা চলেছেই সে। একটা রাস্তার মোড়ে এসে থেমে রিক্শাওয়ালা বললে—কোন্ দিকে যাবে খুকি ?

—ওই দিকে—আরো দক্ষিণ দিকে দেখিয়ে দেয় খুকু।

খুকু রিক্শার ওপরে আরাম করে হেলান দিয়ে বসে আছে। বেশ নিশ্চিন্ত আরামের ভাব তার মুখে। আর এক চৌমাথার কাছে আসতেই রিক্শাওয়ালা আবার থেমে গিয়ে বললে—কোথায় যাবে খুকী ?

খুকু বললে—অনেক দূর—

—অনেক দূর কোথায় ?

খুকু বললে—নাম জানি না, কিন্তু সে এখনও অনেক দূর। আমাদের বাড়ি থেকে রাস্তার মোড়ে যে দেবদারু গাছটা দেখা যায়, সেটা পেরিয়ে বড় দোতলা বাড়িটার চুড়ো ছাড়িয়ে আরো অনেক···অনেক···অনেক দূর···

এবার রিক্শাওয়ালার সত্যিই সন্দেহ হলো। মেয়েটার মাথা খারাপ নাকি ! বললে—পয়সা আছে তো তোমার কাছে ?

খুকু বললে—নিশ্চয় আছে, এই নাও—বলে একটা ফুটো পয়সা রিক্শাওয়ালার হাতে দিলে।

রিক্শাওয়ালা এবার বুঝে নিয়েছে ব্যাপারটা ! মুখে কিছু বললে না। একটা পুলিশ দাঁড়িয়েছিল, সোজা সেখানে গেল। রিক্শাওয়ালা বললে—সিপাইজী, এই মেয়েটি এতক্ষণ আমার রিক্শায় চেপেছে, এখন পয়সা চাইতে এই একটা ফুটো পয়সা দিচ্ছে—

—ওর বাড়ি কোথায় ? সেপাই জিগ্যেস করলে।

—কে জানে কোথায় বাড়ি ! খুকি তোমার বাড়ী কোথায় ?

—হ্যাঁ, বাড়ির ঠিকানা বলি, আর তোমরা শশধরকে গিয়ে বলে দাও—অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইল খুকু।

কিছুটা আন্দাজ করলে সিপাইজী। বললে—চলো, থানায় চলো—রিক্শাওয়ালা খুকুকে রিক্শায় বসিয়ে নিয়ে চললো সেপাইজীর পেছনে-

পেছনে। থানায় ইন্স্‌পেক্টারবাবু বসেছিলেন। সেপাই আর রিক্‌শাওয়ালার কোলে সেই মেয়েটিকে দেখেই আর কথাবার্তা বললেন না। টেলিফোনে মুখ রেখে বললেন —কে, মিস্টার চৌধুরী ? আমি টালিগঞ্জ থানা থেকে বলছি —পেয়ে গেছি মশাই আপনার মেয়েকে, এই এখুনি আমার সেপাই নিয়ে এল—আপনি এখুনি চলে আসুন—এখুনি।

খুকু চুপ করে এতক্ষণ কথাগুলো শুনছিল। তার বাবার সঙ্গে কথা কইছে নাকি ! এবার হয়ত ধরে ফেলবে তাকে। কোল থেকে নামবার চেষ্টা করলে—বললে—নামিয়ে দাও আমাকে, আমি চলে যাবো—

ইন্সপেক্টরবাবু বললেন—গোল করো না, চুপ করে থাকো, এখুনি তোমার বাবা আসছে—

* * *

অনেক রাত হয়েছে তখন। বিছানায় বাবার পাশে শুয়ে আছে খুকু। অন্ধকার ঘর। খুকু ডাকলে—বাবা, ও বাবা, ঘুমিয়ে পড়লে ?

—কী বলছো খুকু—

—মা কোথায় গেছে বলো না—

—সে তো তোমায় বলেছি, অনেক দূরে, অনেক…অনেক…অনেক দূরে …ওই দেবদারু গাছটা পেরিয়ে, বড় দোতলা বাড়ির চুড়োটা ছাড়িয়ে আরো অনেক দূরে…

—আজকে তো আমি অনেক দূরে গিয়েছিলুম ট্রামে চড়ে, রিক্‌শায় চড়ে অনেক—অনেক দূরে—কিন্তু মা তো নেই—

—মা আসবে এখন, তুমি এখন ঘুমোও তো—বাবা বললে।

তারপর আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ। অন্ধকার ঘরের ভেতরে উস্‌খুস করতে লাগল খুকু। খুকু জিগ্যেস করলে—একটা পয়সা দেবে বাবা ?

—পয়সা কী করবে ?

—পয়সা দিয়ে আর একটা মা কিনবো—

বাবা কোনও উত্তর দিলে না। অন্ততঃ কথাটা শুনে বাবা হাসলে না গম্ভীর হয়ে গেল, অন্ধকারে খুকু তা দেখতেও পেলে না।
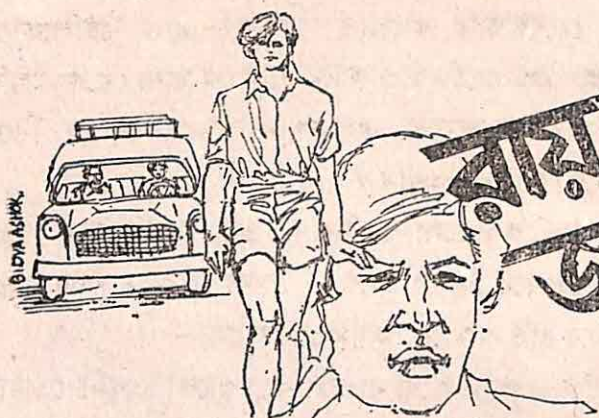
আরো উঁচুতে চোখ চাইলে দেখা যায়, কেবল গোটাকতক ঘুড়ি উড়ছে—লাল সবুজ আর রংবেরং-এর ঘুড়ি। অরকিড্, পাম আর দেবদারুর সারি ছাড়িয়ে যেদিক থেকে আসে ট্রামের ঘণ্টার আওয়াজ, বাসের ঘর্ঘর শব্দ—সেদিকে সেদিন সব বাড়িতে দেওয়ালির মত আলো দিয়ে সাজিয়ে ছিল। মোম-বাতির সারি টিপটিপ করে জ্বলছিল —কী চমৎকার দেখতে যে হয়েছিল। কালীপুজোর দিনই অমন করে লোকে সাজায়। দাদুকে জিগ্যেস করছিল। মাকে জিজ্ঞেস করেছিল—হ্যাঁ মা, ওরা অত আলো দিয়েছে কেন?

কেউ উত্তর দেয় নি। রঘুটা চালাক আছে। খুব চুপি-চুপি জয়ন্তকে বলেছিল—আজ যে তেইশে জানুয়ারী—নেতাজীর জন্মদিন, তা জানো না?

—নেতাজী কে? জয়ন্ত জিজ্ঞেস করেছিল।

কিন্তু রঘুটা চালাক খুব। ওদিকের হলঘর থেকে দাদুর চটির আওয়াজ পেতেই রঘু গম্ভীর হয়ে পালিয়ে গিয়েছিল।

জয়ন্ত বিরাট বাগানের ভেতরে বেঞ্চিতে গিয়ে বসে। সবুজ ঘাসের নরম বিছানা পাতা—তারই চারপাশে সিজন ফ্লাওয়ারের বেড উঁচু কম্পাউণ্ড ওয়ালের ধার ঘেঁষে দেবদারু আর ইউক্যালিপটাস্ গাছের সারি। জয়ন্ত বাইরের দিকে চেয়ে দেখলে। শুধু অফুরন্ত আকাশ, দু'-একটা ঘুড়ি আর একটা-দু'টো বাদুড় ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু পশ্চিম দিকের কোণ থেকে যেন অনেক শব্দ ভেসে আসছে। অনেক লোকের সমবেত চিৎকার! সমস্ত বাড়িটা নিস্তব্ধ।

এতক্ষণ পিয়ানোর টিচার এসে মা'কে বাজনা শেখাতে শুরু করেছে, দাদু বসে আছেন তাঁর লাইব্রেরীতে, আর বাবাতো একটু আগেই পুরানো গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে গেছেন কোথায়, কেউ জানে না—ডিনারের আগে ফিরে আসবেন আবার।

এখন এই বিকেলবেলা কনভেণ্ট স্কুল থেকে এসে জয়ন্ত কী যে করবে, তা ভেবে পেলে না। ছড়িটা নিয়ে সিজন্ ফ্লাওয়ারের বেডটা একটু খুঁচিয়ে দেওয়া, কিম্বা পশ্চিম দিকের বারান্দার কাছে গিয়ে লাল-নীল মাছের খেলা দেখা, কিম্বা কাকাতুয়াটাকে একটু রাগিয়ে দেওয়া—এ ছাড়া আর করবে কী জয়ন্ত।

ওদিকের গ্যারেজ থেকে নতুন গাড়িটা বেরুচ্ছে—পাঠক চালিয়ে আনছে—

—কোথায় যাচ্ছো পাঠক, আমি যাবো—জয়ন্ত বললে।

পাঠক বলে—সাহেবের হুকুম পেলে, সে খোকাবাবুকে নিয়ে যেতে পারে!

দাদু লাইব্রেরিতে বসেছিলেন। বললেন—গাড়িটা একবার কারখানায় যাবে, তা সঙ্গে যাবে যাও, কিন্তু 'ওয়েল কভার্ড' হয়ে যাও, সর্দি লাগতে পারে—চুপ করে গাড়িতে বসে থাকবে—আজকাল বড্ড হট্টগোল চলেছে কলকাতায়—

পাঠকের পাশে বসে পড়ল জয়ন্ত। বাগান পার হয়ে গেট পেরিয়ে গাড়ি গিয়ে পড়ল রাস্তায়। এ রাস্তায় লোকজন কম। বড়-বড় ঝাউ, আর কৃষ্ণচুড়া গাছে রাস্তাটা ঢাকা। পরিস্কার পিচের রাস্তার ওপর গাড়ির চাকাগুলো পিছলে পড়ছে। তারপর গাড়ি এসে পড়ল ট্রাম রাস্তায়।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে আসছে। জয়ন্ত দু'পাশের চলন্ত জনতা, দোকানপাট, ঘরবাড়ি, হোটেল, সিনেমা উন্মুখ হয়ে দেখতে লাগলো। এখানে থাকলে যেন বেঁচে আছি বোঝা যায়। কারুর গায়ে জামা আছে, কারুর নেই। ওদের নিশ্চয়ই খুব সর্দি হয়! খালি গায়ে বেড়াচ্ছে ওরা—ওদের দাদুরা নিশ্চয়ই বকে! দাদুতো ডার্টি চেহারা দেখতেই পারেন না। তা ছাড়া দাদু বলবেন—নোংরা থাকলে, জুতো না পায়ে দিলে, গায়ে জামা না দিলে—কত রোগ হয়, একবার ঠিকমত হলে সে রোগ সারানো ভারী শক্ত।

হঠাৎ হৈ-চৈ-হট্টগোল যেন বেড়ে উঠলো! সামনে, আর একটু দূরেই

অনেক লোক জমা হয়েছে···চীৎকার করছে তারা। গাড়িটা কাছে যেতেই যেন বিরাট জন-সমুদ্র চঞ্চল হয়ে উঠলো। চীৎকার করে উঠলো সবাই। হাতে তাদের নানারকম ফ্ল্যাগ! অদ্ভুত তাদের ধ্বনি। চীৎকার করে বলছে—জয় হিন্দ্—

মিছিলের সামনে এসে গাড়িটা থামতেই তারা ছেঁকে ধরলো পাঠককে—

কে একজন বললে—ওরে, রায়বাহাদুর পি কে. সেনের গাড়ি—

কথাটা শোনাবার পর জনতা যেন আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। একটা লাঠি এসে সামনে পড়লো রাস্তার ওপর। পাঠক গাড়ির দরজা খুলে রাস্তায় নামলো। তারপর জয়ন্ত নামলো পেছনে-পেছনে। সে কী উত্তেজনা! জয়ন্তর মনে হলো, সে যেন সিনেমা দেখছে। মানুষের সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি দাঁড়িয়ে, মাথা উঁচু করে সে যেন যুদ্ধ করছে। সে যেন নেপোলিয়নের পদাতিক বাহিনীর একজন বীর সৈন্য—বর্মা আঁটা তার শরীরের চারিদিকে, অসংখ্য তীর আর বল্লম এসে বিঁধছে, কিন্তু অমিত-বিক্রমে সে যুদ্ধ করছে! কিম্বা সে যেন ক্যাসাবিয়ানকা, নিজে কর্তব্যের প্রেরণায় স্বেচ্ছায় জীবন বলি দিচ্ছে দাঁড়িয়ে, অথবা···

হঠাৎ দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো কাছে কোথাও···

জয়ন্ত দেখলে, আগুনের শিখায় কালো একজন মূর্তি কাদের লক্ষ্য করে ঢিল ছুঁড়ছে, কাদের ধ্বংস কামনা করে ধ্বনি তুলছে! এ এক অদ্ভুত নতুন অভিজ্ঞতা জয়ন্তর জীবনে! জয়ন্ত যেন এতদিনে সজীব হয়ে উঠল। তাদের সঙ্গে জয়ন্তও সুর মিলিয়ে চীৎকার করে উঠলো—জয়-হিন্দ—তারপর আগুন লক্ষ্য করে ঢিল ছুঁড়তে লাগলো। একেবারে আগুনের কাছে এগিয়ে যেতেই জয়ন্ত দেখলে সাদা টুপি পরা আরো অনেক ছেলে সেখানে দাঁড়িয়ে···যে ঢিল ছুঁড়ছে তাকে বাধা দিচ্ছে, বারণ করছে···তারপর যেন একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হতেই ছত্রভঙ্গ হলো সবাই। পেছনের লোকগুলো দৌড়তে শুরু করলো।

জয়ন্তর হঠাৎ যেন ঘুম ভেঙে গেল! এতক্ষণ সে যেন স্বপ্ন দেখছিল। পাঠক কোথায়? কোথায় সেই নতুন গাড়িটা তাদের? কিন্তু ওসব তখন ভাববার সময় নেই—আরো এগিয়ে যেতে হবে তাকে! যেখানে ঘটনার কেন্দ্র, সেইখানে গিয়ে দেখতে হবে কিসের এ-উৎসব! কিন্তু হঠাৎ কে যেন তার হাত ধরে টানলে—বললে—পালিয়ে আয় ছোট খোকা—

তারপর তাকে হিড়-হিড় করে টানতে-টানতে নিয়ে এল গলির ভেতর।

এসে বললে—ভাগ্যিস পালিয়ে এলুম—ওরা গুলি করতে শুরু করছে—

—কে গুলি করছে? কারা গুলি করছে? জয়ন্ত জিজ্ঞেস করলে।

গলার আওয়াজ শুনে সন্দেহ হতে ছেলেটা জিজ্ঞেস করলে—তুই কে?

জয়ন্ত বললে—আমার নাম জয়ন্ত সেন—

—তুই বুঝি কলুটোলার ছেলে?

রায় বাহাদুর পি. কে. সেন, তার ছেলে জয়ন্ত সেন, লাউডন স্ট্রীটে বাড়ি—এদিকে সে বেড়াতে এসেছিল মোটরে করে—এমন সময় হারিয়ে ফেলেছে রাস্তা, পাঠক তাদের সোফার। সমস্ত প্রকাশ করে বললে জয়ন্ত। ছেলেটা বললে—আমার নাম ফটিক, এ-পাড়ায় আমার নাম করলে সবাই চিনবে, আমি থাকতে তোমার কোন ভয় নেই, আমার ছোট ভাই মনে করে তোর হাত ধরে টেনেছিলাম···যা হোক—এটা আমাদের বাড়ি।

বলে ভেতরে নিয়ে গেল। ছোট্ট একতলা একটা বাড়ি, ভাঙা দেয়াল। দরজার সামনে এসে ফটিক কড়া নাড়তে লাগল—ভেল্টা-ভেল্টা—দরজা খোল—

গলার আওয়াজ পেয়ে ভেতরে অনেকগুলো গলার শব্দ শোনা গেল। চীৎকার উঠলো—দাদা এসেছে—

ফটিক বললে—ওই শোন, ওরা হলো আমার আজাদ হিন্দ্ ফৌজ, আমি ওদের নেতাজী। তারপর দরজা খুলতেই জয়ন্ত দেখলে, এক মজার কাণ্ড! যেন সবাই এতক্ষণ প্রতীক্ষা করছিল ফটিকের জন্যে। প্রায় সাতটা ভাই ফটিকের—তিনটে বোন। ফটিকের মা রাঁধছিলেন রান্নাঘরে। অচেনা ছেলে দেখে বেরিয়ে এলেন—ওমা, এ কেরে ফটিক—

ফটিক বললে—এ হলো জয়ন্ত সেন, আমার বন্ধু—আমার বাড়ি থাকবে আজ—রাস্তায় যা গণ্ডগোল—জয়ন্তর জন্যে একটু বেশী চাল নাও মা।

ফটিকের ছোট ভাই ছোটখোকা, তারপর ভেল্টু, পল্টু, মোনা, ক্ষেন্তি, পুঁটি ইত্যাদি সকলের নাম জয়ন্তের মনে রাখা শক্ত! সকলের সঙ্গে একসঙ্গে বসে গেল পড়তে! ফটিক নিজে পড়া বলে দেয়। জয়ন্তকে বললে—তুমিও পড়ো, এই 'সাহিত্য মুকুল' পড়ো—তারপর যেখানে মানে বুঝতে পারবে না, আমি বলে দেব—

ক্ষেন্তি বলে—দাদা, খিদে পেয়েছে—

ফটিক অবাক্ হ'য়ে বললে—অ্যাঁ, খিদে? এর মধ্যে? এই তো বিকেল

বেলা একবাটি মুড়ি খেয়েছিস—

ক্ষেন্তি লজ্জায় পড়ে গেল। ফটিক বললে—আচ্ছা জয়ন্তই বলুক, তুমি বলতো ভাই, দেখলে বিকেলবেলা আমরা সবাই একবাটি করে মুড়ি খেয়েছি কাঁচা লঙ্কা দিয়ে, তারপর দু'-ঘটি জল—এর পর এখনও তিন ঘণ্টা হয় নি, এর মধ্যে খিদে পাওয়া উচিত ?

জয়ন্ত কী বলবে ভেবে পেলনা। জয়ন্ত নিজে কী খেয়েছে ভেবে দেখল। দাদু আর মা'র সঙ্গে বসে এক টেবিলে তিনখানা স্যাণ্ড উইচ, দু'টো সিঙ্গাপুরী কলা, এক ডিস ওট্ স্ পরিজ আর এক কাপ কফি! এই তো এখন আটটা বাজে, এখুনি তো ডিনার শুরু, টেবিলে এসে জড়ো হবে সবাই, বাবা এতক্ষণে এসে রাত্রের স্নান সেরে নিয়েছেন! কিন্তু তবু জয়ন্তর এই বেশ লাগছে! এই ফটিক, এই ভেল্টু, এই ক্ষেন্তি, সবাইকে বেশ লাগছে জয়ন্তর।

ভাত দেওয়া হলো। ছেলেরা সব এক থালায় খেতে বসলো। ফটিক আর ছোটো খোকা শুধু আলাদা থালা পেলে। ফটিকের মা বললেন—তোমার জন্যে বাড়িতে তোমার মা ভাববেন না, জয়ন্ত ?

জয়ন্ত উত্তর দেবার আগেই ফটিক বললে—ভাববে কেন? সবাই তো আর তোমার মত নয়। ওরা কি আর আমাদের মতন? রায়-বাহাদুর পি. কে. সেনের বাড়ির ছেলে—ওরা ছেলেকে তোমার মত আঁচলে বেঁধে রাখে না। রবিঠাকুর লিখেছেন পড়োনি : "রেখেছ বাঙালী করে, মানুষ করোনি"—

জয়ন্ত ভালো করে চেয়ে দেখলে ফটিকের মা নিজের হাতে সকলকে পরিবেশন করছেন। আধময়লা শাড়িতে হলুদের দাগ লেগে—জয়ন্তদের বাড়ির ঝি এমনি শাড়ি পরে থাকে। কিন্তু তবু জয়ন্তর বেশ ভালো লাগলো। মোটা-মোটা চালের ভাত। রাত্রে কোনদিন ভাত খায়নি জয়ন্ত। খানকয়েক লুচি-মাংস আর পুডিং তার রাত্রের বরাদ্দ—রেফ্রিজারেটারে তৈরী থাকে।

পুঁটি থালা চাট্‌তে-চাট্‌তে বললে—আর দু'টি ভাত দেবে মা ?

ফটিক বললে—ওই দেখ মা, জয়ন্ত মোটে খাচ্ছে না, ওর লজ্জা হচ্ছে বোধহয়! আর দু'টো ভাত নাও না জয়ন্ত, ওই তোমার মাছ পড়ে রইল যে—

কাঁটাওয়ালা মাছ জয়ন্ত কোনোদিন খেতে পারে না। জয়ন্ত চেয়ে দেখলে কারুর থালায় আর মাছ পড়ে নেই।

খাওয়া তখনও শেষ হয় নি, মহেশবাবু অফিস থেকে এসে পড়লেন।

—ওই তো বাবা এসেছেন—চীৎকার করে উঠলো ছেলেরা।

মহেশবাবুকে দেখেই জয়ন্ত বলে উঠলো—মাস্টার মশাই !!!

মহেশবাবুও চমকে উঠেছেন—জয়ন্ত !

মহেশবাবুর হাতের বই খাতাপত্র আর রেশনের থলি সব সেখানেই পড়ে রইল। সব শুনে তো তিনি মাথায় হাত দিয়ে বসলেন; সর্বনাশের মাথায় পা ! হ্যাঁ-গা, তুমি কী ? ওই পুঁটি মাছের ঝোল আর পুঁইশাক চচ্চড়ি ওকে খাওয়ালে নাকি ! আরে ওকেই তো আমি অঙ্ক শেখাবার কাজ পেয়েছি—গড্ সেভ দি কিং— দু'শো টাকা মাসে-মাসে ! আরে ওসব খাওয়া ওদের অভ্যেস আছে কোনকালে ? এখন যদি শরীর খারাপ হয় ওর, তা'হলে আমার চাকরি থাকবে ভেবেছ ? এই ফটকে, তুই অত গা ঘেঁযে আছিস্ যে ওর—এসো বাবা জয়ন্ত···।

সেই রাত্রে লুচি ভাজিয়ে খাইয়ে তবে ছাড়লেন মহেশবাবু। কোথায় পরিষ্কার চাদর, বালিশ, বিছানা, মশারি—নতুন করে বেরোল সব। মহেশবাবু নিজের খাটে শোয়ালেন জয়ন্তকে। নিজে সকলকে নিয়ে ঠাণ্ডা মেঝেতে শোবার ব্যবস্থা করলেন। সারারাত্রি ঘুম আসবার কথা নয় তাঁর। আজ গণ্ডগোলের মধ্যে জয়ন্তকে তো বাড়ি পৌঁছে দেওয়া যায় না। কাল সকালেই ট্যাক্সি করে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে।

সকালবেলা উঠেই মহেশবাবু ট্যাক্সি আনলেন। নিজের হাতেই জয়ন্তর জুতোটা ঝেড়ে-মুছে দিলেন।

জয়ন্ত বললে—ফটিককেও নিয়ে চলুন মাস্টারমশাই, আমাদের বাড়ি—

—তা যাক। কিন্তু ফটিক বসবে ড্রাইভারের পাশে। পেছনের সিটে মহেশবাবু জয়ন্তকে পাশে বসিয়ে নিয়ে চললেন। ট্যাক্সি চললো গলি পেরিয়ে, ট্রামরাস্তা ছাড়িয়ে লাউডন স্ট্রীটের দিকে। বড়-বড় ঝাউ, আর কৃষ্ণচূড়া গাছের ছায়ায় ঢাকা রাস্তা।

গেটের ভেতর গাড়ি ঢুকতেই মহেশবাবু শিরদাঁড়া সোজা করে বসলেন। চাকর, বাকর, দারোয়ান, সোফার, মালী সবাই প্রস্তুতই ছিল। রায় বাহাদুর সামনেই ছিলেন। জয়ন্তকে সামনে নিয়ে মহেশবাবু মাথা নিচু করে সেলাম করে সমস্ত ঘটনা সবিস্তারে বললেন—আজ্ঞে, আমার এই বড়ছেলে ফটিকই কোনরকমে রক্ষে করেছে—নইলে কী হতো কে জানে ! দিনকাল বড় খারাপ পড়েছে—এখন সব ছোট ছেলেদের রাস্তায় ছাড়াও বিপদ—

জয়ন্ত আবদার ধরলে—বাবা, ফটিক আজ আমাদের বাড়ি থাকবে—

তারপর মহেশবাবুকে বললে—মাস্টারমশাই, ওকে আপনি রেখে যান এখানে, বিকেলে নিয়ে যাবেন, থাকবে ফটিক আজ আমাদের বাড়ি ?

মহেশবাবু এক পলক রায়বাহাদুরের দিকে চেয়ে নিজেই বুঝে নিলেন। বললেন—না-না বাবা জয়ন্ত, আজ থাক, অন্য একদিন আসবে' খন, একটা ছুটির দিন—

রায় বাহাদুর বললেন—জয়ন্ত, ওপরে যাও তোমার মা'র সঙ্গে দেখা করে এসো—তিনি ভাবছেন—

অনিচ্ছাসত্ত্বেও জয়ন্ত ওপরে উঠে গেল। যাবার সময় বললে—বাবা, ফটিককে তুমি আবার আসতে বলে দাও কিন্তু।

মহেশবাবু খানিক পরেই ফটিককে নিয়ে চলে এলেন। গেট পেরিয়ে এবার হেঁটে ফিরে আসা। জয়ন্তকে নিয়ে আসবার সময় যে ট্যাক্সি ভাড়া পড়েছিল, সেটা খচখচ করে বিঁধল মহেশবাবুকে।

ফটিক অবাক হয়েছে জয়ন্তদের ঐশ্বর্য দেখে। কাকাতুয়া, লাল-নীল মাছ ফুলগাছ ! কত সুখী ওরা। ওই জয়ন্ত কত ভাগ্য করে ও-বাড়িতে জন্মেছে ! আসতে-আসতে বাবাকে জিজ্ঞেস করলে—ওরা খুব বড়লোক, না বাবা ?

* * *

বিকেলবেলা মাস্টারমশাইয়ের আসবার কথা। সারা বিকেল বসে থেকেও মাস্টারমশাই এলেন না। তারপর দিনও এলেন না। তারপর দিনও এলেন না। তারপর দিনও এলেন না। তারপর দিনও না!

বাবাকে জিজ্ঞেস করবার সাহস নেই জয়ন্তর। সরকারমশাই চুপি-চুপি বললেন—ও মাস্টারমশাই তোমাকে আর পড়াতে আসবেন না—কারণ রায়-বাহাদুর নিজেই বারণ করে দিয়েছেন।

———

মাংস তখন সেদ্ধ হচ্ছে। বেশ চনেচনে খিদে। চারিদিকে আমরা গোল হয়ে কাঞ্চনদা'র গল্প শুনছি। আরম্ভ হয়েছিল মহাভারতের গল্প নিয়ে। তারপর শুরু হলো ইতিহাসের গল্প। তারপর দেশ-বিদেশের গল্প।

শেষে ফট্‌কে বললে—এবার একটা ভূতের গল্প বলো না কাঞ্চনদা—

রাত বারোটা বাজতে চললো। পঞ্চা উঠে গিয়ে মাংসটা একবার পরখ করে দেখে এল। হলো কী মাংসটার ? ঝাড়া দেড় ঘণ্টা হয়ে গেল মাংসের সেদ্ধ হবার নাম আর নেই। সবারই খিদে পেয়ে গেছে। বিরাট বাগান বাড়িটার হলঘরে আমরা বসে আছি। কলকাতা থেকে দশ মাইল উত্তরের একটা বাগান। এত রাত্রে শেষ পর্যন্ত যদি মাংসটা সেদ্ধ না হয়—শুধু ভাত আর নুন খেয়ে পেট ভরাতে হবে।

তা কাঞ্চনদা'র গল্প শুনলে মানুষ সত্যিই ক্ষিদে ভুলে যায় বৈকি। কাঞ্চনদা বললেন ঃ একটা নতুন ধরনের ভূতের গল্প বলি শোন্—

আমরা মনোযোগ সহকারে তখনই কাঞ্চনদাকে ঘিরে বসলাম।

* * *

সেবার পূজোর পর সবাই মিলে রাঁচিতে গিয়েছি। কাকীমার হজমের গোলমাল, ভালো ক্ষিদে হয় না বলে ডাক্তার রাঁচিতে হাওয়া বদলাতে বলেছে। সঙ্গে আছেন কাকা-বাবু, খুড়তুতো ভাই পলটু আর বিলটু, আমার ছোড়দা আর ছোট বৌদি আর আমি।

দু'দিন-দু'রাত বেশ নির্বিবাদে কাটলো—তৃতীয় দিন সন্ধ্যেবেলা পর্যন্তও বেশ কাটলো। গোলমাল বাধলো রাত্তির বেলায়—রাত ঠিক দেড়টার সময়

থেকে উৎপাত শুরু হলো। পাশের হলঘরের দিক থেকে একটা অদ্ভুত আওয়াজ আসতে লাগলো।

…খড়র…খড়র…খড়র…যেন বাগানের শুকনো অশ্বত্থ পাতা মাড়িয়ে কে অতি সাবধানে হাঁটছে—তারপর হাঁটতে-হাঁটতে ঘরের ভেতরে এলো যেন।

সমস্ত দিনই সকলের পরিশ্রম গেছে। হুড্রু ফল্‌স-এর রাস্তায় পাহাড়ের ওপর পিকনিক করতে যাওয়া হয়েছিল সবাই মিলে। সারাদিন বেড়ানো, গ্রামাফোন বাজানো, ছোড়দার ফোটো তোলা, তারপর খাবারের বাক্স খুলে বিকেলবেলাই পেট ভরে খাওয়া হয়েছে। ফিরে এসে রান্না তৈরি হয়ে থাকারই কথা। কিন্তু এসে দেখা গেছে, ঠাকুর-টার অসুখ। রান্না চড়ায় নি, ঘরে শুয়ে-শুয়ে জ্বরে ধুঁকছে। একটু সকাল-সকালই সবাই শুয়ে পড়েছি। কাকাবাবু আর কাকীমা শুয়েছেন হলঘরের একপাশে ছাদে ওঠবার সিঁড়ির দিকে। ছোড়দা' আর ছোট বৌদি পশ্চিমের ঘরে। আমি একলা একটা ঘর পেয়েছি। পলটু আর বিলটু শুয়েছে আমারই পাশের ঘরে।

সন্ধ্যে আটটার পরেই সবাই যে-যার ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়েছি।

সেই আটটা থেকে এখন—এই রাত দেড়টা ।পর্যন্ত চোখে ঘুম নেই। ঘড়িতে ন'টা, সাড়ে ন'টা, দশটা, সাড়ে দশটা—একে একে সব ক'টা বাজার শব্দ শুনতে পেয়েছি। প্রত্যেকটি মুহূর্ত চোখের সামনে দিয়ে ঢিমে তালে বয়ে চলেছে, এমন সময় আবার সেই আওয়াজ—খড়র্-খড়র্-খড়র খড়র্-শুকনো পাতার ওপর হেঁটে চললে যেমন শব্দ হয়—ঠিক তেমনি। ভয়ে সমস্ত শরীর ছমছম করে উঠলো।

এতক্ষণ খুব খিদে পাচ্ছিল। অর্থাৎ রাত্রের খাওয়াটা খাওয়া হয় নি আজ—খিদে তো পাবেই। কিন্তু ঠাকুরের অসুখ—কে রাঁধে! কাকীমা বললেন—এই তো বিকেলবেলাই সব পেট ভরে গিল্‌লে—আজ রাত্রে আর খাওয়ার হ্যাঙ্গামা দরকার নেই—কাল বরং ভোরবেলা লুচি আর আলুভাজা ক'রে দেবো—

কাকীমার কথার ওপরে কেউ কথা বলবে, এমন লোক আমাদের বংশে নেই। তার কারণ কাকাবাবুই কাকীমাকে বাঘের মত ভয় করেন। কাকাবাবু বললেন—তা' তো বটেই, এই তো খেলাম গাণ্ডে-পিণ্ডে, আর মিছিমিছি কষ্ট করে দরকার নেই তোমার রাঁধবার—

অর্থাৎ রাঁধতে হলে কাকীমা আর ছোট বৌদিকেই রাঁধতে হবে। কাকীমা প্রস্তাব করলেন, আর কাকবাবু প্রস্তাব সমর্থন করলেন। এর ওপর ওপর আর কী বলবার থাকতে পারে ? সুতরাং হাত-মুখ ধুয়ে যে-যার বিছানায় শুয়ে পড়া হয়েছে। কিন্তু শুধু শুয়ে পড়াই হয়েছে—আমার মোটেই ঘুম আসছিল না। পেটের তলা থেকে একটা ফাঁকা যেন শব্দ ওপরে উঠতে-উঠতে গলায় এসে ঠেকে রয়েছে—

একবেলা না খেলে যে কী কষ্ট, তা' সেদিন জানলাম।

খিদের চোটে যখন সমস্ত রাতটাই কাবার হয়ে যাবার যোগাড় - যখন কাঁচের শার্সির ভেতর দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে বিছানায়, ঠিক সেই সময়ই ওই শব্দটা···খড়র···খড়র · খড়র···

অন্য ঘরে সব নিস্তব্ধ। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ আছে শুধু! অর্থাৎ সবাই ঘুমোচ্ছে। খিদের চোটে আমারই ঘুম নেই। একবার উপুড় হয়ে শুই, একবার কাৎ হয়ে। কিছুতেই আর পোড়া খিদেটাকে জুৎ করতে পারছিনে। আরও একবার শব্দ হলো—খড়র···খড়র···তারপরেই শব্দ হলো—কোঁত···

একটা অজানা ভয়ে শিউরে উঠছে শরীর। অজানা, অচেনা জায়গা—এ বাড়িটার পূর্ব ইতিহাসও জানি না। কে জানে কোনও অশরীরী আত্মার আসা যাওয়ার ব্যাপার আছে কিনা এখানে। আওয়াজটা বেশ জোরেই হয়েছিল, কাকীমা জেগে উঠে বললেন—কে রে—কে ?

হঠাৎ যেন সমস্ত নিস্তব্ধ হয়ে গেল। কারো কোনও সাড়াশব্দ নেই। একটু আগেই যে অস্বস্তিকর আওয়াজটা রাত্রির স্তব্ধতাকে ভেদ করে আশঙ্কার উদ্রেক করছিল, তা আর নেই। নিঃশ্বাস বন্ধ করে চুপ করে পড়ে রইলাম।

কতক্ষণ কেটে গেল। আবার সেই শব্দটা শুরু হয়েছে, কিন্তু এবার যেন অতি সন্তর্পনে, অত্যন্ত আস্তে। মনে হলো, কাউকে ডাকবো নাকি। কিম্বা পলটু-বিলটুর ঘরে গিয়ে শোব নাকি! কিন্তু সবাই তো ঘুমাচ্ছে। ওদের ঘুম মিছিমিছিই বা ভাঙাবো কেন। ও-ঘরে ছোড়দা, ছোট বৌদি, কাকাবাবু সবাই এখন ঘুমে অসাড়। একটু আগে কাকীমার সাড়া পাওয়া গিয়েছিল, এতক্ষণে কাকীমাও নিশ্চয়ই আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন। বাইরে আকাশ থেকে চাঁদের আলো এসে পড়েছে ঘরে। সেই আলোতে একটু-একটু ভেতরের বারান্দাটাও দেখা যায়। তীক্ষ্ণ নজর দিয়ে দেখবার চেষ্টা করলাম।

কোথাও কিছু দেখা যায় না।

হঠাৎ মনে হলো, বিদ্যুৎ চম্‌কাবার মত যেন চমকে উঠলো একটা আলো, কিন্তু সেটা মূহূর্তমাত্র। তারপরেই আবার সমস্ত অন্ধকার। ধূ-ধূ অন্ধকার চারদিকে। যেটুকু ঘুম আসবার ভরসা ছিল, তাও গেল। শব্দটা এক-একবার শুরু হয়, আর থামে। এবার একেবারে চীৎকার করতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ কে যেন আমার গলা বন্ধ করে দিল। মনে হলো কে যেন নড়ছে ওখানে—ওই বারান্দার মধ্যিখানে।

কে ? কে-ও ?—

চেহারাটা ঠিক যেন কাকাবাবুর মত। মাথার সামনের দিকে একটু-খানি সুগোল টাক। কৌতুহল হল সত্যিই কি কাকাবাবু নাকি! শব্দটা ঠিক ওখানে থেকেই তো আসছে। বিছানা ছেড়ে উঠলাম। রহস্যের সমাধান করতেই হবে। জানলার ভেতর দিয়ে দেখলাম—পাশের খোলা বারান্দাটার মধ্যিখানে মেঝের ওপর কাকাবাবুই তো বসে! সামনে কতগুলো কী সব রয়েছে, দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না অন্ধকারে। কিন্তু এত রাতে কাকাবাবুই বা অমন করে ওখানে বসে করছেন কী ? কাকাবাবুর কি যোগ করা অভ্যাস আছে নাকি! নামাজ পড়ার ভঙ্গীতে কী করছেন কাকাবাবু এমন করে! আর অমন শব্দই বা হচ্ছে কিসের ?

কাকাবাবুকে দেখে একটু সাহস পেলাম। ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় যেতেই কাকাবাবু দেখতে পেয়েছেন। প্রথমে একটু অবাক্ হয়ে গিয়েছিলেন বোধহয়। চুপিচুপি কাকাবাবু আমায় ডাকলেন—কে ? কাঞ্চন ? এদিকে আয়---আস্তে—তোর কাকীমা জেগে উঠবে।

ফিসফিস করে কথা। কাকাবাবু আবার বললেন---ঘুম আসছিল না বুঝি ? ঘুম আসবে কী করে ? খিদে পেয়েছে তো ? পাবেই তো। আমারও ঘুম আসছে না, কিছু পেটে না পড়লে ঘুম আসবে না---

এতক্ষণ সামনে নজর পড়ে নি। দেখি সেই অন্ধকারেই কাকাবাবু একটা শতরঞ্জি পেতে নিয়েছেন। বিস্কুটের টিন খোলা। ওপরের খড়খড়ে কাগজটা খোলার শব্দই এতক্ষণ পাচ্ছিলাম তা'হলে।

কাকাবাবু বললেন---আর সবাই বেশ আরামে ঘুমুচ্ছে-- কেবল তোর আর আমার ঘুম নেই---খা, বিস্কুট খা—

মাখনের কৌটোটাও আনতে ভোলেন নি কাকাবাবু। ছুরি দিয়ে মাখন মাখিয়ে একটা বিস্কুট আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। নিজেও নিলেন একটা।

কাকাবাবু বললেন—পেটে খিদে থাকলে ঘুম কী আসে? তা জোরে চিবোস নি—কাকীমা আবার এখনি টের পেলে জেগে উঠবে—

কাকীমাকেই কাকাবাবুর পৃথিবীতে যত ভয়। কাকীমার মুখের সামনে কোনও কথার প্রতিবাদ করবার ভরসা নেই!

হঠাৎ ক'ার যেন পায়ের শব্দ হলো। ফিরে দেখি ছোড়দা।

ছোড়দা কিছু বলবার আগেই কাকাবাবু বললেন—চুপ, একেবারে চুপ—কাকীমা জেগে উঠলেই সর্বনাশ—তোরও হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল নাকি?

ছোড়দা' বললে—ঘুমই আসেনি তো ভাঙবে কি! খিদের চোটে কি ঘুম আসে কখনও—

কাকাবাবু আস্তে-আস্তে বললেন তোর কাকীমার যেমন কাণ্ড, একটু নিজে র াঁধতে হবে বলে সকলকে উপোস করিয়ে যা···হোক আয় বোস এখানে, শুধু শুকনো পাঁউরুটিটাই কামড়ে-কামড়ে পেট ভরানো যাক।

ছোড়দা এসে শতরঞ্জির ওপর বসলো। একটা মাত্র পাঁউরুটি, তাও শুকনো, তিনজনে মিলে কোন রকমে পেট ভরানো। হঠাৎ পুব দিকের দরজা খোলার শব্দ হোল। পলটু, বিলটু দু'জনেই আসছে নাকি?

কাকাবাবু হঠাৎ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। বললেন—আস্তে-আস্তে···অত শব্দ করিস্ না—ওদিকে তোদের মা যে উঠে পড়বে—কী হলো, ঘুম ভেঙে গেল?

—ঘুম আসেই নি মোটে খিদের জ্বালায়—

কাকাবাবু ভাবনায় পড়লেন। এই এক পাউণ্ডের এক টুকরো পাঁউরুটি পাঁচজনের কুলোবে তো! এখন পাথর খেলে হজম হয়ে যাবার যোগাড়।

কাকাবাবু বললেন—আমি ভাবলাম, আমি ছাড়া আর সবাই অঘোরে ঘুমোচ্ছে, কিন্তু সবাই যে জেগে আছিস্, তোরা তা কী করে জানবো। এখন উপায়? কী করে এতগুলো পেট ভরানো যায়? এত খিদে শেষে যদি নাড়ি সুদ্ধু হজম হয়ে যায়? কিন্তু খুব সাবধান—তোর কাকীমা যেন না জেগে ওঠে—

যেটুকু পাঁউরুটি ছিল, তাই স্লাইস করে কাটা হলো। মাখন মাখানো

হলো। সেই কনকনে শীতের রাত্রে খোলা বারান্দায় বসে, হু-হু করে হাওয়া দিচ্ছে উত্তর দিক থেকে—সবাইকে যেন একসঙ্গে ভূতে পেয়েছে। সেই ভূতে পাওয়াতে ঘুম আসছে না, শীত লাগছে না—এ ভূত বড় অদ্ভুত। কাকার বয়েস পঁয়ষট্টি বছর—পলটু-বিলটুর বয়েস তেমনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট—সকলকে একসঙ্গে খিদে ধরেছে। একদিকে শীত আর একদিকে ঘুম, দু'-এর ওপর খিদে—এই তিন মিলে সবাইকে এক জায়গায় জুটিয়ে দিয়েছে।

হঠাৎ ছোট বৌদি এসে হাজির পেছন থেকে। কাকাবাবু বললেন—বোসো বৌমা, বুঝতে পেরেছি, তোমারও ঘুম আসে নি। আসবে কী করে? এই শীতে পেটে কিছু না পড়লে কি ঘুম আসে? যাক—এই পাঁউরুটিটা দু'-ভাগ করে ফেল তো বৌমা—খুবই আস্তে, ওই বিস্কুটগুলো আমিই সব একা শেষ করে দিয়েছি, তখন তো জানি না, যে বাড়িসুদ্ধ লোক সবাই জেগে—নইলে কিছু রেখে দিতাম তোমাদের জন্যে।

ছোড়দা, বললে—একটু চিনি হ'লে ভালো হতো বেশ···

—নিশ্চয়ই, চিনি না হলে কি পাঁউরুটি খাওয়া যায়—চিনি চাই বৈকি! কিন্তু খবরদার, কাকীমা যেন জেগে না ওঠে—জানতে পারলে বিপদ বাধাবে। অর্থাৎ শুধু চিনি কেন---ভাত রেঁধে খাওয়া হলেও কাকাবাবুর আপত্তি নেই, শুধু কাকীমা না জানতে পারলেই হলো।

এক খণ্ড পাঁউরুটি, তাকে ভাগ করতে কতটুকুই বা সময় লাগে। তবে শেষে গ্লাস দু'তিন জল খেলে পেট-টা ভরলেও ভরতে পারে এবং তখন ঘুম আসবার আশা থাকলেও থাকতে পারে। জলের কুঁজোটা আছে, কাকীমা যে ঘরে শোয় সেইখানে। সেখানে গিয়ে জল গড়িয়ে খাওয়া চলবে না। কোনও অসাবধান মুহূর্তে একটু শব্দ করে ফেললেই ব্যাস! কাকীমা জেগে উঠলে এক অগ্নিকাণ্ড। কাকাবাবু বললেন—তার চেয়ে কুঁজো-গ্লাস, সব এখানে নিয়ে এসো কেউ—কাঞ্চন তুই যা—

আমি অন্ধকারে পা টিপে-টিপে গিয়ে কুঁজো নিয়ে চলে এলাম।

ছোড়দা, বললে---চিনি?

ছোট বৌদি বললেন---চিনি তো ভাঁড়ার ঘরে আছে। ঠিক শেলফ্-এর প্রথম তাকে—কোণে···

কাকাবাবু বললেন—তা' কাঞ্চন তুই যা। তুই একটু ধীর-স্থির আছিস এদের মধ্যে—

শেষকালে আমাকেই চিনি আনতে হলো। হলঘর পেরিয়ে ভাঁড়ার ঘর যেতে হবে। পা টিপে-টিপে অন্ধকারে দিক ঠিক করে ভাঁড়ার ঘর লক্ষ্য করে চলেছি। হঠাৎ যেন কার পা আচমকা মাড়িয়ে দিলাম। মাড়িয়ে দিয়েই এক নিমিষে ঘর ছেড়ে দৌড়ে পালিয়েছি যেখান দিয়ে পেরেছি, একেবারে জ্ঞানশুন্য হয়ে বাগানে গিয়ে থেমেছি। শুনতে পাচ্ছি কাকীমার চীৎকার—কে, কে রে আমার পা মাড়িয়ে দিলে ? কে দৌড়ে পালালো ?

কাকাবাবুর মাথায় বজ্রাঘাত। কাঞ্চনটা শেষে এই করলো। মাথা হেঁট করে বসে রইলো। ছোড়দা, পলটু, বিলটু অপ্রস্তুত। ছোট বৌদি মাথার ঘোমটাটা আর একটু টেনে দিয়ে পাঁউরুটি চিবোতে লাগলেন। এর শেষ কোথায় হবে কে জানে ?

আর আমি ? আমি দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছি। একে 'বিপরীত' খিদে তায় শীত, তারপর আবার গভীর রাত—রাত প্রায় দু'টো—

কাকীমা সহজে থামবার পাত্র নন। একটা ফয়সালা করে তবে ছাড়বেন। তড়াক্ করে বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠেছেন। উঠে নিজের ঘরে আলোর সুইচটা টিপে ফেলেছেন। কেউ কোথাও নেই। ও মানুষটা কোথায় গেল ? পলটু-বিলটুর ঘরে আলো জ্বেলেছেন—বিছানা ফাঁকা ! ওরা কোথায় গেল এত রাত্রে ? ছোড়দার ঘরের দরজাও খোলা। সে ঘরেও আলো জ্বেলে দেখলেন কাকীমা। কেমন যেন হঠাৎ এক মিনিটের জন্যে একটু ভয়-ভয় করতে লাগলো কাকীমার। কোথায় গেল সব ! তবে কি নিজে ছাড়া আর সবাই হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। কাকীমা হাল ছাড়লেন না। শেষে এঘর-ওঘর বারান্দা, ভাঁড়ার ঘর সব দেখতে লাগলেন। সব শেষে উত্তরে খোলা বারান্দায় এসে আলো জ্বালাতেই চক্ষুস্থির ! বেয়াক্কেলে বুড়ো মানুষ, ছেলে-পিলে বৌমাকে পর্যন্ত নিয়ে অন্ধকারে ঠাণ্ডায় বসে-বসে পাঁউরুটি চিবোচ্ছে। এত খিদে, এত পেটের জ্বালা ! কাকাবাবুর মাথা হেঁট হয়ে গেল। খানিকক্ষণ হতবাকের মত চেয়ে থেকে কাকীমা বললেন—তোমাদের যদি এতই ক্ষিদে, তবে রান্না করলেই হতো—মিছিমিছি এই খিদে নিয়ে তোমরা সবাই খেতে চাইলেনা, আর এখন কিনা দিব্যি পাঁউরুটি কামড়াচ্ছো।

কাকাবাবু এবার মাথা তুললেন—হ্যাঁ ঠিকই তো বলেছ—তখন বউমা বললেই পারতে খোলাখুলি, যে ক্ষিদেয় রাত কাটবে না।

—তুমি থামো—থামিয়ে দিলেন কাকীমা—এতো বয়েস হলো এখনও বেয়াক্কেলেপনা গেল না—তুমিও তো দেখছি খাচ্ছো—মুখে পাউরুটি ভর্তি রয়েছে—কে সকলকে ডেকে আসর জমালে শুনি ?

কাকাবাবু কথা বলতে পেয়ে বেঁচে গেলেন যেন !

—ডাকতে হবে কেন ? আমি কি কাউকে ডেকেছি ? সবাই নিজে থেকেই এসেছে—বিশ্বাস না হয় বৌমাকে জিজ্ঞেস করো—

—আর বৌমাকে সাক্ষী মানাতে হবে না—

কাকীমা বললেন—এস বৌমা, উনুনে আগুন দাও তো—

—এখন, কত রাত্তির ? কাকাবাবু প্রশ্ন করলেন।

—তোমাকে আর দরদ দেখাতে হবে না। নাও, ওঠ বৌমা, উনুনে আঁচটা দিয়ে দাও, আমি খিচুড়ি চড়িয়ে দিচ্ছি—

সেই রাত আড়াইটের সময় উনুনে আগুন দেওয়া হলো। তারপর সকলের খাওয়া যখন শেষ হলো তখন রাত প্রায় চারটে। মুরগি ডাকতে শুরু করেছে। সন্ধ্যেবেলা যে ভূত উৎপাত আরম্ভ করেছিল—রাত চারটের সময় সে ঠাণ্ডা হলো। আর এক মিনিট দেরি নয়। খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সকলের নাক ডাকতে শুরু করলে। পরদিন সকাল ন'টার আগে আর কারুর ঘুম ভাঙলো না।

* * *

কাঞ্চনদা' গল্প শেষ করলেন। ফট্‌কে বললে—এই কি তোমার ভূতের গল্প কাঞ্চনদা—এ তো মানুষের গল্প—

কাঞ্চনদা বললে—খিদে যে ভূতের বাবা কিম্ভুত রে ! ভূতে পেলে তবু তো সে ছাড়ে, কিন্তু কিম্ভুতে পেলে আর ছাড়ান-ছোড়েন নেই। ভূত থাকুক গে যাক্—ওই কিম্ভুতটা যদি না থাকতো, পৃথিবীতে এত অশান্তি, দাঙ্গা, যুদ্ধ, কিছুই হতো না—কিন্তু তা বুঝি হবার উপায় নেই—

পঞ্চা আবার উঠে দেখতে গেল মাংসটা সেদ্ধ হলো কি না। আজ মাংস যদি সেদ্ধ না হয়, তো আজকেও আবার কিম্ভুত ধরবে আমাদের সকলকে।

———

ছোটবাবুর বাঁদরামি

নেপালের জঙ্গীপাহাড়ে একরকম বাঁদর আছে। দেখতে ঠিক লাট্টুর মতন। বন-বন করে ঘুরতে-ঘুরতে দৌড়োয়। চেন্ বেঁধে ছেড়ে দাও, দিন-রাত চরকির মত ঘুরবে। ঘুরতে-ঘুরতে খাবে, আবার রাত্তির বেলা ঘুরতে-ঘুরতেই ঘুমোবে। সেবার লণ্ডনের এক একজিবিশনে সেই বাঁদর দেখিয়ে এক সাহেব চল্লিশ লক্ষ পাউণ্ড উপায় করেছিল। কিন্তু ও-জাতটা দিন-দিন কমে আসছে —জঙ্গীপাহাড়েই বড়জোর খুঁজলে দশটা কী বারোটা পাওয়া যাবে। ধরা ভারী শক্ত। একটা ধরতে পারলেই হাজার চল্লিশ টাকা লাভ—

কথাটা শুনে সবাই আমরা হেসে উঠলুম। নেনোটা বরাবরই ব্লাফ্ দেয়। গোবরডাঙা থেকে ঘুরে এসে হয়তো বললে—গাজিয়াবাদ থেকে আসছি। নেনোকে আর আমাদের চিনতে বাকি নেই। সবাইকে হাসতে দেখে নেনো আরো নাছোড়বান্দা হয়ে উঠলো। রাগতভাবেই বললে—পট্লাকে জিজ্ঞেস কর—বিশ্বাস না হয় পট্লাকেই জিজ্ঞেস কর্—

পট্লা এক কোণে বসে বই পড়ছিল। আমাদের মধ্যে পট্লাই একটু ভাবুক মানুষ। পড়াশোনা আছে। পলিটিক্স নিয়ে আলোচনা করে। এক কথায় এই বয়সেই ভারিক্কী। সবটা শুনে নিয়ে সে বললে—নেনো যা বলেছে নেহাতই বাজে কথা নয়। খবরের কাগজেই তো বেরিয়েছে—নেপালের জঙ্গীপাহাড়টা ওই বাঁদরগুলোর জন্যেই তো বিখ্যাত হয়ে উঠলো। চল্লিশ হাজার কেন, একজন আমেরিকান তো গেল-মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকার প্রাইজ ডিক্লেয়ার করলে ওই বাঁদরের জন্যে—কেউ পারলে না—চারজন

নেপালী প্রাণ হারাল গাছ থেকে পড়ে—শুনছি নাকি নেপাল গর্ভমেণ্ট থেকে ওই বাঁদর ধরা নিয়ে আইনও পাস হবে শীগগির— .

পট্‌লার কথা শুনে সকলেই চুপ করে গেল। নেনোর সব কথা তা' হলে ব্লাফ্ নয়। নেনোও জো পেয়ে গিয়ে বললে—তোরা ভাবিস বাঁদর বুঝি এক রকমই হয়, পট্‌লাকে জিগ্যেস কর। ও জানে বাঁদর রকম জাতের আছে ?

পট্‌লাকে ভাবতে হলো না। পট্ করে বললে—তিনশো সাঁইত্রিশ রকমের বাঁদর আছে পৃথিবীতে—তার মধ্যে তেরো রকম বাঁদরের এখন আর অস্তিত্বই নেই। তোরা তো কিছু খবর রাখবিনে, কিছু বই পড়বিনে, আর তা'ছাড়া তোদেরই বা দোষ কী ! আমার বড়কাকার অফিসের খাস বড়সাহেবই তো জানতো না—আর এই নিয়ে একবার এক মজার কাণ্ডও ঘটে গেলো।

বড়কাকার অফিসের বড়সাহেব যে খবর জানে না, তা না জানা থাকায় আমরা সবাই একটু আশ্বস্ত হলাম বৈকি ! পট্‌লার বড়কাকা একটা অফিসের বড়বাবু। বেজায় প্রতিপত্তি তাঁর অফিসে। সেই বড়কাকার অফিসের খাস বড়সাহেব কত রকম জাতের বাঁদর আছে জানতো না—এটা পট্‌লার কাছে কিন্তু বড় অপরাধের মনে হয়।

নেনো বললে—তা সাহেব হলেই কি আর বিদ্যের জাহাজ হয় ?

আমরা সবাই বললাম—ব্যাপারটা খুলে বল পট্‌লা—সবটা শুনি—

পট্‌লা বলতে লাগলো—বড়কাকা একবার পুরীতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। ফিরে আসছেন। ডেলাং স্টেশনে গাড়ি থামতেই এক কাণ্ড দেখলেন। আপ ট্রেনের চাকার তলায় একটা বাঁদরী কেটে পড়ে আছে, আর তার পাঁচ-ছ'দিনের বাচ্চাটা পাশে চুপ করে বসে। ট্রেন ছাড়বার আগেই ঝুপ করে নেমেই টুপ করে বাচ্চাটাকে তুলে নিয়ে গাড়িতে এসে ওঠেন বড়কাকা। তারপর থেকে আজ সাত বছর ওটাকে 'মানুষ' করে আসছেন। বাঁদরটা এখন বড়কাকাকে ছেড়ে এক মিনিট কোথাও থাকতে পারে না। বড়কাকা হেঁটে-হেঁটে অফিস যান, সঙ্গে-সঙ্গে যায় বাঁদরটা। বাড়ির কাছেই অফিস। অফিসে গিয়ে চেয়ারের তলায় বসে থাকে বাঁদরটা। বড়কাকার পকেটে থাকে ছোলাভাজা। দেড়টায় টিফিন খান—তাকেও খেতে দেন ! বড়বাবুকে খোসামোদ করে অনেক বাঁদরটাকে কলাটা-মুলোটা খেতে দেয়। কেউ-কেউ আবার বলে—ভারি ভদ্র বাঁদরটা আপনার।

বড়কাকার ভয়ানক একটা মায়া জন্মে গিয়েছিল বাঁদরটার ওপর।

বেশ দিন যাচ্ছিল। কিন্তু মুশকিল হলো একদিন। রবিন্‌সন্ সাহেব বিলেত চলে গেল রিটায়ার করে। তাঁর জায়গায় এল বম্পাস্ সাহেব। যেমন বাঁদরের মত লাল টকটকে মুখ, তেমনি জরদগব বুদ্ধি। একেবারে বিলিতী সাহেব। ইণ্ডিয়ায় এই প্রথম এল। ভারি একগুঁয়ে। বোঝালে বোঝে না—না বুঝলে রেগে যায়। কিন্তু বড়কাকা ছিলেন বনিয়াদী বড়বাবু! ন'টা বড়সাহেবকে চরিয়ে বড়বাবু হয়েছেন—তিরিশ বছরের চাকরি তাঁর; তাঁকে ভড়কে দেওয়া খুবই শক্ত। দু'দিনেই বম্পাস্ সাহেব জুজু হয়ে এল। একদিন বম্পাস্ সাহেব বড়কাকার ঘরে আসতেই বাঁদরটাকে দেখেছে। পোষ-মানা বাঁদর। সাহেবের জুতোয় মাথা ঠেকিয়ে সেলাম করে দিলে। সাহেব ভারি খুশী। বললে—বড়বাবু, এটা কা'র মাঙ্কি ?

বড়কাকা বিনীত কণ্ঠে বললেন—মাই মাঙ্কি স্যার—

বড়কাকা ভেবেছিলেন, অফিসের ভেতরে বাঁদর নিয়ে আসার জন্যে বকা-বকি করবে সাহেব, কিন্তু উল্টো হলো। সাহেব বাঁদরটাকে আদর করলে খানিকক্ষণ। তারপর ঘরে গিয়ে বড়কাকাকে ডেকে পাঠালে। বড়কাকা আসতেই সাহেব বললে—ওই রকম একটা মাঙ্কি আমাকে কিনে দিতে পারো বড়বাবু—আমি নিজে পুষবো—

বড়কাকা বললেন—নিশ্চয়ই হুজুর—কিন্তু অনেক দাম পড়বে যে—

—কত টাকা দাম লাগবে বলো—সাহেব জিগ্যেস করলে।

—সাড়ে তিনশো—থী্র হানড্রেড এণ্ড ফিফ্‌টি রুপিজ্ স্যার। কী ভেবে হঠাৎ মুখ দিয়ে কথাটা বেরিয়ে গেল তাঁর।

—অলরাইট্—অলরাইট্ বড়বাবু—বম্পাস সাহেব চেক-বই বার করে ঐ অঙ্কের একটা চেক লিখে দিলে।

তার কয়েকদিন পরেই বড়কাকা একটা বাচ্চা বাঁদর এনে দিলে সাহেবকে। সাহেব ভারি খুশী। পরদিনই বড়কাকার পঞ্চাশ টাকা ইনক্রিমেণ্ট হয়ে গেল।

* * *

পট্‌লা থামতেই আমরা সবাই বললুম—তারপর, তারপর কী হলো বল্‌না ?

পটলা বললে—এতক্ষণ যা বললুম তা তো ভালোই, কিন্তু এইবার ছোট-বাবুর গল্প। বড়কাকার বয়সে নেহাৎ বেশী নয়। বড়কাকা রিটায়ার না করলে

ছোটবাবু বড়বাবু হতে পারে না। বড়কাকা সেবার দু'মাসের ছুটি নিয়েছিল। এতদিন বড়সাহেবের কাছে ঘেঁষার সুযোগ পেত না ছোটবাবু। এবার আসতে-যেতে কারণে-অকারণে বম্পাস্ সাহেবকে সেলাম ঠুকতে লাগলো ছোটবাবু। একদিন সাহেবের ঘরে গিয়ে সাহেবের সঙ্গে কাজ শেষ করে ফিরে আসবার সময়ে ছোটবাবু হঠাৎ ফিরে চেয়ে দেখলে, সাহেবের পায়ের তলায় সাহেবের পোষা বাঁদরটা শুয়ে আছে।

ছোটবাবু জিগ্যেস করলে—স্যার, আপনি কি বাঁদরটা কিনেছেন?

বম্পাস্ সাহেব বাঁদরটার গায়ে হাত বুলোতে-বুলোতে বললে—বড়বাবু আমায় কিনে দিয়েছে—খুব কস্টলি মাঙ্কি—অনেক দাম এর—

ছোটবাবু অনেকক্ষণ ধরে একদৃষ্টে বাঁদরটার দিকে চেয়ে থেকে বললে—কত দাম পড়ল স্যার?

—থ্রী হানড্রেড এণ্ড ফিফ্‌টি রুপিজ—ভেরি কস্টলি মাঙ্কি ছোটবাবু—

ছোটবাবু দাম শুনেই চমকে উঠে বললে—বলেন কী হুজুর, তিনশো পঞ্চাশ টাকা? এ-বাঁদর যে তিন টাকায় পাওয়া যায়—টেরিটি বাজারে।

—বলো কী ছোটবাবু? তিন টাকা? বম্পাস্ সাহেব আকাশ থেকে পড়লো যেন—লাল মুখ তার আরো লাল হয়ে উঠলো!

—তবে যে বড়বাবু আমার কাছে সাড়ে তিনশো টাকার চেক্ নিলে—ওয়েল—লেট্ বড়বাবু কাম ব্যাক্—বড়বাবু আসুক, আমি দেখে নেবো—

কিন্তু অফিস থেকে ফিরে এসে সে-রাতে আর ছোটবাবুর ঘুম হলো না। ভয়ে সারা শরীর কাঁপতে লাগলো। মুহূর্তের ভুলে কী কাজই না করে ফেলেছে ছোটবাবু। বড়বাবুর হাতেই তো তার চাকরি—তার জীবন-মরণ! বড়বাবুর বিরুদ্ধে বড়সাহেবের কাছে কী অমন বলা ভাল হয়েছে! ছুটি থেকে ফিরে এসে যখন বড়বাবু সব শুনবেন, তখন যে তার প্রাণ বাঁচাতেই প্রাণান্ত হবে!

মনের অশান্তিতে অতিষ্ঠ হয়ে বড়কাকা আসতেই একদিন ছোটবাবু বড়কাকার কাছে এসে হাজির। বড়কাকা অফিসের কোনও লোকের তাঁর বাড়িতে এসে দেখা করা পছন্দ করেন না। তবু মুখে কিছু না বলে জিগ্যেস করলেন—কী খবর ভাগবত্?

ছোটবাবু অনেক বিনয় করে সমস্ত ঘটনা বড়কাকাকে জানালে। তারপর বললে—আমি না জেনে অপরাধ করে ফেলেছি—আমায় ক্ষমা করুন বড়বাবু—

কথাটা শুনে বড়কাকা অনেকক্ষণ পান চিবুতে-চিবুতে কী ভাবলেন, মুখ দেখে বোঝা গেল না তিনি রেগেছেন, কী ক্ষমা করেছেন। খানিক পরে বললেন—তোমাকে না আমি চাকরি করে দিয়েছি ? আর তুমিই কিনা আমার নামে বড়সাহেবের কাছে বেইমানি করলে ? জানো, আমি আজই তোমার চাকরি খতম করে দিতে পারি ? বেকুব কোথাকার !

ছোটবাবুর মুখে রা'টি নেই। চোখের ভাব প্রায় কাঁদো-কাঁদো। শেষে বড়কাকা বললেন—ভদ্রলোকের ছেলে, ছা-পোষা মানুষ, চাকরি তোমার খাবো না, কিন্তু খবরদার এমন কাজ আর করো না—যাও—আর একটা কথা—

ছোটবাবু চলে যাচ্ছিল, ফিরে দাঁড়াল। তার তখন গলা থেকে কেউ যেন সবেমাত্র ফাঁসির দড়িটা খুলে নিয়েছে। বড়কাকা বললেন—আমি কালই জয়েন্ করছি—একটা কথা তোমায় বলে রাখছি। কাল যখন সাহেব আমাকে ডাকবে, তখন তুমিও যাবে আমার সঙ্গে—সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে আমি যা জিগ্যেস করব, তুমি চুপ করে থাকবে—আমার একটা কথারও উত্তর দেবে না, রাম, গঙ্গা, কিচ্ছু নয়—বুঝতে পেরেছো ?

—আজ্ঞে, বড়বাবু—বলে ছোটবাবু চলে গেল।

তার পরদিন সকালবেলা অফিসে যেতেই বড়সাহেব বড়কাকাকে ডেকে পাঠিয়েছে। ডাকতেই বড়কাকা চেয়ারে ঝোলানো কোটটা গায়ে পরে নিলেন। তারপর বড়সাহেবের ঘরের দিকে যাবার পথে একবার ছোটবাবুর দিকে কটাক্ষপাত করে বললেন—মনে আছে তো ?

বম্পাস্ সাহেব চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে ছিল। বড়কাকা যেতেই সাহেব বললে—বড়বাবু, তুমি আমায় এই মাঙ্কিটা কিনে দিয়েছ কত টাকা দিয়ে ?

বড়কাকা যেন প্রশ্ন শুনে চম্‌কে উঠলেন। বললে—কেন স্যার ?

—সাড়ে তিনশো টাকায়, নয় কি ?

—ঠিক বলেছেন স্যার। আপনার ভাগ্য ভাল, তাই অত সস্তায় পেয়েছেন, পাঁচশো-ই হচ্ছে ওর উচিত দাম—নেহাত—

সাহেব হঠাৎ হাত দিয়ে টেবিলের ওপরের কলিং বেলটা ভীষণ জোরে বাজালেন। বেয়ারা আসতেই সাহেব ছোটবাবুকে ডেকে আনতে বললে। মুখ-চোখ দেখে মনে হলো, সাহেব আজ রেগে লঙ্কাকাণ্ড বাধাবেন। কলিং বেলের শব্দের চোটে সাহেবের চেয়ারের তলার বাঁদরটা পর্যন্ত চম্‌কে উঠেছে।

ছোটবাবু ঘরে ঢুকে সেলাম করবার আগেই বম্পাস্ সাহেব বোমার মত ফেটে পড়লো। বললে—ছোটবাবু, তুমি না বলছিলে, টেরেটি বাজারে এই বাঁদর তিন টাকায় কিনতে পাওয়া যায়?

ছোটবাবুর মুখে কথা নেই। বড়কাকাও ইংরেজীতে বললেন—উত্তর দাও, তিন টাকায় কিনে দিতে পারো?

ছোটবাবুর মুখে কথা নেই। নীচে মাটির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

—উত্তর দাও—

ছোটবাবু তবুও চুপ। বড়কাকা তখন সাহেবের দিকে চেয়ে বললেন—উত্তর দেবে কী করে স্যার, ও চারশো টাকায় ওই জাতের বাঁদর কিনে দিক্—চাই কী পাঁচশো টাকার এক পয়সা কমে কিনে দিক্! বাঁদর সম্বন্ধে ও কী জানে স্যার—ক'টা লোক বাঁদর চেনে—

তারপর ছোটবাবুর দিকে চেয়ে বড়কাকা ইংরেজীতে বললেন—কত রকমের মাঙ্কি আছে পৃথিবীতে জানো তুমি? বাঁদর নিয়ে দালালি করতে এসেছ, জানো কত রকমের বাঁদর ইণ্ডিয়ায় আছে? জানা অত সোজা নয়—

বম্পাস্ সাহেব নিজেই জানতো না। বললে—বাঁদর কী অনেক রকমের হয় বড়বাবু?

বড়বাবু বললেন—কী বলেন স্যার, বাঁদর পোষা অত সহজ নয়, পৃথিবীতে তিনশো সাঁইত্রিশ রকমের মাঙ্কি আছে—তা'র মধ্যে তেরোটা জাতের পাত্তাই পাওয়া যাচ্ছে না, এখনও রিসার্চ চলছে ও নিয়ে—

বম্পাস্ সাহেব বললেন—আমার এ বাঁদরটা কোন্ জাতের বড়বাবু?

—আপনার বাঁদরটা হচ্ছে, 'গুপ্তিপাড়া ব্র্যাণ্ড'—ভেরী রেয়ার ব্র্যাণ্ড (very rare brand) স্যার—

—তাই নাকি?—সাহেবের মুখে হাসি ফুটলো।

বাইরে এসে বড়কাকা ছোটবাবুকে খুব একচোট নিলেন—খবরদার, এবার কিছু বললাম না—ভবিষ্যতে তোমার এমন বাঁদরামি আর সহ্য করবো না—

* * *

পট্‌লার গল্প শুনে আমারা সবাই অবাক্ হয়ে গেলাম। বাঁদরের যে এত রকমের ব্র্যাণ্ড আছে—তা নিয়ে আবার রিসার্চ চলছে, এটা কে জানতো!

———

লটারীর ফলাফল

মনে করো, তুমি লটারীর টিকিট কিনেছ। বন্ধু-বান্ধবকে জানালে, যে দালাল এসে ঝুলোঝুলি করছিল, তাই তোমার এই দুর্মতি, নইলে লটারীর ওপর তোমার বিশ্বাস নেই। আরো জানালে যে, পুরুষকারই হলো আসল বস্তু, ভাগ্যের ওপর বিশ্বাস করে রাতারাতি বিনা আয়াসে বড়লোক হওয়ার আশা করা ক্লীবের ধর্ম···ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু মনে-মনে বিশ্বাস রাখো, যে হঠাৎ ঘটনাচক্রে রাম-শ্যাম-যদু-মধুর বদলে তুমিও টাকাটা পেয়ে যেতে পারো, লেগে যদি যায় তো গেল, পেয়ে গেলে একবারে একলাখ বা দু'লাখ, একেবারে সে-টাকাটার ওপর তোমার নির্বিবাদ অধিকার! মাথার ঘাম পায়ে ফেলে টাকা নয়, ডাকাতি করা টাকা নয়, ব্যবসা নয়, চাকরি নয়, কিছুই নয়—একেবারে যাকে ব'লে আকাশ ফুঁড়ে হাতের মুঠোয় আসা টাকা! তারপর শুয়ে-বসে, ঘুমিয়ে-জেগে, যেমন ভাবে ইচ্ছে পায়ের ওপর পা তুলে সেটাকা খরচ করো—কেউ তোমায় বারণ করতে যাচ্ছে না, বাধা দিতে যাচ্ছে না। আমাদের ফলাহারী পাঠকেরও সেই দশা হয়েছিল।

বললাম—ফলাহারী পাঠক আবার কে দাদু?

দাদু ভুড়ুক-ভুড়ুক শব্দ করে গড়গড়ায় তামাক টানতে-টানতে বললেন—সে ফলাহারী পাঠককে তোমরা চেনো না, সে হলো পুলিশ আদালতের মুহুরী; ছোটবেলায় বাপের সঙ্গে মুঙ্গের জেলা থেকে কলকাতায় এসেছিল দারোয়ানী কাজ শিখতে। বাপ ছিল ইয়া ষণ্ডা চেহারার—ছেলেটার যে কেমন করে অমন প্যাকাটির মত চেহারা হলো কে জানে, ছাতু খেয়ে হজম করতে পারে না, তা' লাঠি ঘোরাবে কী, কুস্তি লড়বে কী! নিমপাতা মাখা কুস্তির আখড়ায় তার

বাপ একদিন তাকে ফেলে মাটি মাখিয়ে দিলে, তারপর শীতকালের ঠাণ্ডা লেগে এমন নিউমোনিয়া হলো, যে একমাস আর বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেনি। তারপর থেকে বাঙালীর মত সরু চালের ভাত, কাঁচকলা আর সিঙ্গিমাছের ঝোল, আর গোঁড়া লেবু, এই খেতে দেওয়া হোল। ছাতু হজম হয় না, ছোলা ভিজোনো হজম হয় না, একটু গা খুললে সর্দি লাগে, বৃষ্টিতে ভিজলে জ্বর হয়—হিন্দুস্থানীর ছেলে ফলাহারী পাঠক বাঙলা দেশে এসে একেবারে স্রেফ্ বাঙালী হয়ে গেল। বাপ দেখলে ওর দ্বারা দারোয়ানের কাজ পোষাবে না—তাই লেখাপড়া শেখাতে লাগলো, যদি কেরানীগিরি পায় শেষকালে বাবুদের অফিসে। কিন্তু ফলাহারী পাঠকের কপালের লিখন কে ঘোচাবে! ফলাহারী পাঠক পুলিশ আদালতের মুহুরী হলো, ফলাহারী পাঠকের বিয়ে হলো, ছেলে হলো, সংসার হলো, কিন্তু নিজে সেই প্যাকাটিই রয়ে গেল। সে যা হোক—দিন একরকম করে কাটছে ফলাহারীর; এমন সময় ফলাহারীর নামে লটারীতে এক লক্ষ সাতষট্টি হাজার টাকা উঠলো!

টিকিটটা ফলাহারী দৈবাৎ কিনেছিল বলা যায়। নিবারণ উকিল জোর করে সবাইকে একটা করে টিকিট গছিয়েছিল। ফলাহারী একটা মকর্দমায় আসামীর কাগজপত্র নিয়ে সেখানে এসেছিল উকিলের খোঁজে! আসা মাত্র নিবারণ উকিল চেপে ধরেছে। বলে—কিনতেই হবে তোমাকে ফলাহারী।

ফলাহারী বলেছিল—অত টাকা নেই আমার—আমার কি আর সেরকম কপাল উকিলবাবু, তা' হলে কি আর কোর্টের মুহুরী হই আজ?

নিবারণ উকিলই প্রথমে ফলাহারীর হয়ে টাকাটা নিজের পকেট থেকে দিয়ে তার পরের মাসের প্রথমে ফলাহারীর থেকে আদায় করে নিয়েছিল।

প্রথমে খবরটা আসে যখন, তখন ফলাহারী কোর্ট থেকে ফেরেনি। ফলাহারীর বড় ছেলে ব্রিজ্‌নাথ অফিস থেকে সবে এসেছে, এমন সময় 'তার' এল। ব্রিজ্‌নাথ তো তারটা ছিঁড়ে পড়লে। পড়ে চম্‌কে গেছে। খবর আছে যে ফলাহারীর নামে লটারী উঠেছে! ব্রিজ্‌নাথ খবরটা নিয়ে চুপি-চুপি গিয়ে মাকে বললে—এখন যদি বাবাকে গিয়ে খবরটা জানাই, তাহ'লে বাবার যে দুর্বল হার্ট—বাবা হয়তো তাল সামলাতে পারবে না। তার চেয়ে খবরটা চেপে যাওয়াই ভালো—

ছেলে আর মা'তে পরামর্শ করে ঠিক হলো, ফলাহারী পাঠককে উপস্থিত

কিছুই জানানো হবে না। কিছুদিন পরে পাকা খবর এল, ফলাহারী পাঠকই প্রথম হয়েছে। ফলাহারী এখন এক লক্ষ সাতষট্টি হাজার টাকার মালিক!

এবারও ব্রিজ্‌নাথ খবরটা পেয়ে বাপকে আর কিছুই জানালে না। কিন্তু ভারী মুশকিলে পড়লো। এক লক্ষ সাতষট্টি হাজার টাকা। চালাকির কথা নয়! বাপের হার্ট যা দুর্বল! ছোটবেলা থেকে প্যাকাটির মত চেহারা। বড় হয়ে চেহারা ভাল হওয়া দূরের কথা, আরো প্যাকাটিপানা হয়ে গেছে। তা ছাড়া নেহাৎ কোর্টে না গেলে নয় তাই যাওয়া, নইলে ডাক্তার কোন কারণেই বেশী উত্তেজিত হতে বারণ করে দিয়েছে। কোর্ট থেকে এসেই ফলাহারী শুয়ে পড়ে। ব্রিজনাথ 'তার' পাবার দিন থেকেই বাবাকে আর কোর্টে যেতে দেয় না! কোর্টে যেতেও বলে না! বলে না, আর বুড়ো বয়েসে আপনাকে আর খাটতে হবে না, আমরা তবে রয়েছি কী করতে!

ফলাহারী পাঠককে ঘরে তো বন্ধ করে রাখা হলো। কারুর সঙ্গে আর দেখা করতে দেয় না ব্রিজনাথ। ব্রিজনাথও ছুটি নিয়েছে। শেষকালে কেউ এসে সুখবরটি দিয়ে যাক, আর ফলাহারী পাঠক সঙ্গে-সঙ্গে হার্টফেল করুক।

এই তো সেদিন পুণায় এক গাড়োয়ান ঘোড়ার গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছিল— হঠাৎ তার এক বন্ধু তাকে জানালে, যে সে চল্লিশ হাজার টাকা পেয়েছে লটারীতে, আর সঙ্গে-সঙ্গে গাড়োয়ান গাড়ি থেকে মাটিতে পড়ে অক্কা! গরীব লোক একসঙ্গে চল্লিশ হাজার টাকার কল্পনা করতেও পারে নি।

আর একটা ঘটনা ঘটেছিল এক অফিসের চাপরাশির। যে-ই খবর এল সে লটারীতে কত হাজার টাকা পেয়েছে, অমনি অজ্ঞান, আর জ্ঞান হয় না, শেষে মাথায় জল আর বরফ দেবার পর আবার জ্ঞান হলো বটে, কিন্তু মাথা খারাপ হয়ে গেল চিরদিনের মত! লটারীর টাকা তাকে আর ভোগ করতে হলো না। এরকম কত ঘটনা ব্রিজনাথ জানে।

একবার এক রেল অফিসের পিওনের নামে উঠেছিল সাঁইত্রিশ হাজার টাকা। অফিসের সাহেবের কাছে খবরটা প্রথম আসতেই সাহেব পিওনটাকে ডেকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে আচ্ছা করে কষে চাবুক মারতে লাগলো। মারতে মারতে যখন সারা গায়ে দরদর করে রক্ত ঝরছে, উঠে দাঁড়াতে পারছে না, তখন সাহেব পিওনটাকে তার টাকা পাওয়ার কথা জানালো।

পিওন অবাক হয়ে জিগ্যেস করলে—সাহেব আমাকে অত মারলেন কেন?

সাহেব বললে—ব্যাটা তোকে অত মারলুম বলেই তুই বেঁচে গেলি, নইলে তুই যে আনন্দে মারা যেতিস।

এরকম হাজার-হাজার গল্প ব্রিজনাথের জানা আছে। ব্রিজনাথের সেই গল্পগুলো অফিসের লোকেদের মুখে-মুখে চলে। এক লাখ সাতষট্টি হাজার টাকা! ফলাহারী পাঠক কখনও এত টাকার স্বপ্নও দেখে নি! সুতরাং একটা কিছু দুর্ঘটনা ঘটা-টা বিচিত্রও নয়।

ব্রিজনাথ ফলাহারীকে চোখে-চোখে সারাদিন রাখে! বাড়ির বাইরে যেতে দেয় না—কোন ফাঁকে বাইরে গিয়ে কথাটা শুনে ফেলুক আর হার্টফেল করুক আর কী! তা'ছাড়া দেশময় সবাই খবরটা জেনে গেছে। জানবার পর থেকেই গাদা-গাদা লোক আসছে দিনরাত! ইন্সিওরেন্স দালাল আসছে, আত্মীয় আসছে, অনাত্মীয় আসছে—হৈ-হৈ ব্যাপার। কিন্তু ব্রিজনাথ হুঁশিয়ার। দিন-রাত বাবার ঘরের দরজায় খিল আঁটা, কারোর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ নয়! বাড়িতে খবরের কাগজ আসা বন্ধ! কী জানি খবরের কাগজেই যদি খবরটা বেরোয়, আর ফলাহারী পাঠক যদি সেটা পড়ে ফেলে দৈবাৎ। কিন্তু এমন করে আর কতদিনই বা চেপে রাখা যায়! আর দু'-একদিনের মধ্যেই তো টাকাটা আসবে। তখন তো ফলাহারী জানবেই! কিন্তু তার আগেই একটা কিছু মতলব করতে হবে।

ও-পাড়ার নকুলেশ্বর বহুদিনের হোমিওপ্যাথ ডাক্তার! ফলাহারী পাঠকের বাড়ি চিকিৎসা করে! তাকে ব্রিজনাথের খুব বিশ্বাস। শেষ পর্যন্ত ব্রিজনাথ তার সঙ্গেই পরামর্শ করবে ঠিক করলে।

তোমরা মনে করছো হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার আবার লটারীর টিকিটের সম্বন্ধে কী পরামর্শ দেবে! কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে সারে না এমন কোনো রোগই নেই! তা'ছাড়া নকুলেশ্বর ডাক্তার সাচ্চা লোক! ব্রিজ্নাথের যেবার সেই অদ্ভুত রোগটা হয়েছিল তখন তার মুখের বাঁ দিকটা কেবল ঘেমে উঠতো। ডানদিকে শুকনো খটখটে খড়ি উঠছে, আর বাঁ দিকটা একেবারে ঘামে জ্বজবে! সে এক অদ্ভুত রোগ ইণ্ডিয়াতে। ও-রোগ ব্রিজ্নাথেরই প্রথম। ও-কেস্ নাকি হ্যানিম্যানের বইয়ে নেই। চিলিতে ওই রকম কয়েকটা রোগী দেখতে পাওয়া গেছে। কিন্তু নকুলেশ্বর কী একটা ওষুধ দিয়ে তের দিনের মধ্যে সে-রোগ সারিয়ে দিলে। ব্রিজ্নাথ সেই দিনই প্রথম নকুলেশ্বর ডাক্তারের গুণ

বুঝতে পেরেছে। অদ্ভুত লোক এই নকুলেশ্বর ডাক্তার—রোগ সারাবার দিকেই তার লক্ষ্য—টাকার ওপর মোটেই লোভ নেই।

সব শুনে নকুলেশ্বর ডাক্তার বললে—কিছু ভয় নেই, আমি সব ঠিক করে দেব—বলে গোটাকতক বই ওল্টালে। অনেকবার চশমাটা খুলে লাগিয়ে বইগুলো রেখে ব্রিজনাথকে জিগ্যেস করলে—বাবার কখনও সর্দি হয়েছে ?

সর্দি ফলাহারী পাঠকের কতবার হয়েছে—কার না হয়ে থাকে !

ব্রিজ্‌নাথ বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ ডাক্তারবাবু।

—সর্দি হলে চোখ দিয়ে জল পড়ে ? জিজ্ঞেস করলে নকুলেশ্বর ডাক্তার।

—হ্যাঁ পড়ে !

—পড়তেই হবে—নকুলেশ্বর বললে। তারপর খানিক ভেবে বললে—বাঁ চোখ দিয়ে পড়ে, না ডান চোখ দিয়ে পড়ে ?

—তা-তো জানি না ডাক্তারবাবু—ব্রিজ্‌নাথ অনেক ভেবেও মনে করতে পারলে না।

অনেকক্ষণ ভাবার পর নকুলেশ্বর বললে—আচ্ছা, একটা কথা বলো দিকিনি ব্রিজ্‌নাথ—তোমার বাবাকে রাত্রে ঘুমোতে দেখেছ তো !

ব্রিজ্‌নাথ কী উত্তর দেবে ভেবে পেলে না। আজকাল তো ব্রিজনাথ বাবার পাশেই ঘুমোচ্ছে। নকুলেশ্বর যদি জিগ্যেস করে তার বাবা ঘুমোবার সময় আগে বাঁ চোখ বোঁজেন না ডান চোখ বোঁজেন, তা হলে সে কী জবাব দেবে, তাও ভাবতে লাগলো। কিন্তু নকুলেশ্বর সে-প্রশ্নের ধার দিয়েও গেল না। বললে—বাঁ পাশ ফিরে শোন্, না ডান পাশ ফিরে শোন্—জানো ?

অনেক ভেবে ব্রিজ্‌নাথ বললে—সারারাতই বাবা এ-পাশ ও-পাশ করেন—

—না তোমার দ্বারা হবে না—নকুলেশ্বর হাল ছেড়ে দিলে। ফলাহারী পাঠককে নিজে না দেখলে ট্রিট্‌মেন্ট হবে না। রোগী রইলো সাত মাইল দূরে, তা করে কি চিকিৎসা চলে ?

শেষ পর্যন্ত নকুলেশ্বর ডাক্তার ব্রিজ্‌নাথকে সঙ্গে নিয়ে ফলাহারী পাঠকের বাড়িতে এল। ব্রিজ্‌নাথকে নকুলেশ্বর বুঝিয়ে দিয়েছে—তোমরা কিছু ভেবো না, অনেক রোগী ঘেঁটে-ঘেঁটে আমাদের সব জানা হয়ে গিয়েছে। তোমার বাবাকে ঠিক শক্ত করে দেব, আমরা ডাক্তার মানুষ, রোগীকে কী করে চাঙ্গা করতে হয়, আমরা তা ভালো করে জানি—

ঘরে ঢুকতেই ফলাহারী ডাক্তারবাবুকে দেখে অবাক হয়ে গেল। বললে—একি ডাক্তারবাবু, আপনি ?

—এই এলাম দেখতে, কেন আসতে নেই—এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম।

বলে' নকুলেশ্বর ডাক্তার বসলো তক্তপোশের ওপর।

তারপর অনেক গল্প করতে লাগলো ফলাহারী পাঠক! কিন্তু নকুলেশ্বর ডাক্তার ভেতরে-ভেতরে দেখছে ফলাহারী পাঠককে! হঠাৎ খপ্ করে লটারীর কথাটা পাড়লে চলবে না। বেশ আস্তে-আস্তে সইয়ে কথাটা তুলতে হবে। দুর্বল হার্ট ফলাহারী পাঠকের, একটু তাড়াতাড়ি করলেই হার্টফেল। অনেকক্ষণ কথা বলার পর নকুলেশ্বর ডাক্তার বললে—এবার ভাবছি পাঠক মশায়, একটা লটারীর টিকিট কিনবো। যে-টানাটানি, আর চালাতে পারছি নে—

ফলাহারী পাঠক বলে উঠলো—আমি একটা টিকিট কিনেছি ডাক্তারবাবু।

নকুলেশ্বর ডাক্তার বললে—কিনেছেন নাকি ?

—হ্যাঁ, নিবারণ উকিলের ঝুলোঝুলিতে কিনেছি একটা, কিন্তু ওঠে নি বোধহয়, উঠলে এতদিনে খবর পেয়ে যেতুম—আর আমাদের কপালে আসবে না তা' জানতুম—

নকুলেশ্বর সোজা হয়ে বসলো। এই সুযোগ। বললে—ধরুন যদি আপনার নামে একটা টিকিট উঠলো।

ফলাহারী পাঠক বললে—কী যে বলেন ডাক্তারবাবু, আমার আবার তেমনি কপাল নাকি। নইলে পুলিশ আদালতের মুহুরী হয়ে জীবন কাটাই ?

—আহা, ধরুন একটা ফিফ্‌থ প্রাইজ পেলেন আপনি—

—ফিফ্‌থ প্রাইজ, কত টাকা ? জিগ্যেস করলে ফলাহারী পাঠক।

—এই ধরুন আড়াই হাজার।

—আড়াই হাজার টাকায় আর কী হবে, অনেক দেনা হয়ে গিয়েছে, কিছু শোধ হয় তাতে—

—ধরুন থার্ড প্রাইজ পেলেন, চল্লিশ হাজার—

এক ধাপ উঠলো নকুলেশ্বর।

—তা' হলে একটা বাড়ি করি, দেখছেন না, ভাড়া বাড়িতে থাকি, ছাদ দিয়ে জল পড়ে বর্ষাকালে, বাড়িওয়ালাকে সারাতে বললেও সারায় না। কোনো

বাড়ির সন্ধান আছে আপনাদের ওদিকে—উৎফুল্ল দেখা গেল ফলাহারীকে।

এইবার আর এক ধাপ্ উঠলো নকুলেশ্বর। একটু-একটু করে সওয়াতে হবে কী না! নকুলেশ্বর জিগ্যেস করলে—ধরুন, সেকেণ্ড প্রাইজ আশি হাজার টাকা পেলেন, তখন কী করবেন?

নকুলেশ্বর ভালো করে চেয়ে দেখলে ফলাহারী পাঠকের মুখটা খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ফলাহারী পাঠক বললে—অত টাকা কি আর কোনও দিন পাবো ডাক্তারবাবু—তা' ধরুন যদি পাই-ই ব্যাঙ্কে রেখে দিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে আরাম করে বসে-বসে সুদ খাবো—বলেই হো-হো করে হেসে উঠলো ফলাহারী।

এইবার শেষ ধাপ। কিন্তু তবু নকুলেশ্বরের মনে হলো, যেন অনেকটা ভয় কেটে গেছে। ফলাহারীর মুখে কোনও রকম ভাবান্তরের চিহ্ন নেই।

এবার নকুলেশ্বর শেষ কোপ্ মারলে—আচ্ছা ধরুন, যদি আপনি ফার্স্ট প্রাইজ পান, একেবারে এক লক্ষ সাতষট্টি হাজার টাকা।

কথাটা শুনে ফলাহারী হো-হো করে হেসে উঠলো, সে হাসির চোটে ফলাহারীর গর্তের ভেতর ঢোকা চোখ দু'টো বেরিয়ে আসতে লাগলো, গলার শিরগুলো ফুলে উঠতে লাগলো। নকুলেশ্বরের মনে হলো, যেন ফলাহারীটা হাসতে-হাসতে এখুনি দম আটকে মারা যাবে। কিন্তু না, ফলাহারী সামলে নিয়েছে খুব জোর। হাসি থামার পর ফলাহারী তখনও দম টানছে। নকুলেশ্বর নিশ্চিন্ত হলো। যাক্ এ যাত্রায় বেঁচে গেল ফলাহারী পাঠক।

নকুলেশ্বর জিগ্যেস করলে—এক লক্ষ সাতষট্টি হাজার টাকা পেলে আমায় খাইয়ে দেবেন তো?

ফলাহারী বললে—আমাদের ভাগ্য অত ভাল নয় ডাক্তারবাবু, এক লক্ষ সাতষট্টি হাজার টাকা পেলে তাই আপনাকে দিয়ে দেব—এই কথা দিচ্ছি ব্রাহ্মণ হয়ে।

যাহাঁ'তক না এই কথা শোনা নকুলেশ্বর ডাক্তার হঠাৎ তক্তপোষের ওপর থেকে ধপাস্ করে নিচে মেঝের ওপর পড়ে গেল। চিৎকার করে উঠলো ফলাহারী পাঠক—ব্রিজনাথ-ব্রিজনাথ—

ব্রিজনাথ পাশের ঘরেই ছিল ; ঘরে এসে দেখে নকুলেশ্বর ডাক্তার অজ্ঞান হয়ে আছে। ফলাহারী পাঠকের অত টাকা পাওয়ার আনন্দটা ধাপে-ধাপে উঠেছিল বলে হজম করতে পেরেছিল। কিন্তু নকুলেশ্বর ডাক্তার আর প্রস্তুত হবার সময় পায় নি। হঠাৎ টাকা পাওয়ার আনন্দে একেবারে অজ্ঞান হয়ে গেল।

* * *

গল্প শুনে হো-হো করে হেসে উঠলুম। বললুম—সত্যি দাদু—সত্যি ঘটনা ? গম্ভীর ভাবে গড়গড়া টানতে দাদু বললেন—তখনই জানি এ গল্প তোমরা বিশ্বাস করবে না, আজকালকার ছেলে, ভগবান বিশ্বাস করো না তোমরা—

কথা না শেষ করে দাদু আবার গড়গড়ায় টান দিতে লাগলেন।

———
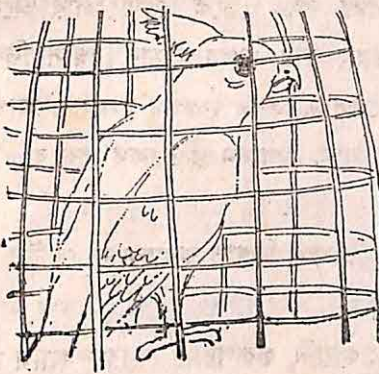
কাকাতুয়া যে আমার এত সর্বনাশ করবে, তা কল্পনাও করতে পারিনি। পাখী পোষবার শখ আমার বহুদিনের। বলতে গেলে সেই ছোটবেলা থেকেই। ছোটবেলায় লোকের নানারকম শখ থাকে। কারো থাকে গাছ-পালার শখ, কারো বা মাছ-ধরার. আবার কারো কুকুর পোষবার। তবে কুকুর পোষবার অনেক জ্বালা। সে কেবল্ ঘরময় ঘোরাঘুরি করে, ফার্নিচার নষ্ট করে। এমন কি বিছানাতেও লাফিয়ে ওঠে। তারপরে সেই কুকুরের কুকুরপনার জন্যে গুরুজনদের কাছে বকুনিও খেতে হয়।

আর একটা নেশা এখন শুরু হয়েছে। আগেকার আমলে আমাদের সময়ে সে-নেশাটা ছিল না। মাছ পোষার নেশা। লাল-নীল মাছ। একটা কাঁচের বাক্সের ভেতরে জল পোরা। সেই জলের ভেতর লাল-নীল মাছগুলো সাঁতার দিয়ে ভেসে বেড়ায়। এ দৃশ্য দেখতে বেশ ভালো লাগে। মাঝে-মাঝে যখন শরীর খারাপ হয়, বাড়ি থেকে বেরোবার উপায় থাকে না, তখন মাছগুলোকে খাওয়াতে খুব ভালো লাগে। তাতে সময়ও যেমন ভালো কাটে, তেমনি মনটাও পবিত্র হয়। তখন আর কারো ওপর রাগ থাকে না, কারো ওপর অভিমান থাকে না, কাউকে ঘেন্না করতেও ইচ্ছে করে না। তখন মনে হবে শত্রুর সঙ্গেও যেন একাকার হয়ে মিশে যাই। মনে হবে যেন সবাই আমার বন্ধু, যেন সবাইকে আমি ভালবাসতে পারি। তখন কেবল রবীন্দ্রনাথের কবিতার সেই লাইনটাই বার-বার আবৃত্তি করতে ইচ্ছে করবে—
"এমনি করেই যায় যদি দিন, যাক্‌না-"

তা যাক্, এসব কথা তো আমি বলতে বসিনি। বলছি কাকাতুয়ার ক

সত্যিই, কাকাতুয়া যে এমন সর্বনাশ করবে, তা কল্পনাও করতে পারিনি।

নিউ মার্কেটের পাখীওয়ালা গুরুপদর কাছ থেকে ছোটবেলায় অনেক পায়রা কিনেছি, কুকুর কিনেছি। সুতরাং তার ওপর আমার বিশ্বাস ছিল। তার কাছে যখন কাকাতুয়াটা কিনতে গেলাম, তখন গুরুপদ বললে—আপনি এ কাকাতুয়াটা বিশ্বাস করে কিনে নিয়ে যান, দেখবেন কত কথা বলবে।

বললাম—কথা বলবে তো ঠিক ?

গুরুপদ বললে—আপনি কি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না ছোটবাবু ? আমি কি আপনাকে কখনও ঠকিয়েছি ?

স্বীকার করতে হলো যে, কখনও ঠকায়নি গুরুপদ। কারণ আমি তার পুরনো খদ্দের। ব্যাপারীরা সাধারণতঃ পুরনো খদ্দেরদের ঠকায় না। সুতরাং গুরুপদ আমাকে ঠকাতে যাবে কেন ? জিজ্ঞেস করলাম—কত দাম ?

গুরুপদ বললে—আপনার সঙ্গে আবার দরাদরি করবো কি ছোটবাবু, আপনি খাঁচাসুদ্ধ পাখীটি নিয়ে যান—

বললাম—না, দর ঠিক না হলে আমি নেবো না—

তা শেষ পর্যন্ত কুড়ি টাকায় কিনলাম কাকাতুয়াটা! ভাবলাম, এবার আর আজে-বাজে পাখী পোষা নয়, একেবারে রাজ-পাখী। এ পাখী একাই একশ'। এই একটা পাখী থাকলেই একশো কেন, হাজার পাখী পোষার শখ মিটে যায়। পাখীটা বাড়িতে আনা হলো। তার জন্যে দাঁড়ও একটা কেনা হলো। বেশ পেতলের দাঁড়। মাটি থেকে দেড় মানুষ সমান উঁচু দাঁড়টা। পাখীর চেয়ে পাখীর দাঁড়ের দামই বেশি। সেই যে কথায় আছে, ঢাকের দায়ে মনসা বিকিয়ে যাওয়া, এও হলো তাই। সেই পাখী বাড়িতে আসার পর থেকেই কাজ বেড়ে গেলো সকলের। কাজে হিমসিম খেতে লাগল সবাই।

একজন গুরুজন এসে কাকাতুয়া কিনেছি দেখে বললেন—আবার কাকাতুয়া কেন! এর চেয়ে তো টিয়াপাখীই ভালো ছিল—

বাবা বললেন—ওই বলে কে ? ছেলেকে তো আমার চেনেন না আপনি—

ছেলের কীর্তির কথা শুনে আর তিনি কিছু বললেন না।

কিন্তু সবাই জানালো যে, কাকাতুয়া পাখী পুষলে নাকি বংশের সর্বনাশ হয়! যত বড়-লোক বাড়িতে কাকাতুয়া পুষেছে, তাদের সকলের বংশ নাকি নষ্ট হয়ে গেছে। আমি বললাম—ও-সব বাজে কথা—ও-সব আমি মানি না।

মানি না তো মানি না। একবার মানি না বললে কে আর আমাকে মানায়! আর ছোটবেলা থেকে আমি খুব আদরে মানুষ। আমার আবদার রাখতে বাড়িসুদ্ধু লোক সব তটস্থ! আমার কথা কে অমান্য করবে?

সেই কাকাতুয়া পাখীর জন্যে একটা লোক রাখা হলো। তার কাজ কাকাতুয়ার তোয়াজ-তদবির করা। তা ছাড়া অন্য কাজ হলো—কথা শেখানো—

নিয়ম করে দিলাম, যে প্রতিদিন ভোর চারটের সময় তাকে উঠতে হবে আর কাকাতুয়াকে কথা শেখাতে হবে। কিন্তু এক মাস গেলো, দু'মাস গেলো; তিন মাস গেলো। শেষকালে এক বছর চলে গেলো। কথা আর শেখে না। অথচ কথা শেখানোর পেছনে খরচেরও শেষ নাই।

শেষকালে একদিন গেলাম নিউ মার্কেটে গুরুপদর কাছে।

গিয়ে বললাম—তোমার কাকাতুয়া কথা বলে না কেন?

গুরুপদ বললে—কে কথা শেখায়? কথা শেখাবার লোক রেখেছেন?

বললাম—হ্যাঁ।

গুরুপদ বললে—তা'হলে সে ফাঁকি দেয়, অন্য লোক রাখুন।

সুতরাং যে এতদিন কথা শেখাতো তার চাকরি গেল, অন্য লোক রাখা হলো। ভালো-ভালো কথা শেখাতে বলা হলো তাকে। যেমন, রাধাকৃষ্ণ, হরিবোল, সীতা-রাম,—

কিন্তু কা-কস্য পরিবেদনা। কোন ফল ফললো না। যে-কে সেই।

শেষকালে আমি হাল ছেড়ে দিলাম। আর তখন আমারও বয়েস বাড়লো। আমার কাকাতুয়ার নেশাও আস্তে-আস্তে কমে এলো। আমিও সংসারী হয়ে পড়লাম। আমার পৈত্রিক কারবারে আমি দিন-রাত সময় দিতে লাগলাম, তখন নেশা ছেড়ে পেশার দিকেই বেশি করে নজর দিতে লাগলাম।

এমন করে কত বছর কেটে গেলো, একটা বুলিও বেরোয় না কাকাতুয়াটার মুখ দিয়ে। আমাদের কাকা-জ্যাঠারাও সব আলাদা হয়ে গেলো একদিন। জায়গা কমে গেল আমাদের থাকবার। কাকাতুয়াটা তখন একটা বোঝা হয়ে গেলো আমাদের কাছে। বিরক্ত হয়ে শেষকালে একদিন পাখীটাকে নিয়ে গেলাম নিউমার্কেটে গুরুপদর কাছে। গিয়ে বললাম—তোমার পাখী তুমি নিয়ে নাও গুরুপদ, আমার কাকাতুয়ার শখ মিটে গেছে।

গুরুপদ পাখীটাকে খুশী মনেই নিয়ে নিলে। বললে—এর জন্যে আমি

আপনাকে ষাট টাকা দিচ্ছি, নিন্—আপনি এর পেছনে হাজার-হাজার টাকা খরচ করেছেন, একে অনেক খাইয়েছেন, আপনার লোকসান করবো না।

কুড়ি টাকায় কেনা পাখীটা বেচে চল্লিশ টাকা লাভ হলো। যথা লাভ। আর তার দাঁড়টা বেচে পেলাম তিরিশ টাকা। শখের গুণোগার যথেষ্টই হলো। আমার কাকাতুয়ার শখ সেখানেই মিটে গেল।

* * *

এ ঘটনার আট-ন'মাস পরে আমার পাটনার হরিচরণ একদিন বললে—ওহে, একটা কাণ্ড হয়েছে।

বললাম—কী কাণ্ড ?

হরিচরণ বললে—আমার ছেলেকে চেনো তো ? আমার ছেলের আবদার ছিল একটা কাকাতুয়া কেনবার, কাল তাকে একটা কাকাতুয়া কিনে দিয়েছি।

কাকাতুয়া! আমি চম্‌কে উঠেছি।

বললাম—ছোটবেলায় যে আমিও একটা কাকাতুয়া কিনেছিলাম হে। কিন্তু কথা বলতো না বলে বেচে দিয়েছি—তোমার এ কাকাতুয়া কথা বলে ?

হরিচরণ বললে—লোকটা তো বললে কথা বলে। আমি এখনও শুনিনি। লোকটা বলেছে, ঘর অন্ধকার করে দিলেই নাকি কথা বলবে। তা আমি তো নিজের কাজের ঠ্যালায় ওসব দেখতে পারিনি, সময়ও পাইনি শোনবার—

জিজ্ঞেস করলাম—কত দিয়ে কিনলে ?

হরিচরণ বললে—খুব সস্তা।

—তবু কত শুনি ?

হরিচরণ বললে—পাঁচশো। আজকাল ওর চেয়ে সস্তায় আর কাকাতুয়া পাওয়া যায় না। খুব লাভই করেছি—

বললাম—একদিন তোমার কাকাতুয়াটা দেখতে যাবো—

তা যাবো-যাবো করেও যাওয়া হলো না অনেকদিন। হরিচরণও অফিসের কাজে বোম্বাই চলে গিয়েছিল এক মাসের জন্যে। সেখান থেকে ফিরে আসতেই একদিন গেলাম তাদের বাড়িতে। গিয়েই কাকাতুয়াটা দেখে মনে হলো, এ যেন সেই আমার পাখীটাই। ঠিক অবিকল সেই রকম দেখতে। হরিচরণের ছেলেকে জিজ্ঞেস করলাম—কোন্ পাখীওয়ালার কাছ থেকে কাকাতুয়াটা কিনলে ?

তার উত্তর দেবার আগেই কাকতুয়াটা চীৎকার করে উঠলো—কংগ্রেস

গুণ্ডা, সি-পি-আই গুণ্ডা, কংগ্রেস চোর, সি-পি-আই চোর, ইনক্লাব জিন্দাবাদ, মুখ্যমন্ত্রী জবাব দাও, নইলে গদি ছেড়ে দাও—

শুনে সবাই হেসে অস্থির। কিন্তু আমি অবাক।

বললাম—এ সব কথা কে শেখালে একে ?

হরিচরণের ছেলে বললে—তা জানি-না, ঘর অন্ধকার করলেই এই সব কথা বলছে কেবল—

আমি আর না দাঁড়িয়ে সোজা নিউ মার্কেটে গুরুপদর দোকানে গেলাম।

গুরুপদ বললে—কী ছোটবাবু, আবার পাখী চাই নাকি ?

আমি বললাম—না, আমার সেই কাকাতুয়াটা কোথায় ?

—আজ্ঞে ছোটবাবু, সে পাখী আমি বেচে দিয়েছি পাঁচশো টাকায়—

বললাম—সেই পাখীটা দেখেই তো আমি দৌড়ে আসছি। দেখলাম, সে তো দিব্যি কথা বলছে—ইনক্লাব জিন্দাবাদ, কংগ্রেস চোর, সি-পি-আই চোর। আর বলছে মুখ্যমন্ত্রী জবাব দাও, নইলে গদি ছেড়ে দাও। এসব কথা কী করে শিখলে বলো তো ? অথচ আমি অত কথা শেখাবার চেষ্টা করলাম, রাধাকৃষ্ণ-সীতারাম, কিচ্ছু বলেনি।

গুরুপদ হাসলো। বললে—সে এক কাণ্ড হলো ছোটবাবু, বিধানসভার দারোয়ান আমার দেশের লোক। তাকে গিয়ে ধরলাম, দু'শো টাকা গুঁজে দিলাম তার হাতে। সে বিধানসভার ভেতরে পাখীটাকে রেখে দিয়েছিল। সেখানেই বিধান-সভার ভেতরে যা কথা শুনেছে, সব শিখে ফেলেছে—

আমি আরো অবাক। বললাম—কিন্তু আমিও তো কথা শেখাবার অনেক চেষ্টা করেছিলাম। মাইনে করে লোক রেখে রাধাকৃষ্ণ-সীতারাম বলাবার চেষ্টা করেছি।

গুরুপদ আবার হাসলো। বললে—আসলে কী হয়েছে জানেন ছোটবাবু ? আপনাকে বলা হয়নি। আর তখন আমিও এর বংশ পরিচয়টা জানতুম না। আসলে এই কাকাতুয়াটা হলো জাতপলিটিসিয়ান, বংশ-পরম্পরায় ওরা পলিটিকস্ করে আসছে। ওর বাবা রাশিয়ায় জন্মেছিল, মা পিকিং-এ। তাই পলিটিকস্টা যত সহজে রপ্ত করতে পারে, অত সহজে অন্য ব্যাপারগুলো ধরতে পারে না! আসলে দোষটা তো আপনারই ছোটবাবু, আপনি জাত-পলিটিসিয়ান্ পাখীকে ধর্মের বুলি শেখাতে গেলেন কেন ?

—শেষ—